সরল বেদান্ত দর্শন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ. বি এল

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর

প্রণীত।

ELEMENTARY VEDANTA PHILOSOPHY.

BY

SURES CHANDRA CHATARJI M. A. B. L.

DEPUTY MAGISTRATE & DEPUTY COLLECTOR.

চুঁচুড়া

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৯ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

সরল বেদান্ত দর্শন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ. বি এল
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর
প্রণীত।

ELEMENTARY VEDANTA PHILOSOPHY.

BY
SURES CHANDRA CHATARJI M. A. B. L.
DEPUTY MAGISTRATE & DEPUTY COLLECTOR.

চুঁচুড়া
বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৯ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

খিত সূত্রগুলির তাৎপর্য্য বহুকাল মুখেমুখেই প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ উপযুক্ত শিষ্যের অভাবে ঐ সকল সূত্রের তাৎপর্য্য অপ্রকাশিত থাকিতে লাগিল। তখন ভাষ্যাদির প্রয়োজন হওয়ায় ভাষ্যাদি রচিত হইয়াছিল।

সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিতে গেলে বেদান্তশাস্ত্রে নিম্নলিখিত আটটী তথ্য প্রধানতঃ উপদিষ্ট আছে।—

১। কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐহিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া শাস্ত্রবাক্যে অচলা ভক্তি স্থাপনা করিতে পারিলে জীব বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী হয়।

২। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতিরেকে দুঃখসমূহের অত্যন্তনিবৃত্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ না হইলে জীবকে মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্মফলে বারংবার জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখভোগ করিতে হয়।

৩। এই সমস্ত জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পরিশেষে যাঁহাতে লয় পাইবে তিনিই ব্রহ্ম।

৪। ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান। তিনি সর্ব্বজ্ঞ বা আনন্দস্বরূপ। জন্ম বৃদ্ধি হ্রাস মরণাদি কোন প্রকার বিক্রিয়া বা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি কোন প্রকার গুণ তাঁহার নাই।

৫। বেদান্ত শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গ ভক্তিসহ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করা যাইতে পারে। অন্য কোন উপায়ে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করা যায় না।

৬। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শন বা ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হইবামাত্র জীব আপনাকে মুক্ত বলিয়া জানিতে পারেন। ইহাই মোক্ষ এবং ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ।

৭। অধিকারভেদে উপাসনাভেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে। নিম্নশ্রেণীস্থ অধিকারী আপন শ্রেণীর উপযুক্ত উপাসনা অভ্যাস করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত উচ্চাধিকারী হইয়া তদনুরূপ উচ্চোপাসনা করিতে সমর্থ হন। এইরূপ ক্রমোন্নতি মোক্ষের সোপান।

৮। শাস্ত্রে যে সকল আখ্যায়িকা আছে তাহারা সমস্ত সত্যঘটনা-মূলক নহে। যেমন পঞ্চতন্ত্রাদি গ্রন্থে বালকদিগের উপদেশার্থে নানা প্রকার কল্পিত আখ্যায়িকা আছে সেইরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবগণের উপ-দেশার্থ শাস্ত্রে নানা প্রকার কল্পিত আখ্যায়িকা আছে। ঐ সকল আখ্যা-য়িকার অন্তর্নিহিত বিধি নিষেধ এবং আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশগুলি গ্রাহ্য, অবশিষ্ট সমস্ত অপ্রামাণিক।

উল্লিখিত আটটি তথ্যই এই গ্রন্থমধ্যে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিশ্বনাথ ফণ্ডে উৎসর্গীকৃত এডুকেশন গেজেট নামক সংবাদপত্রে ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল। কতিপয় বন্ধুর আগ্রহে এক্ষণে প্রবন্ধগুলি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এডুকেশন গেজেটে প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রবাক্য সকল যথা-মূল উদ্ধৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থে মূল শাস্ত্রবাক্যগুলি পরিশিষ্টে দিবার সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু জনৈক সন্ন্যাসী গ্রন্থকারকে ঐগুলি আপাততঃ প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। সেই জন্য বর্ত্তমান গ্রন্থে মূল শাস্ত্রবাক্যগুলি উদ্ধৃত হয় নাই। নিজের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য স্থানে স্থানে লিপিপ্রমাদ ঘটিয়া থাকিতে পারে। গ্রন্থকার আশা করেন সহৃদয় পাঠকগণ আপন গুণে সমস্ত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন ইতি।

বারাসত
১লা অগ্রহায়ণ।
শকাব্দা ১৮২৪।
খৃষ্টাব্দ ১৯০২।

শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্ম্মা।

—:**:—

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা

অশুদ্ধিশোধন পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	দশন	দর্শন
৬	৩	স্বরূক্ষম	স্বরূশক্তি
১০, ৫১ ১৫	১২,৭ ১৩,১৯	বারম্বার "	বারংবার "
২৩	২৭	প্র ায়	প্রকার
২৪, ১৬৪	২১, ২৭	এব	এবং
২৭	১৫	ব্রহ্ম	ঈশ্বর
৩১	১৫	স্থূল ও শরীর	ও স্থূল শরীর
৩৩	২০	জগৎ ও পৃথিবীরূপে	জগৎরূপে
৪১	৮,৯	ভূমধ্যস্থ	ভূমধ্য
৪২	১১	ব্রহ্মবাক্য	ব্রহ্ম যদিও বাক্য
ঐ	ঐ	বটেন কিন্তু	তথাপি
৫০	৮	বন্ধ	বন্ধন
৫৫	২৪	জন্ম মৃত্যু	জন্ম মৃত্যু
৫৬	২৩	ঈশ্বর	ব্রহ্ম
৬০	১৯	এবং	০
৭৫	১৮	বিজ্ঞান	প্রজ্ঞান
৭৭	২২	প্রবিলার্পন	প্রবিলাপন
৮৯	২	তাহার	তাঁহার
"	১৬	তারম্যানুসারে	তারতম্যানুসারে
৯০	২৩	লেই	সেই

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯২	৬	বিজ্ঞান	সমস্ত জীবগণের বিজ্ঞান
„	৭	জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্নজীব	জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি
৯৫	১০	একত্রিংশৎ	ত্রয়স্ত্রিংশ
„	২৭	একত্রিংশৎ	একত্রিংশ
৯৬	১৯	(Living bodies)	(Mind)
৯৭	১০	বা দেহ	০
৯৯	১৪	ডাকে	ভাবে
১০০	২০	ঈশ্বরের	ব্রহ্মের
১০১	১০	ঈশ্বরে	ব্রহ্মে
„	১১	ঈশ্বরকে	ব্রহ্মকে
„	১৬	এক ভাবে থাকেন	জগৎ প্রকাশ করেন
„	১৭	„	জগৎ সৃষ্টি করেন
„	২১	অপোদেব	আপোদেব
১০২	৩—৪	প্রকৃতি—জ্ঞান	প্রাণে চৈতন্য
১০২,১০৪,১০৫	৫,৬,১২	অব্যক্তা প্রকৃতি	প্রাণ
১০৩	২৪	জ্ঞান বিহীন...হন	প্রাণ উৎপন্ন হয়
১০৪	২৯	আত্মজ্ঞানের	আত্মজ্ঞানের
ঐ	ঐ	আত্মজ্ঞান	আত্মজ্ঞান
১০৬	১৫	অর্দ্ধ-চন্দ্র বিভূষিত	অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিত
ঐ	১৬	শুদ্ধ সত্বময়	শুদ্ধসত্বময়
ঐ	ঐ	জ্ঞাননেত্র-বিজ্ঞান, চেতন	জ্ঞাননেত্র, বিজ্ঞানচেতন

১০৭ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে (অতিরিক্ত) "এবং কোন কোন সাধক শঙ্খ অর্থে সৃষ্টি, চক্র অর্থে সংসার, গদা অর্থে জ্ঞান, পদ্ম অর্থে মোহজনক কাম্য পদার্থ সকল এবং নীলবর্ণের অর্থ অনন্তবিস্তৃতি করেন।"

১০৯	১৪	আবৃত্ত	আবৃত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৬	২	স্বপ্নধীগম্য	সুষুপ্ত্যধিগম্য
ঐ	১২	শূন্য, দুঃখ	শূন্য এবং দুঃখ
ঐ	ঐ	হয়েন	০
১২১,১৬৪	৮,৯	ব্রহ্মের	ঈশ্বরের
১২৭	৯	ঘিষয়	বিষয়
১৩৩	১৭	কোন	কোন্
১৪০	১১	হইলে ও	হইলে
১৪১	৩	ছিন্নস্ত্রের	ছিন্নাভ্রের
১৪৫	২৬	স্বভার্থেন	স্বত্যর্থেন
১৫১	২০	মূল শক্তি	মূল সচেতন শক্তি
১৫৫	২১	বিষ	বিষয়ে
১৫৬	২৬	চেষ্ট	চেষ্টা
১৬১	১৭	শব্দও	শব্দ
১৬৫	১২	জগদ্বীজভূতা প্রকৃতি	জগদ্বীজভূতা অব্যক্তা প্রকৃতি
১৬৬	১৯	সৃষ্ট হইয়াছিল	সৃষ্টি করিয়াছিলেন
”	২৬	তাহা	তিনি
১৬৭	১১	ভ্রম বশত	ভ্রমবশতঃ
১৬৮	১৬	জল বহ্নি	জল বস্তি
১৭০ ১৭১	১০,১১,১৩ ১৭	প্রজ্ঞান ঘন বা	০
১৭১	৬	অবিদ্যা যুক্ত	অবিদ্যা মুক্ত
”	১৮	প্রজ্ঞান ঘনে	বিজ্ঞানে
১৭২	১৯	চিন্ময় প্রকৃতির	চিন্ময়, প্রকৃতির
১৭৪	৩	অহঙ্কার ও	অহঙ্কার, বিজ্ঞান ও
১৭৪	৪	(সমস্তজীবের...প্রকৃতি)	প্রাণ বা মূল অচেতন শক্তি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৪	৮	রহিয়াছে। অতএব	রহিয়াছে, অতএব
১৭৫	২৩	বিলুপ্ত	বিলিপ্ত
১৭৬	১৫	প্রেরিত	প্রেরিতা
১৭৮	৮	ধ্যানার্থী	ধান্যার্থী
১৭৯	৬	উদ্ভূতা	উদ্ভূত
১৮১	১২	পরিমাণ	পরিণাম
১৮২	২৬	বটেন	বটে
১৮৩	২৪	আত্মবিজ্ঞানের	আত্মজ্ঞানের

—:**:—

ওঁ নমো ব্রহ্মণে নমঃ

সরল বেদান্ত দর্শন।

প্রথম প্রবন্ধ।

অবিদ্যা বা অধ্যাস।

আমি, আমার, তুমি, তোমার, তিনি, তাঁহার, এই সকল শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমার, তোমার, তাঁহার, এই শব্দগুলি যথাক্রমে আমি, তুমি ও তিনি শব্দের সম্বন্ধপদ। আমার শরীর, আমার মন, এই সকল বাক্যে শরীর ও মনের অতিরিক্ত একটা "আমি" পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সেই "আমি" পদার্থকে চিন্ময় আত্মা বলা হয়। "আমি" শব্দকে এইরূপে বুঝিয়া লইয়া "আমার" শব্দ প্রয়োগ করিলে চিৎস্বরূপ আত্মার সহিত তদতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থের সংস্রবের কথা বলা হইতেছে এইরূপ বুঝা যায়।

এই "আমি" বা আত্মাকে "বিষয়ী" এবং তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থকে "বিষয়" কহা গিয়া থাকে। অন্ধকার এবং আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব, আত্মারূপ বিষয়ী এবং অনাত্মারূপ বিষয়ও পরস্পর সেই রূপ বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন। যাহা আলোক তাহা অন্ধকার নহে। যাহা বিষয়ী তাহা বিষয় নহে। সুতরাং বিষয়ীকে বিষয় বোধ করা অথবা বিষয়কে বিষয়ী বোধ করা রূপ ভ্রম হওয়া যুক্তিমত সম্ভব হয় না। যুক্তিমত সম্ভব না হইলেও কিন্তু লোক ব্যবহারে সচরাচর ঐ প্রকার ভ্রম হইতে দেখা যায়। আমি গৌর, আমি কৃশ, আমি যাইতেছি, এই প্রকার বাক্যের ব্যবহার সচরাচর

প্রচলিত আছে। এস্থলে "আমি" শব্দ দ্বারা "আমি"শব্দের আস্পদ চিন্ময় আত্মাকে না বুঝাইয়া অনাত্মা শরীরকে বুঝাইতেছে। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে,এইরূপ বোধ ভ্রমমাত্র—"আমি" শব্দ দ্বারা শরীর বুঝাইতে পারে না। আমার হস্ত বা পদদ্বয় সমগ্র শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে সেই ছিন্ন হস্ত পদ আর "আমি" শব্দ বাচ্য থাকে না।

আমাদের এই শরীর নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। শৈশবাবস্থায় যে চর্ম্ম, রক্ত, মাংস, এবং অস্থিতে আমার শরীর গঠিত ছিল, ক্রমাগত পরিবর্ত্তনে কৈশোরে আর ঠিক সেই চর্ম্ম, রক্ত, মাংস ও অস্থি, আমার শরীরে নাই; এবং কৈশোর অবস্থার শরীরের রক্তমাংসাদি বৃদ্ধাবস্থায় শরীরে থাকিবে না। কিন্তু শৈশব কালেও যে "আমি"কৈশোরে ও সেই "আমি",এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও সেই "আমি"। আমার নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল শরীর কখন "আমি"—শব্দবাচ্য, পরিবর্ত্তনরহিত, নিত্য, চিন্ময় আত্মা হইতে পারে না। অতএব আমি কৃশ, আমি গৌর, আমি যাইতেছি, এই সমস্ত বাক্যে অহং জ্ঞানজ্ঞেয় আত্মাতে (আমাতে) দেহরূপ অনাত্মার তাদাত্ম্যভ্রম হইয়া থাকে।

উক্ত প্রকার অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, আমার ইন্দ্রিয়শক্তি, আমার মন, এবং আমার বুদ্ধি, "আমি"—রূপ-আত্মা হইতে পৃথক্। স্বপ্নকালে, অথবা উন্মত্ত অবস্থায়,অথবা কামক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হইলে, আমার ইন্দ্রিয়শক্তি, আমার মন, এবং আমার বুদ্ধি বিকৃত হয়, কিন্তু "আমি" রূপ আত্মার কখন বিকৃতি হয় না। স্বপ্নহীন নিদ্রাকালে (সুষুপ্তি সময়) ইন্দ্রিয়শক্তি, মন, এবং বুদ্ধি অতি সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে; এমন কি তাহাদের অস্তিত্বমাত্র অনুভূত হয় না। কিন্তু ঐ সুষুপ্তির পর আমি যে সুপ্ত হইয়াছিলাম এটী অনুভব করিতে পারা যায়। সুতরাং পরিবর্ত্তনরহিত এই "আমি" জ্ঞানটী পরিবর্ত্তনশীল ইন্দ্রিয়শক্তি, মন, এবং বুদ্ধি হইতে পৃথক্। আমি অন্ধ ইহার অর্থ আমার দর্শনশক্তি নাই। আমি দুঃখী, আমি সুখী এই প্রকার বাক্যের প্রকৃত অর্থ, আমার মন সুখী, আমার মন দুঃখী। আমি জ্ঞানী, ইহার প্রকৃত অর্থ আমার বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা মার্জ্জিত। আমি অজ্ঞান ইহার অর্থ আমার বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা মার্জ্জিত নয়।

এইরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ভ্রমবশতঃই "আমি" শব্দ দ্বারা চিন্ময় আত্মাকে না বুঝিয়া অনাত্মা শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বা বুদ্ধিকে বুঝা যায়। লৌকিক ব্যবহারে এই আত্মা এবং অনাত্মার ভ্রম সচরাচর হইয়া থাকে। এই প্রকার ভ্রমকে "অধ্যাস" অথবা "আরোপ" বলা যায়। এই অধ্যাসকে পণ্ডিতেরা "অবিদ্যা" কহিয়া থাকেন। মরুভূমিতে মরীচিকাকে জলাশয় বলিয়া ভ্রম হয়। যতক্ষণ যথার্থ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ এই ভ্রম থাকে। এই ভ্রমে পতিত হইয়া অনেকে অনেকরূপ কষ্ট পাইয়া থাকে। কিন্তু ভ্রম অপসারিত হইলে বালুকারাশিকে বালুকারাশি বলিয়াই বোধ হয়। তখন আর ঐ ভ্রমজনিত কষ্ট পাইতে হয় না। অবিদ্যা ঘুচিয়া বিদ্যালাভ হইলেই অবিদ্যাজনিত কষ্ট হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। অবিদ্যা প্রভাবে "আমি" শব্দদ্বারা কখন শরীর বুঝায়, কখন ইন্দ্রিয়শক্তি বুঝায়, কখন মন বুঝায়, কখন বুদ্ধি বুঝায়, অর্থাৎ "আমি" শব্দের উপর শরীর, ইন্দ্রিয়শক্তি, মন এবং বুদ্ধির "আরোপ" বা "অধ্যাস" হয়। কিন্তু অবিদ্যা নষ্ট হইয়া বিদ্যা উৎপন্ন হইলেই "আমি" শব্দ দ্বারা চিন্ময় আত্মামাত্রই উপলব্ধ হয়।

এক পদার্থে অন্য পদার্থের আরোপই "অধ্যাস"। অন্ধকার ঘরে পতিত একগাছি রজ্জুতে সর্পভ্রম হইল এবং সর্পজনিত ভীতিও মনে উদিত হইয়া হৃৎকম্পের ও অন্যান্য উপদ্রবের কারণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যথার্থ জ্ঞানের উদয় হওয়ায় যখন জানিতে পারিলাম যে উহা সর্প নহে, রজ্জুমাত্র, তখন আমি হৃৎকম্পাদি উপদ্রব হইতে মুক্ত হইলাম। ইহার কারণ এই যে, রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বাস্তবিক সর্পের দোষ গুণ রজ্জুতে সংক্রামিত হয় নাই। এতদ্ দ্বারা বুঝা যাইবে যে যাহাতে যাহার অধ্যাস, তাহাতে তাহার দোষ গুণ অল্পমাত্রও স্পৃষ্ট হয় না। রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয় অথচ তাহাতে সর্পের সম্বন্ধ থাকে না, সর্পের দোষ গুণ স্পৃষ্ট হয় না। সর্পেও রজ্জুর দোষ গুণ অনুক্রামিত হয় না। এইরূপ আত্মাতে অনাত্মার এবং অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলেও আত্মা এবং অনাত্মা পরস্পরের দোষ গুণ দ্বারা লিপ্ত হইতে পারে না।

যতকাল অনাত্ম পদার্থে অবিদ্যা-কল্পিত "অহং" বা "আমি" জ্ঞান থাকিবে, ততকাল মনুষ্য বদ্ধ থাকিবে এবং অবিদ্যাজনিত কষ্ট ভোগ করিবে। বিচার এবং শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় দ্বারা যখন সেই অবিদ্যার লোপ হইয়া আত্মার যথার্থ জ্ঞান জন্মিবে, তখনই মনুষ্য মুক্ত হইবে এবং অবিদ্যা-জনিত কোন কষ্ট তাহাকে আর ভোগ করিতে হইবে না। অবিদ্যাই সকল অনর্থের মূল, আর সেই অবিদ্যার উচ্ছেদ জন্যই বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

প্রথম সূত্র ও "অথ" শব্দের অর্থ।

সমগ্র বেদ এবং উপনিষদ্ এই বেদান্তশাস্ত্রেরই শিক্ষা দিতেছেন। অজ্ঞান-তিমিরনাশক শাস্ত্রার্থ যাহাতে লোকে সহজে কণ্ঠস্থ করিয়া সর্ব্বদা স্মৃতিপথে রাখিতে পারে, সেই জন্য সর্ব্বজ্ঞ মহামুনি ব্যাসদেব অল্পাক্ষরে গ্রথিত কতকগুলি সূত্র * প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উহারই নাম বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র বা শারীরক সূত্র বা উত্তর মীমাংসা। বর্ত্তমানকালে যতগুলি সূত্র প্রচলিত আছে, তাহা সমস্ত ভগবান বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন সূত্রে "ভগবান্ ব্যাসদেবের এই মত" এই প্রকার উক্তি আছে। ব্যাসদেবের সময়ের পরে প্রাদুর্ভূত কতকগুলি ধর্ম্মের খণ্ডনও বর্ত্তমান সূত্র সমূহে আছে। সুতরাং বোধ হয় নূতন নূতন মতের আবির্ভাবের সহিত তাহাদের খণ্ডন জন্য কতকগুলি নূতন নূতন সূত্র ক্রমশঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরে যখন ক্রমশঃ জ্ঞানচর্চ্চার হ্রাস হওয়ায় সূত্রগুলির অর্থ লোকে বিস্মৃত হইতে লাগিল, তখন ভগবান শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া সমস্ত সূত্রগুলির সুবিস্তৃত ভাষ্য রচনাপূর্ব্বক সমস্ত ভ্রমান্ধকার নিরাকরণ করতঃ এই পুণ্য ভূমিতে সেই সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন করিলেন। শাঙ্কর ভাষ্যেরই অপর নাম শারীরক ভাষ্য। অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এই ভাষ্যের টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোবিন্দানন্দ, আনন্দগিরি, এবং বাচস্পতি মিশ্রের প্রণীত টীকাই সুপ্রসিদ্ধ।

যদিও ভগবান শঙ্করাচার্য্য সমস্ত বেদান্তসূত্রের বিস্তৃত ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন তথাপি তিনি আপন প্রতিভাবলে সহজেই অবধারণ করিয়াছিলেন

---

* লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ।

যে কলিকালে মানবের ধীশক্তি ক্রমশঃই কমিয়া আসিবে এবং তখন মানব সভাষ্য সমস্ত বেদান্তসূত্র আয়ত্ত করিতে কোন মতেই সমর্থ হইবে না। এই সমস্ত স্বল্পক্ষম মানবের প্রতি অনুগ্রহ করত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রথম চারি-সূত্রের ভাষ্যে সংক্ষিপ্তভাবে সমস্ত বেদান্ত দর্শনের সার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাকে চতুঃসূত্রী বলে। এই চতুঃসূত্রী সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে মানব সমস্ত বেদান্তদর্শন পাঠের ফললাভ করে। এই চতুঃসূত্রীর ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে।

১ম সূত্র ॥ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥

"অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই কয়েকটী কথা লইয়া সূত্রটী হইয়াছে। সচরাচর "অথ" শব্দ তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা (১) অনন্তর, (২) আরম্ভ, (৩) মঙ্গল। এখানে "অথ" শব্দের অর্থ "অনন্তর"। এমন কথা বলিতে পার যে, আরম্ভ অর্থে অথ শব্দের এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়—যথা, "অথ সন্ধি প্রকরণ" "অথ সমাস" এবং এখানেও অথ শব্দের সেই অর্থ। কিন্তু সে অর্থ এখানে হইতে পারে না। জ্ঞানার্থক জ্ঞা ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন "জিজ্ঞাসা" শব্দের অর্থ জানিবার ইচ্ছা। এবং "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" শব্দের অর্থ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। যদি "অথ" শব্দের আরম্ভ অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে এই প্রথম সূত্র দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার প্রকরণ আরম্ভ হইল এবং বেদান্তদর্শন গ্রন্থে ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা বিচারিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক বেদান্তদর্শন ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার প্রকরণ নহে এবং ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার বিষয় বিচার করাও বেদান্তদর্শনের তাৎপর্য্য নহে। "ব্রহ্ম কি বস্তু" "জীবের পরম পুরুষার্থ কি" এবং "কি উপায়ে অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়া যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায়" তাহা দেখানই বেদান্ত দর্শনের উদ্দেশ্য। সুতরাং আরম্ভ অর্থে এখানে "অথ" শব্দের প্রয়োগ হয় নাই।

আবার বলিতে পার যে মঙ্গল অর্থে "অথ" শব্দের প্রয়োগ হয় এবং মঙ্গল অর্থেই এখানে "অথ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু সে অর্থটী মঙ্গলা-

মঙ্গলের অতীত ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রে ঠিক খাটে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান চাহে তাহাকে "দুঃখেতে অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখেতে বিগতস্পৃহ" হইতে হইবে।

এ স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে "অথ" শব্দের মঙ্গল অর্থ কোন মতেই উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। স্মৃতিতে লেখা আছে * পূর্ব্বকালে ওঁ এবং অথ এই দুইটী শব্দ ব্রহ্মের কণ্ঠভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল সুতরাং এই উভয় শব্দই মাঙ্গলিক" অতএব "অথ" শব্দের মঙ্গল অর্থ করিতেই হইবে। ইহার উত্তর এই যে অনন্তর ও আরম্ভ অর্থেও অনেক স্থলে "অথ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং মঙ্গল অর্থ ভিন্ন "অথ" শব্দের ব্যবহার হয় না এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। "অথ" শব্দের অর্থ সঙ্কোচ করা উক্ত স্মৃতিবাক্যের বাস্তবিক উদ্দেশ্য নহে। রন্ধন, গৃহপরিষ্করণ, ঘটস্থাপন, প্রভৃতি যে কোন উদ্দেশ্যেই কুম্ভকে বারিপূর্ণ করা যাউক না কেন, পূর্ণকুম্ভ দর্শন মাত্রই যেমন শুভকর, সেইরূপ (১) আরম্ভ (২) মঙ্গল ও (৩) অনন্তর, এই তিন অর্থের মধ্যে যে কোন অর্থেই "অথ" শব্দ ব্যবহার করা হউক না কেন, পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবাক্যবলে "অথ" শব্দের শ্রবণ ও উচ্চারণ মাত্রই মঙ্গলকর। সুতরাং "অথ" শব্দের শ্রবণ ও উচ্চারণ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র মাঙ্গলিক হইলেও যেখানে অথ শব্দের যে অর্থ খাটে সেখানে "অথ" শব্দের সেই অর্থই করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান চাহেন তাঁহাকে মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা পরিত্যাগ করিতেই হইবে। সুতরাং "অথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই স্থানে "অথ" শব্দের মঙ্গল অর্থ খাটিতেই পারে না। "অথ" শব্দ শ্রবণ ও উচ্চারণ জন্য যাহা কিছু মঙ্গল হয় হউক কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বান্বেষীর সেদিকে লক্ষ্যই থাকে না। অতএব মঙ্গল অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেখিতে হইবে অন্য কোন্ অর্থ এখানে খাটিতে পারে। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে "অথ" শব্দের আরম্ভ অর্থও এখানে খাটে না। সুতরাং মঙ্গল ও আরম্ভ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এখানে "অথ" শব্দের অর্থ "অনন্তর" বলিতেই হইবে।

* ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠংভিত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ॥

"অনন্তর" শব্দের অর্থ "তাহার পর," এবং "অথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বাক্যের অর্থ "তাহার পর ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হয়।" যেখানে অধিকার চলে সেখানে ইচ্ছা করিলে সে ইচ্ছা ফলবতী হয়। যদি কোন মানব আকাঙ্ক্ষা করে যে করতলে চন্দ্র গ্রহণ করিব তাহা হইলে তাহার সেই অসম্ভব আকাঙ্ক্ষাকে বাতুলতা ভিন্ন ইচ্ছা বলা যায় না। অনধিকারীর অভিলাষ ইচ্ছা বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং "তাহার পর" ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হয় এই বাক্যের অর্থ এই যে তাহার পর সাধক ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করেন। "তাহার পর" এই কথা ব্যবহার করিলেই প্রশ্ন হয় "কিসের পর"। এই প্রশ্নের উত্তরলাভচেষ্টায় "অথ" শব্দের "অনন্তর" অর্থে অন্যত্র ব্যবহার কিরূপ হইয়াছে তাহারও একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এই কথা বলিয়া "পূর্ব্ব মীমাংসা" শাস্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। সেখানেও "অথ" শব্দের অর্থ "অনন্তর"। সেখানে বলা হইয়াছে যে, "বেদ" অধ্যয়ন করিলেই ধর্ম্ম * জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা হয়। যদি "বেদ" অধ্যয়ন করিলেই ধর্ম্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা হয় এই জন্য "অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" বাক্যে "অনন্তর" অর্থে "অথ" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখানে (অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা স্থলে) "অথ" শব্দের দ্বারা "বেদাধ্যয়নের পর ব্রহ্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা হয়" এমত বুঝাইতে পারে না কি? এ প্রশ্নের উত্তর— "পারে না"। কেন না "বেদ" অধ্যয়নের পর ধর্ম্মজিজ্ঞাসাই হয়, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হয় না। অতএব কিসের পর ব্রহ্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা হয়, তাহাই এখন অনুসন্ধান করিতে হইবে।

---

* ধৃতিঃক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥—ইতি মনু

ধৃতি (সন্তোষ) ক্ষমা (শক্তিসত্ত্বে অপরাধকারীর প্রত্যপকার না করা) দম (বিষয় সংসর্গেও মনের অবিকার) অস্তেয় (অন্যায় পূর্ব্বক পরধন হরণ না করা) শৌচ (যথাশাস্ত্র জল ও মৃত্তিকাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধি) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবর্ত্তন করা) ধী (প্রতিপক্ষ সংশয়াদি নিরাকরণ পূর্ব্বক সম্যক্ জ্ঞান লাভ) বিদ্যা (বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান) সত্য এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

এমত বলা যাইতে পারে যে, "ধর্ম্ম" জানিবার পর, ব্রহ্ম জানিবার অধিকারও ইচ্ছা হয়, এই অর্থে "অথ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু সে অর্থও খাটে না। কেন না, কেহ কেহ বৈদিক ধর্ম্ম না জানিয়াও কেবল বেদান্ত অর্থাৎ বেদের উপনিষদ্ ভাগ পড়িয়াই বা গুরুর উপদেশ শুনিয়াই ব্রহ্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা প্রাপ্ত হন। কিন্তু বেদান্ত পড়িলেই বা গুরুর উপদেশ শুনিলেই যে ব্রহ্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা হয়, তাহাও নহে। অনেকে দুই একবার বেদান্ত পড়িলেই বা গুরুর উপদেশ শুনিলেই মনে করেন, "আমি সব বুঝিয়াছি। উহাতে আমার জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই নাই।" তাঁহাদের আর ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা বা অধিকার হয় না। সুতরাং যদিও বেদান্তপাঠ এবং গুরূপদেশশ্রবণ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারের একটী দূর কারণ, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারের অব্যবহিত কারণ বেদান্ত পাঠ বা গুরূপদেশ শ্রবণ নহে।

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার সম্বন্ধে ৺ ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—

যাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণ ভাবে বিজিত হওয়ায় কোন পদার্থ যাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে না, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দে আসক্তি ও দ্বেষ রহিত হওয়ায় যিনি শরীরস্থিতিমাত্রোপযোগী পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ গ্রহণ করেন না, যিনি নির্জ্জন, পবিত্র, সাধুসেবিত স্থানে অবস্থান করেন, যিনি মিতভোজী, যাঁহার শরীর, মন ও বাক্য সমস্তই সংযত, যিনি সর্ব্বদাই ব্রহ্মকে ধ্যান করেন, দৃষ্টাদৃষ্ট সকল বিষয়েই যাঁহার বৈরাগ্য হইয়াছে, আমি ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী, এইরূপ অভিমান, কামরাগাদিযুক্ত বল, সাংসারিক বিষয়ে দর্প, ক্রোধ, এবং (শরীর ধারণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদার্থেও) প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া যিনি নির্ম্মম ও শান্ত হইতে পারেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হন। ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারী সাধকের মন প্রসন্ন হয়, সর্ব্বপ্রকার শোক ও আকাঙ্ক্ষা তিরোহিত হয়, সমস্ত ভূতে সমদৃষ্টি হয়, এবং ব্রহ্মে পরাভক্তি হয়। ব্রহ্মে পরাভক্তি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞান হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সাধক ব্রহ্মে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার সম্বন্ধে ৮ গীতা আরও বলিয়াছেন—

এই সমস্ত সৃষ্টি একটী অশ্বথ বৃক্ষ স্বরূপ। ব্রহ্ম ইহার মূল, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহা প্রকৃতি, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্ পুরুষ, জীব প্রভৃতি নানা ভাবে শাখা বিস্তার করিয়াছে। ইহা বাস্তবিক অনিত্য, কিন্তু ভ্রমবশতঃ লোকে ইহাকে নিত্য বলিয়া মনে করে। বেদোক্ত প্রবৃত্তিমার্গ এই সৃষ্টি-রূপ বৃক্ষের পত্রস্বরূপ হইয়া এই সৃষ্টি রক্ষা করে। এই সৃষ্টির তত্ত্ব যিনি সম্যক্ অবগত আছেন তিনিই বেদের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। এই সৃষ্টিবৃক্ষের শাখা সকল উত্তম মধ্যম ও অধম জীব রূপে নানাভাবে বিস্তীর্ণ আছে। সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক পদার্থে আকৃষ্ট থাকিয়া জীব এই সংসারে বদ্ধ থাকে, এবং রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ উপভোগ করে। জীব সকল সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হয় বটে কিন্তু প্রথম সৃষ্টির পর আপন আপন কর্ম্মফল বশতঃই জীব বারম্বার জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিতে থাকে। এই সৃষ্টির তত্ত্ব এবং এই সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত সহজে উপলব্ধ হয় না। ভ্রমবশতঃ জীব সকল এই সৃষ্টিকে নিত্য পদার্থ মনে করিয়া ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে। দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা সংসার বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক সৃষ্টির মূল কারণ সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। সেই ব্রহ্ম তত্ত্ব অবগত হইলে জীবকে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। অভিমানশূন্য, অজ্ঞানমুক্ত, অনাসক্তচিত্ত, পরমাত্মস্বরূপালোচনাতৎপর, কামনারহিত, সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ববর্জ্জিত সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করত অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ পুরুষার্থ লাভের জন্য যত্ন করেন। পুরুষার্থাকাঙ্ক্ষিগণের মধ্যে যাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করেন তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বলা যায়। যত্নশীল সেই সিদ্ধগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমার তত্ত্ব অবগত হন। হে ভারত! অবিদ্যাগ্রস্ত জীব ইচ্ছাদ্বেষসমুদ্ভূত, শীতগ্রীষ্মসুখদুঃখপ্রভৃতিদ্বন্দ্বজনিত মোহবশতঃ জন্ম গ্রহণ সময় হইতেই বিশেষ মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পুণ্যশালী জনগণের পাপ বিনষ্ট

হইয়াছে, তাঁহারা ইচ্ছাদ্বেষ-শীত-গ্রীষ্ম-সুখ-দুঃখাদি-বোধ-জনিত মোহ হইতে নির্ম্মুক্ত, এবং দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা জরা ও মরণ হইতে মুক্তির জন্য যত্ন করেন, তাঁহারাই পরম ব্রহ্ম, আত্মতত্ত্ব, এবং সমস্ত কর্ম্ম অবগত হইতে পারেন।

যতক্ষণ মনুষ্য অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া সাংসারিক পদার্থে ডুবিয়া থাকিবে ততক্ষণ ব্রহ্মপদার্থে তাহার মন যাইবে না। কিন্তু যখন বিচার দ্বারা মনুষ্য দেখিবে যে সংসারে কিছুরই স্থিরতা নাই, আজ সে যে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, স্ত্রী, পরিজন লইয়া সুখে মগ্ন রহিয়াছে, কাল তাহারা থাকিবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই; কাল যে রাজা আপনাকে ধনগর্ব্বে সুখী মনে করিয়াছেন, আজ হয় ত তাঁহাকে পরাজিত হইয়া বন্দিভাবে প্রাণদণ্ড ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছে; তখন মনুষ্যের অনিত্য সংসারের উপর বৈরাগ্য হইবে; তখন মনুষ্য দেখিবে যে সুখ দুঃখ অনিত্য। সুখ দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিলে মনুষ্য দেখিবে যে কোন অজ্ঞাতশক্তি এমন নিয়ম করিয়াছেন যে, মনুষ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে সুখ পাইবে এবং পাপ কর্ম্ম দ্বারা কষ্ট পাইবে। তখন মনুষ্য সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে দেখিবে যে, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ধর্ম্ম করিবে, সে সেই পরিমাণে সুখ পাইবে। আবার সুখ-ভোগ দ্বারা সুকৃতকর্ম্মক্ষয় হইলে, এবং নূতন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে, মনুষ্য পুনরায় নামিয়া আসিবে। তখন মনুষ্য দেখিবে যে কেবল ধর্ম্ম কর্ম্মদ্বারা "অক্ষয়" সুখ হইবার নহে, এবং সংসারে থাকিতে হইলেই সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হইবেই হইবে। আরও প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাইবে যে, মহাভারতপ্রণেতা সত্যই বলিয়াছেন—

"কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামাত্মাদিগের কামনা কদাপি নিবৃত্ত হয় না। পরন্তু অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে যেমন অগ্নির নিবৃত্তি না হইয়া বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ কামাত্মারা যতই কাম্যবস্তু পাইতে থাকে ততই তাহাদের কামনার বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীতে যত ধান্য যব সুবর্ণ পশু এবং কামিনী আছে সেই সমস্ত পাইলেও কামাত্মার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। অতএব তৃষ্ণা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি [illegible] াগ করিতে পারে

না। স্বয়ং জরাগ্রস্ত হইলেও কামাত্মাদিগের কামনা জীর্ণ হয় না। যতকাল জীবন থাকে ততকাল কামাত্মারা কামনারূপ রোগে কষ্ট পায়। যাহারা কামনারূপ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারে তাহাদেরই বাস্তবিক সুখ হয়।” তখন মনুষ্য দেখিবে যে ইহকাল ও পরকালে ভোগ বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করা, এবং মনকে বশীভূত এবং শান্ত করত নিত্য বস্তুতে মনোনিবেশ করাই “পরম সুখ।” তখন মনুষ্য গুরুর এবং বেদান্ত শাস্ত্রের, অর্থাৎ উপ-নিষৎ সমূহের, উপদেশ সকল অনুসরণ পূর্ব্বক নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকী, ইহামূত্রার্থফলভোগবিরাগী, শান্ত,দান্ত,উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাচিত্ত, সমাহিত,এবং মুমুক্ষু হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান করিবেন। এরূপ করিতে করিতে সাধক দেখিবেন যে আত্মাই ব্রহ্ম,এবং সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম বা আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত।

বিষয়ী আত্মাই নিত্য, আত্মার কখন বিনাশ বা ভাবান্তর হয় না, এবং অনাত্ম সমস্ত পদার্থ বা বিষয় অনিত্য ও বিকারশীল,—এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানকে বিবেক বলে। হিরণ্যগর্ভ লোক হইতে স্থাবর তৃণ পর্য্যন্ত পরলোক এবং ইহলোকের সমস্ত পদার্থই অকিঞ্চিৎকর এইরূপ জানিয়া উক্ত সমস্ত পদার্থে আসক্তিশূন্যতাকে বৈরাগ্য বলে। বৈরাগ্য হেতু বহিরিন্দ্রিয়ের সংযমের নাম শম। বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দ্বারা অন্তঃকরণের তৃষ্ণা নিবৃত্তির নাম দম। বিষয়ানুভব হইতে বিরত হওয়ার নাম উপরতি। শীতগ্রীষ্মসুখ-দুঃখসহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা বলে। গুরু এবং বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে। আত্মার প্রতি চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধান। এবং মুক্ত হইবার ইচ্ছার নাম মুমুক্ষুত্ব। এই সকল সাধনোপায় লাভ হইলেই মনুষ্যের ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা হয়। অতএব প্রথম সূত্রে যে “অথ” শব্দ আছে তাহার দ্বারা উল্লিখিতসাধনোপায়লাভের আনন্তর্য্য বা পর-বর্ত্তিতা বুঝাইতেছে। ফল কথা, যে ব্যক্তি ঐ সকল সাধন আয়ত্ত করিয়াছেন “তিনিই” ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের যথার্থ অধিকারী।

তৃতীয় প্রবন্ধ

অতঃ শব্দের অর্থ।

সূত্রে "অথ" শব্দের পর "অতঃ" শব্দ আছে। "অতঃ" শব্দের অর্থ "এই হেতু।" এই হেতু—এই কথা বলিলেই, প্রশ্ন হয় "কি হেতু"? হেতু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় যে, জীবমাত্রকেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আপন শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বা বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়া যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। রোগ কাম ক্রোধাদি এই দুঃখের কারণ। অন্য প্রাণী হইতে যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয় তাহার নাম আধিভৌতিক দুঃখ। ব্যাঘ্র চৌরাদি দ্বারা এই দুঃখ উৎপন্ন হয়। অগ্নি বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি হইতে যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয় তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা যায়। গৃহদাহ, শীত, ভূমিকম্প, বজ্রপাতাদি এই দুঃখের কারণ। এই ত্রিবিধ দুঃখের যে অত্যন্ত নিবৃত্তি তাহাই পরম পুরুষার্থ। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, ধন বিজ্ঞানাদি দ্বারা উক্ত দুঃখত্রয়ের কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করা যায় বটে, কিন্তু কোন প্রকার লৌকিক উপায়েই ঐ সমস্ত দুঃখের একেবারে নিবৃত্তি হয় না। এক্ষণে এমন বলা যাইতে পারে যে, ধনাদি দ্বারা অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি না হউক, বৈদিক কর্ম্ম অর্থাৎ যাগাদি দ্বারা অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। কিন্তু বেদেতেই, অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মের ফল অনিত্য, ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নিত্য, বলিয়া প্রকাশ আছে।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—ইহসংসারে স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত দ্রব্য সকল যেমন ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া থাকে, অমুত্র অর্থাৎ পরলোকে যজ্ঞাদিপুণ্যকর্ম্মোপার্জ্জিত লোক সকলও সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মোপার্জ্জিত দ্রব্য এবং লোক—সমস্তই অনিত্য।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—যাঁহারা সংসারের তত্ত্ব অবগত হইয়া সংসারাসক্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করত মোক্ষার্থে ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চিলোক, অহর্লোক, শুক্লপক্ষ-লোক, উত্তরায়ণলোক, সম্বৎসরলোক, আদিত্যলোক, ও চন্দ্রলোক হইয়া বিদ্যুৎলোকে গমন করেন। তাহার পর অমানব পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এই পথকে দেবযান বলে। অতঃপর পিতৃযানের কথা হইতেছে। যাঁহারা সংসারকে সত্য মনে করিয়া অগ্নিহোত্রাদি বৈদিকধর্ম্ম, বাপীকূপ তড়াগাদি খনন, ও দান প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্ম, এবং ঈশ্বর উপাসনা পূজাদি দ্বারা অভ্যুদয় কামনা করেন, তাঁহারা ধূমলোক, রাত্রি-লোক, ও কৃষ্ণপক্ষলোক হইয়া দক্ষিণায়নলোকে গমন করেন। সেখান হইতে তাঁহারা সম্বৎসর লোক এবং আদিত্য লোকে না গিয়া পিতৃ লোকে গমন করেন। অনন্তর পিতৃলোক হইতে আকাশলোক দিয়া চন্দ্রলোকে গমন করেন। এইখানে তাঁহাদের উর্দ্ধগতি রোধ হয়, এবং এইখানে তাঁহারা আপন আপন কর্ম্মফলানুরূপ সুখ ভোগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই সুখ নিত্য নহে। ভোগ দ্বারা তাঁহাদের কর্ম্মফল যতকাল না ক্ষয় পায়, ততকাল মাত্র তাঁহারা চন্দ্র লোকে থাকিতে পান। অনন্তর তাঁহারা বক্ষ্যমাণ পথ দিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।*

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন—অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, অতিথিসেবা প্রভৃতি ইষ্টাখ্যকর্ম্ম, এবং বাপীকূপতড়াগাদিখনন প্রভৃতি পূর্ত্তকর্ম্মকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া যাঁহারা কেবল ঐ সমস্ত কর্ম্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধিক্ষয়যুক্ত চান্দ্রমসলোক প্রাপ্ত হন। ভোগদ্বারা যতকাল না কর্ম্মফল-ক্ষয় হয়, ততকাল তাঁহারা উক্ত লোকে সুখভোগ করেন। ভোগদ্বারা কর্ম্মফলক্ষয় হইলে পর তাঁহারা চান্দ্রমস লোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

---

* কেহ কেহ এই শ্রুতির অর্থ অন্য প্রকার বলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এই দুই মার্গের কথা আছে। সেই উক্তি এই প্রবন্ধের শেষভাগে উদ্ধৃত হইবে। তথায় সেই অন্য অর্থ বিবৃত হইবে।

কিন্তু যাঁহারা অন্তরিন্দ্রিয় এবং বাহ্যেন্দ্রিয় জয় করত গুরুবাক্যে এবং শাস্ত্রে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক শাস্ত্রোপদিষ্টমার্গ অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা বৃদ্ধিক্ষয়শূন্য আদিত্যলোক প্রাপ্ত হন। চান্দ্রমস প্রভৃতি সমস্ত লোকই এই আদিত্যলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই অক্ষয় আদিত্যলোকের তত্ত্ব না জানা বশতই কর্ম্মিগণ সুখসম্ভোগের জন্য চান্দ্রমস লোক প্রার্থনা করে। বাস্তবিক এই আদিত্যলোকই অবিনাশী, ভয়রহিত, এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এই আদিত্যলোক হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন—যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ষোড়শ ঋত্বিক, পত্নী, এবং যজমান এই অষ্টাদশ অঙ্গের প্রয়োজন। এই অষ্টাদশ ব্যক্তির সকলের চিত্ত স্থির নহে। সুতরাং যজ্ঞ সকল সহজে সুসম্পন্ন হয় না। আবার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলেও যে ফল লাভ হয় তাহাও অনিত্য। যে সকল মূঢ়েরা যজ্ঞ-ক্রিয়াকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞসম্পাদনতৎপর থাকে, তাহাদিগকে বারম্বার জন্মগ্রহণ এবং জরামৃত্যুভোগ করিতে হয়। যাহারা যজ্ঞকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, তাহারা বাস্তবিক অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়াও আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ এবং জ্ঞানী মনে করে। একজন অন্ধ ব্যক্তি অন্য কতকগুলি অন্ধ ব্যক্তির পথ প্রদর্শক হইলে যেমন সকলেই গর্ত্তকূপাদিতে পতিত হয়, সেইরূপ উক্ত অবিদ্যাগ্রস্ত পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের উপদেশমত যে সকল মূর্খেরা কর্ম্মকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহারা এবং তাহাদের গুরু সকল বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করে এবং নানা-প্রকার অনর্থসমূহদ্বারা পীড়িত হয়। যাগাদি শ্রুতিবিহিত কর্ম্ম, এবং বাপী কূপ তড়াগাদি স্মৃতিবিহিত কর্ম্মই পরম পুরুষার্থ—এইরূপ বিশ্বাস থাকায় ঐ সকল মূঢ়েরা পরম শ্রেয়স্কর আত্মজ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকে। শ্রৌত এবং স্মার্ত্তকর্ম্ম সম্পাদন করায় তাহারা ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিহিত উক্ত কর্ম্ম সকলের ফল প্রাপ্ত হয়। ভোগ দ্বারা সেই কর্ম্মফলক্ষয় হইলে পর তাহারা পুনরায় মনুষ্য লোকে প্রত্যাগমন করে, অথবা যদি তাহাদের কোনও জন্মার্জ্জিত পাপকর্ম্মফল সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে তাহারা তির্য্যগাদি অধমযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেন—বেদ না জানিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে জীব যেমন বৈদিক কর্ম্ম অসম্পন্ন রাখিয়া যায়, এবং সাংসারিক কর্ম্ম না জানিয়া মৃত হইলে জীবের সাংসারিক কর্ম্ম যেমন অসম্পন্ন থাকিয়া যায়, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব না জানিয়া স্থূলদেহ ত্যাগ করিলে জীবের পুরুষার্থ অসম্পন্ন থাকে। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহলোকে চিরকাল মহৎপুণ্যকর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিলেও তাহার অক্ষয় সুখ হয় না। উক্ত কর্ম্ম সকলের ফল, ভোগ হইলেই, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব আত্মতত্ত্বানুসন্ধানই কর্ত্তব্য। যে সাধক আত্মজ্ঞানলাভার্থ তপস্যা করিয়া আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তাঁহার তপস্যার ফল কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—মৈত্রেয়ী বলিলেন,এই সসাগরা পৃথিবী যদি ধনপূর্ণা হয়,এবং ঐ সমস্ত ধনদ্বারা যদি অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞ, এবং বাপীকূপতড়াগাদিখনন প্রভৃতি সমস্ত সাধুকার্য্য সম্পন্ন করি, তাহা হইলে আমি অমর হইতে পারি কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ঐ সমস্ত উপায় দ্বারা অমর হওয়া যায় না। প্রভূতধনশালী ব্যক্তিসকল আপন আপন ধনদ্বারা যে প্রকার অনিত্য এবং আংশিক সুখ ভোগ করিয়া থাকে, ঐ সমস্ত ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম করিলে তুমিও সেই প্রকার সুখভোগ করিবে। কর্ম্মের আধিক্যানুসারে সুখের কাল এবং পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে বটে, কিন্তু ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মদ্বারা লব্ধ সুখমাত্রই অনিত্য এবং আংশিক। বিত্তদ্বারা অমরত্ব প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ আরও বলিয়াছেন—কাম্যপদার্থপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় জীব কর্ম্ম করে। উক্ত আকাঙ্ক্ষায় জীব যে পরিমাণ কর্ম্ম করিতে পারে, সেই পরিমাণ কাম্য পদার্থ জীব আপনার কর্ম্মফলস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। আপন কর্ম্মের ফল ভোগদ্বারা ক্ষয় পাইলে,পুনরায় কর্ম্ম করিবার জন্য জীব কর্ম্মভূমিতে প্রত্যাগমন করে। কামনা-পরতন্ত্র সাধকগণ এই প্রকার পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল গতি পাইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ঐহিক এবং পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কামনাশূন্য হইয়া কেবল আত্মজ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্রোপদিষ্টমার্গ অবলম্বন করেন, এবং কবে আত্মজ্ঞানলাভ

হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসুক না হইয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রের বিধি প্রতিপালন করিতে থাকেন, তিনি উপযুক্ত সময়ে আত্মজ্ঞানলাভ করেন। তখন তিনি দেখিতে পান যে, বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় এবং শরীর হইতে পৃথক্ তাঁহার চিন্ময় আত্মা, এবং সৃষ্ট জগৎ হইতে পৃথক্ চিন্ময় ব্রহ্ম, এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এবং চিন্ময় আত্মা ও চিন্ময় ব্রহ্ম অভিন্ন অর্থাৎ একই পদার্থ। মৃত্যুর পর অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণের ন্যায় আত্মজ্ঞানীর প্রাণ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে যায় না। আত্মজ্ঞানীব্যক্তি আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দেখিতে পাওয়ায় তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন,অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে যে অবিদ্যাবশতঃ তিনি আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ মনে করিতেছিলেন, তাঁহার সেই অবিদ্যা লোপ পায় এবং আত্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বেও তিনি ব্রহ্ম ছিলেন,পরেও তিনি ব্রহ্ম থাকিলেন এই জ্ঞান তাঁহার প্রত্যক্ষ হয়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে আরও উক্ত আছে—গার্গীকে সম্বোধন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি ইহলোকে বহু বৎসরব্যাপী যজ্ঞ বা তপস্যা করে তাহার কর্ম্মফল অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ ভোগ দ্বারা সেই কর্ম্মফল কোন না কোন কালে নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় সে ব্যক্তি কৃপণ মনুষ্যের ন্যায় শোকের পাত্র। কৃপণ মনুষ্য ধন পাইয়াও হতভাগ্য বশতঃ ধনের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিও মনুষ্য জন্ম পাইয়াও হতভাগ্য বশতঃ পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে পারে না। অতএব কৃপণ মনুষ্য এবং অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি উভয়েই শোচ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানিতে পারেন তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ এবং তিনিই সম্যক্ পুরুষার্থ লাভ করেন।

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—

অজ্ঞানী মনুষ্যগণ অনাত্ম বিষয় সকল কামনা করে এবং নানাভাবে বিস্তীর্ণ মৃত্যুর বশীভূত হয়। বিবেকী পুরুষেরা একমাত্র ব্রহ্মকেই নিত্য বলিয়া জানেন, সুতরাং তাঁহারা ঐহিক অথবা পারলৌকিক ইষ্টা-

পূর্ত্তাদি কর্ম্মদ্বারা মুক্তি প্রাপ্তির চেষ্টা করেন না। সেই ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও সমস্ত জগৎ তাঁহার বশীভূত। তিনি সমস্ত ভূতের আত্মা। তিনি আপনিই নানা দর্শক এবং দৃশ্য ভাবে প্রকাশিত হন। যে সকল বিবেকী পুরুষেরা ব্রহ্মকে আপনাদিগের আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন কেবল তাঁহারাই অনন্ত শান্তি প্রাপ্ত হন। অপরের ভাগ্যে তাহা ঘটে না।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিয়াছেন—

আমি এই মহান্ ব্রহ্মকে জানি। ইনি চিন্ময় ও স্বপ্রকাশ। ইহাঁতে অজ্ঞানের লেশ মাত্র নাই। একমাত্র এই ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে জীব মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করিতে পারে। সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন দ্বিতীয় উপায় নাই।

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাও বলিয়াছেন—

ঋগ্‌যজুঃসামবেদোক্তকর্ম্মপর যাজ্ঞিক সকল আমাকে ইন্দ্র বসু বরুণাদি দেবরূপে পূজা করেন এবং যজ্ঞশেষে সোমপানপূর্ব্বক নিরস্ত পাপ হইয়া স্বর্গগমন প্রার্থনা করেন। তাঁহারা আপন পুণ্যফলরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া তথায় দেবভোগ্য উত্তম পদার্থ সকল ভোগ করেন।

কিন্তু এই কর্ম্মফল যতই অধিক হউক না কেন ইহা কখন অনন্ত হইতে পারে না। সকল কর্ম্মফলই ক্রমশঃ ভোগদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তবে যাঁহার কর্ম্মফল যত বেশী তিনি তত অধিক দিন স্বর্গে থাকেন এবং তত অধিক সুখ ভোগ করেন। ভোগদ্বারা এই কর্ম্মফল ক্ষয় পাইলে অবশেষে জীবকে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। আবার মর্ত্ত্যলোকে জীব যে কর্ম্ম করিবে তাহার উপযুক্ত ফল পুনরায় উপযুক্ত লোকে তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। বৈদিক কর্ম্মের নিয়ম এই যে, যাঁহারা বৈদিক কর্ম্মকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া বৈদিক কর্ম্ম সম্পন্ন করেন তাঁহারা বৈদিক কর্ম্মের ফল ভোগ করেন এবং সেই কর্ম্মফল ভোগের জন্য নানা লোকে ভ্রমণ করেন এবং ভোগদ্বারা কর্ম্মফল ক্ষয় পাইলে পুনরায় কর্ম্ম করিবার জন্য কর্ম্মভূমি মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

যে পরম পদ প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না

সেই মায়াতীত ব্রহ্মপদকে শাস্ত্র অব্যক্ত এবং অক্ষর নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সমস্ত জগৎ সেই অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের অন্তর্গত এবং সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া ব্রহ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নাই এই জ্ঞানসহ একান্ত ভক্তিভাবে ব্রহ্মের শরণ লইলে তবে প্রত্যাবর্ত্তন রহিত ব্রহ্মপদ পাওয়া যাইতে পারে।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে মার্গ অবলম্বন করিলে জীবকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না এবং যে মার্গ অবলম্বন করিলে কর্ম্মফল ক্ষয়ের পর জীবকে কর্ম্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় তাহার বিবরণ বলিতেছি।

কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করতঃ যে সাধক অজ্ঞান তিমিরনাশক চিন্ময় ব্রহ্মের শরণ গ্রহণ করেন এবং অনন্তভক্তি সহকারে সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করেন তাঁহার জ্ঞান উত্তরোত্তর নির্ম্মল হইতে থাকে এবং অবশেষে অবিদ্যামুক্ত হইয়া তিনি বৃদ্ধি ক্ষয় পরিবর্ত্তন রহিত ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

কর্ম্মফলে আসক্তচিত্ত সাধক কর্ম্মমার্গাবলম্বনকেই পরম পুরুষার্থ মনে করিয়া কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করেন। আপন কর্ম্মফলে তিনি নানা প্রকার সুখভোগ করেন। এই সুখভোগ হেতু তাঁহার ভোগতৃষ্ণা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হয় এবং জ্ঞানমার্গ হইতে তিনি ক্রমাগত অধিকতর দূরে অপসৃত হন। কিন্তু তাঁহার এই সুখ সকল অনিত্য। ভোগদ্বারা তাঁহার কর্ম্মফল ক্ষয় পাইলেই তাঁহাকে পুনরায় কর্ম্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

জ্ঞানমার্গকে শুক্লমার্গ এবং কর্ম্মমার্গকে কৃষ্ণমার্গ বলা যায়। যতকাল সৃষ্টি থাকে ততকাল এই দুই মার্গ প্রচলিত থাকে। জ্ঞানমার্গাবলম্বনের ফল অনাবৃত্তি বা মোক্ষ এবং কর্ম্মমার্গাবলম্বনের ফল প্রত্যাবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ সংসার ভ্রমণ।

এই উভয় মার্গের ফল পরিজ্ঞাত হইলে যোগীপুরুষ আর ভ্রমে পতিত হন না। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানমার্গ অবলম্বন কর।

বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের যে সকল পুণ্যফল কর্ম্মকাণ্ডে উক্ত আছে, জ্ঞানমার্গাবলম্বী তাহার অধিক ফল লাভ করেন; তাঁহার অবিদ্যা ক্রমশঃ লোপ পায়; এবং অবশেষে তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য সমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে (১) যাগাদি কর্ম্ম দ্বারাও অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায় না, (২) ব্রহ্মজ্ঞানই অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় এবং (৩) ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করাই মুমুক্ষুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। সুতরাং "অতঃ" শব্দের দ্বারা এই বুঝাইতেছে যে, যেহেতু লৌকিক-উপায় সাধ্য এবং যাগাদি কর্ম্ম-নিষ্পাদ্য ঐহিক ও পারলৌকিক ফল অনিত্য এবং কেবল একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই অবিদ্যানাশক হইয়া সমস্ত কষ্ট হইতে মনুষ্যকে মুক্ত করে, অতএব শম দমাদি সাধনযুক্ত হইয়া মনুষ্য ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে।

চতুর্থ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ।

সূত্রের শেষ কথা "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। "ব্রহ্ম" শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—যথা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ এবং পরমব্রহ্ম। দ্বিতীয় সূত্রে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে। সেখানে ব্রহ্মের যে অর্থ উক্ত হইয়াছে প্রথম সূত্রেও ব্রহ্মের সেই অর্থ বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানার্থক জ্ঞা ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন্ প্রত্যয় করিয়া জিজ্ঞাসা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ "জানিবার ইচ্ছা"। কোন এক বস্তু জানিবার ইচ্ছা হইলে সেই অভিলাষ পূরণের চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টার নাম উপায় বিধান বা সাধনা। সাধনার নিমিত্ত ইন্দ্রিয় এবং মনকে একাগ্র করার নাম তপ বা তপস্যা *। তপস্যার ফল, সিদ্ধি বা অভিলাষ-পূরণ। জানিবার ইচ্ছার বা জিজ্ঞাসার পর সাধনা এবং তপস্যা করিলে ফল হয়—জ্ঞান। জ্ঞান দুই প্রকার। অপরোক্ষ এবং পরোক্ষ। মনে কর "সিংহ" এই কথাটী শুনিয়া সিংহ কি পদার্থ জানিবার ইচ্ছা হইল। সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য কেহ অন্যকে প্রশ্ন করিল, কেহ বা অভিধান দেখিল, কেহ বা পশুশালায় চলিয়া গেল। যাহারা অন্যকে প্রশ্ন করিয়া কিম্বা অভিধান দেখিয়া জানিল তাহারা বুঝিল যে সিংহ এক প্রকার পশু; বল প্রভৃতি তাহার কতকগুলি বিশেষ গুণ অথবা লক্ষণ আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি পশুশালায় গিয়া সিংহ দেখিল সে সিংহের স্বরূপ জ্ঞান পাইল। কেবল গুণ বর্ণনায় অথবা লক্ষণ শুনিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু সিংহ দেখিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান। জ্ঞেয় বস্তুর ভেদে জ্ঞান নানা প্রকার। একটী সিংহ দেখিয়া এক প্রকার জ্ঞান

---

* মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পর উচ্যতে॥

হয়, অপর একটী সিংহ দেখিয়া এটী সেটী হইতে পৃথক্ সেইরূপ অন্য প্রকার জ্ঞান হয়। আবার সিংহ ব্যাঘ্র হইতে পৃথক্। সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদি গো অশ্ব হইতে পৃথক্। পশু সকল অন্য জন্তু সকল হইতে পৃথক্। জন্তু সকল উদ্ভিদ্ হইতে পৃথক্। প্রাণিগণ নির্জীব পদার্থ হইতে পৃথক্। জড় পদার্থ চিৎ পদার্থ হইতে পৃথক্। এই প্রকার জ্ঞেয় বস্তুর পার্থক্যে জ্ঞানের পার্থক্য হইয়া থাকে।

একটী জ্ঞেয় বস্তু অন্য একটী জ্ঞেয় পদার্থ অপেক্ষা যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট সেই প্রথমোক্ত-বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান ও সেই দ্বিতীয়-পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞান হইতে সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট।

বৃহ্ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃহ্ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি এবং মন্ প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয়। সুতরাং ব্রহ্ম শব্দের ধাতু ঘটিত অর্থ যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই। এই হেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জ্ঞান অন্য সমস্ত জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মুণ্ডকোপ-নিষদে কথিত আছে যে, একদা মহাগৃহস্থ শৌনক স্বীয় আচার্য্য অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কোন্ বস্তু জানিতে পারিলে সকল বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়" ?

উত্তরে অঙ্গিরা ঋষি বলিয়াছিলেন "বেদার্থাভিজ্ঞ পরমার্থদর্শীরা বলিয়া থাকেন যে, লোকের জ্ঞাতব্য দুই প্রকার বিদ্যা আছে। তাহাদের নাম পরা এবং অপরা। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, প্রভৃতি যত প্রকার শাস্ত্র আছে কেবল সে সমস্ত পাঠ বা কেবল গুরু প্রভৃতির উপদেশ শুনিয়া যে বিদ্যা লাভ হয় তাহা অপরা বিদ্যা। এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং গুরু প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ দ্বারা জগতের সমস্ত দ্রব্য, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তাহাদের ফল, এবং ব্রহ্মের লক্ষণ সমূহ জানা যায়। অতঃপর পরা বিদ্যার বিষয় বলা হইতেছে। এই পরা বিদ্যার দ্বারা জীব সেই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। সেই ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত। কেবল শাস্ত্রপাঠ ও গুরু প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে জানা

যায় না। তিনি সকলের কারণ, তাঁহার কোন কারণ নাই। দ্রব্য সকলের শুক্লত্ব কৃষ্ণত্ব প্রভৃতি গুণ সমূহ তাঁহাতে নাই। চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় তাঁহার নাই। তবে কি তাঁহার অস্তিত্ব নাই? না তাহা নহে। তিনি নিত্য নির্ব্বিকার এবং অবিনাশী। তাঁহারই সঙ্কল্প প্রভাবে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ নানা ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় তাঁহার না থাকিলেও উক্ত ইন্দ্রিয় সকলের সমস্ত শক্তি তাঁহাতে বিদ্যমান আছে। সমস্ত জগৎ তাঁহার সঙ্কল্প মাত্র এবং তাঁহার অন্তর্গত। একমাত্র বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত পথ অবলম্বন করিলে পরা বিদ্যা লাভ হয় এবং ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। যে সকল সাধকেরা উক্ত পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন তাঁহারা দেখিতে পান যে, ব্রহ্ম বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি সমস্ত পরিবর্ত্তন রহিত, অথচ তাঁহারই সঙ্কল্পদ্বারা এই সমস্ত জগৎ ইন্দ্রজালের ন্যায় প্রকাশিত রহিয়াছে। যেমন মায়াবীর মায়া ভিন্ন ইন্দ্রজালের অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ ব্রহ্মের সঙ্কল্প ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব নাই। যেমন মায়া প্রসারণ জন্য মায়াবীর বৃদ্ধি ক্ষয় হয় না, সেইরূপ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মের বৃদ্ধি ক্ষয় হয় না। তবে কি ব্রহ্মের সঙ্কল্প ভিন্ন এই জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই? ইহার উত্তর এই যে তাহাই বটে। ব্রহ্মের সঙ্কল্প ভিন্ন বাস্তবিকই এই জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মকে কোন প্রকার উপকরণ গ্রহণ করিতে হয় নাই। তপ দ্বারাই অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ের আলোচনা করিয়াই তিনি সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। সেই তপ হইতে বুদ্ধি মন প্রভৃতি সমস্ত স্রষ্টব্য পদার্থের বীজ স্বরূপা অব্যক্তা প্রকৃতি উৎপন্না হয়। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সম্পন্ন জীবগণ এবং আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি, এই পঞ্চ মহাভূত এবং পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ প্রভৃতি ভুবন সকল এবং কর্ম্মের ফল সকলের সৃষ্টি হয়। যতকাল এই সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত থাকে ততকাল এই কর্ম্মফল এক প্রকার অবিনাশী। যখন মহাপ্রলয়কালে সৃষ্টির লোপ হয় অথবা যখন

ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই সৃষ্টিকে সঙ্কল্পময়ী অতএব পারমার্থিক অস্তিত্ববিহীন বলিয়া জীবের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, কেবল তখন কর্ম্মফলের লোপ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, জড় হইতেই জড়ের উৎপত্তি হয়। এই জড় জগৎ যদি সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে ব্রহ্মকেও জড় পদার্থ বলিতে হইবে। তাহার উত্তর এই যে, সেই ব্রহ্ম সমস্ত জগতের জ্ঞাতা অতএব এই সমস্ত জগৎ হইতে তিনি পৃথক্। জগতের সমস্ত পদার্থ এবং তাহাদের গুণাগুণ ও ক্রিয়া সকল তাঁহার জ্ঞানেতেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার তপ ও তাঁহার জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। স্বপ্নকালে যেমন জীবগণের মনই স্বপ্নদৃষ্ট জড় জগৎ সৃষ্টি করে, সেই প্রকারে সেই ব্রহ্ম মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শক্তি সমন্বিত জীবগণকে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দময় ও নানা নামে অভিহিত এই স্থূল জগৎকে এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের বীজস্বরূপা অব্যক্তা প্রকৃতিকে চিন্তা করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মের তপ বা আলোচনা ভিন্ন অব্যক্তা প্রকৃতি বা এই জগতের অন্য কোন কারণ বা পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মের এই সঙ্কল্প (Design) বা জ্ঞানকেও ব্রহ্ম বা বেদ বলা যায়। সেই বেদ হইতেই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হয়। জগতের সহিত তুলনায় এই বেদ নিত্য। সৃষ্টির পর এই বেদই শাস্ত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অনন্তর অপরা বিদ্যার বিষয় বর্ণনা পূর্ব্বক পরা বিদ্যার অধিকার কিরূপে হইতে পারে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। পদার্থ বিজ্ঞান সাধ্য এবং যাগাদি নিষ্পাদ্য কর্ম্মফল সকল পরীক্ষা করিয়া বেদজ্ঞ ব্যক্তি যখন দেখিতে পান যে, উক্ত কর্ম্মফল সকল অনিত্য এবং কর্ম্মদ্বারা নিত্য সুখলাভ করা অসম্ভব, তখন এই অনিত্য জগতের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভার্থ তিনি যজ্ঞার্থ কাষ্ঠভার গ্রহণ পূর্ব্বক বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও গুরু ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে ব্রহ্মতত্ত্বান্বেষণ কর্ত্তব্য নহে। আপন বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারিয়াছে কি না তাহা জীব আপনা আপনি বুঝিতে পারে না।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্য পরাবিদ্যা লাভার্থ ব্রহ্মতত্বজ্ঞ আচার্য্যের সন্নিধানে যথাবিধি উপস্থিত হইলে আচার্য্য দেখিবেন যে, শিষ্যের ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণরূপে বিজিত এবং অন্তঃকরণ সংসারাসক্তিশূন্য হইয়াছে কি না। যদি শিষ্য বাস্তবিক শান্ত ও দান্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে যে বিদ্যার দ্বারায় সেই অক্ষর ব্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে জানা যায় সেই পরাবিদ্যা আচার্য্য শিষ্যকে প্রদান করিবেন।

এক্ষণে সেই পরাবিদ্যার বিষয় উপদেশ দেওয়া হইতেছে। উপনিষদ্ সমূহে উপদিষ্ট মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে উপাসনা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত শর সন্ধান কর। অনন্তর ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তিযুক্ত মন দ্বারা উক্ত ধনুর জ্যা আকর্ষণ করত সেই অক্ষর লক্ষ্য বিদ্ধ কর।

ওঁকার ঐ উপনিষদুপদিষ্ট ধনু, আত্মা শর, এবং ব্রহ্ম সেই অক্ষর লক্ষ্য। শর যেমন লক্ষ্য বস্তুতে বিদ্ধ হইয়া লক্ষ্য-বস্তুর অংশ হইয়া যায় সেইরূপ যতকাল না "আমিই ব্রহ্ম" এই প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ততকাল ওঁকার মন্ত্র জপ করত অনন্যমনে ও ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ব্রহ্মধ্যান কর্ত্তব্য। এই প্রকারে ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে ভেদজ্ঞান লোপ পায় এবং "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ব্রহ্মই সমস্ত প্রাণীর আত্মা এবং সমস্ত পদার্থের স্বরূপ। অবিদ্যা প্রযুক্ত জীব সকল এই ব্রহ্মকেই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, প্রভৃতি স্থূল পদার্থ এবং মন প্রাণ প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থভাবে দর্শন করে। এই সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বময় সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মকে উপরি উক্ত উপায়ে আপন আত্মস্বরূপে অপরোক্ষভাবে জানিবার চেষ্টা কর এবং অপরা বিদ্যা পরিত্যাগ কর। এইরূপ সাধনাই মোক্ষের একমাত্র উপায়।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি জীবাত্মা ও ব্রহ্ম স্বাভাবিক ভিন্ন হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে তাহাদের অভেদ জ্ঞান বা "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে।

এই আশঙ্কার পরিহার এই যে, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম পৃথক্ নহে। উভয়ই

এক বস্তু। যে ব্রহ্ম এই সমস্ত জগতের সত্বা, যে ব্রহ্মের জ্ঞানাংশ লইয়া এই সমস্ত জগতের জ্ঞান, যাঁহার জ্ঞানে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত, এই জগৎ যাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে, সেই ব্রহ্মই জীবের হৃদয়াকাশে আনন্দময় আত্মা। ইনিই জীবের অন্নময় স্থূলশরীর এবং ইনিই প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ ভাবে * প্রকাশিত রহেন। শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়ে যখন বিবেকীরা ইহাঁর আনন্দস্বরূপ ভাব অপরোক্ষরূপে দেখিতে পান তখন

* সর্ব্বোপনিষৎ-সারোপনিষদে এবং তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে জীবের পঞ্চকোষ বিবৃত আছে। অস্থি, মজ্জা, মেদ, ত্বক্, মাংস ও রক্ত অন্নের কার্য্য; এই ষট্‌কোষময় স্থূল শরীরই অন্নময় কোষ। পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে প্রাণময় কোষ বলে। পঞ্চ প্রাণের বিশেষ বিবরণ পঞ্চম প্রবন্ধে বলা হইবে। কল্পনা, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্তের সমষ্টিকে মনোময় কোষ বলে। মন শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখন বা কেবল মাত্র কল্পনাকেই মন বলা যায়; কখন বা মনোময় কোষই মন নামে অভিহিত হয়; কিন্তু অনেক স্থলেই মন শব্দ দ্বারা কেবল মাত্র চিত্ত বা অন্তরিন্দ্রিয়ই বুঝা যায়। বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগৎ বিষয়ক বিবিধ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। ইহা হইতেই কল্পনা, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার প্রাদুর্ভূত হয়; ইহা সর্ব্বদা বীজভাবে জীবের চিত্তে বর্ত্তমান থাঁকে; এবং সমাধি ও সুষুপ্তি অবস্থাতেও ইহা বিনষ্ট হয় না। যে জীবের যত প্রকার জ্ঞান থাকে সেই সমস্ত জ্ঞানের সমষ্টিই সেই জীবের বিজ্ঞানময় কোষ। ব্রহ্ম বা আত্মা যখন জীবাত্মা ভাবে লক্ষিত হন তখন তাঁহাকেই আনন্দময় কোষ বলা যায়।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণই মনোময় কোষ, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোষ, এবং প্রসন্ন অন্তঃকরণের সুখময়ী বৃত্তিই আনন্দময় কোষ। তাঁহার মতে জীবাত্মা পরমাত্মা ও আত্মায় কোন প্রভেদ নাই, তাহাদের মধ্যে কোন একটীকেও কোষ বলা সঙ্গত নহে, এবং তাহাদেরই অপর নাম আনন্দ বা ব্রহ্ম।

পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন :—

অন্ন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আনন্দ—এই পঞ্চকোষ দ্বারা আবৃত আত্মা নিজের স্বরূপ ভুলিয়া সংসারে নানাবিধা গতি প্রাপ্ত হন। স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহই অন্নময় কোষ। পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে প্রাণময় কোষ বলে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন নামক অন্তঃকরণের সংশয়াত্মক ভাবকে মনোময় কোষ বলা যায়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি নামক অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক ভাবকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে। পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সমষ্টিকে লিঙ্গশরীর

তাঁহারা সকল পদার্থের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হন। কার্য্যকারণরূপে প্রতিভাত ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া যখন সাধকের "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় তখন সাধকের সমস্ত বাসনাময় অবিদ্যা লোপ হয়। সকল পদার্থের তত্ত্ব বিদিত হওয়ায় আর তাঁহার কোন প্রকার সংশয় থাকে না। এবং যে কর্ম্মফলের কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় সাধক তখন জীবভাবে রহিয়াছেন সেই কর্ম্মফল ভিন্ন তাঁহার অন্য সমস্ত কর্ম্মফল বিনষ্ট হয়। উক্ত প্রবৃত্ত-কর্ম্মফল যতক্ষণ না ভোগদ্বারা ক্ষয় হয় ততক্ষণ তিনি জীবন্মুক্তভাবে থাকেন। অপ্রবৃত্ত-কর্ম্মফল ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হওয়ায় এবং জীবন্মুক্ত অবস্থায় নূতন কর্ম্মফল উৎপন্ন না হওয়ায় প্রবৃত্ত-কর্ম্মফল ভোগদ্বারা ক্ষয় হইবামাত্র তিনি বিদেহমুক্ত হন। ব্রহ্মের সহিত তাঁহার আর কোন প্রকার পার্থক্য থাকে না। কোন্ প্রকার সাধক পরা বিদ্যার অধিকারী হইয়া এই প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত হন এক্ষণে সেই বিষয় বলা হইতেছে।

কেবল মাত্র শাস্ত্রপাঠ অথবা শাস্ত্রার্থ ধারণাশক্তি অথবা গুরূপদেশ দ্বারা "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। ভক্তি এবং উপাসনা দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্ম যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন কেবল সেই সাধকই ব্রহ্মকে আপন আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন এবং কেবল তাঁহার বুদ্ধিতেই আত্ম-তত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে প্রকাশিত হয়। শারীরিক এবং মানসিক বলশূন্য, অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও অশাস্ত্রীয়ভাবে তপস্যাকারী ব্যক্তির বুদ্ধিতে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। যাঁহার শরীর ও মন সুস্থ এবং বলশালী, শাস্ত্রা-লোচনা ও গুরূপদেশ দ্বারা যাঁহার অনাত্ম পদার্থে বৈরাগ্য এবং আত্ম পদার্থে ভক্তি জন্মিয়াছে এবং বেদান্তশাস্ত্রোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভার্থ যিনি কায়মনোবাক্যে তপস্যা করেন, কেবল মাত্র

বলে। ইষ্ট দর্শনাদিজনিত সুখবিশিষ্ট সত্ত্বই আনন্দময় কোষ বা কারণ শরীর। উল্লি-খিত পাঁচটি কোষের মধ্যে যখন যেটির সহিত আত্মার অভেদাত্মক ভ্রম জন্মে তখন আত্মা তৎকোষময় বলিয়া উক্ত হন।

বর্ত্তমান সরল বেদান্তদর্শন গ্রন্থে সর্ব্বোপনিষৎসারোপনিষদুক্ত অর্থই গৃহীত হইয়াছে।

তাঁহারই "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে এবং কেবল মাত্র তিনিই ব্রহ্মনির্ব্বাণ পাইতে পারেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হন, তাঁহার কুলে অব্রহ্মবিদের জন্ম হয় না। তিনি শোক এবং পাপ অতিক্রম করেন এবং সংসার-বাসনা-রূপ হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন"।

অতএব ব্রহ্মজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ এবং ব্রহ্মই জিজ্ঞাসিতব্য। দ্বিতীয় সূত্রে সেই ব্রহ্মের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

—*:*:*—

পঞ্চম প্রবন্ধ।

—∘()∘()∘—

দ্বিতীয় সূত্র।

জন্মাদ্যস্য যতঃ।

জন্মাদি অস্য যতঃ, এই তিনটী কথা লইয়া সূত্রটী হইয়াছে। "জন্ম আদিতে যাহার" এইরূপ সমাস করিয়া জন্মাদি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অস্য" শব্দের অর্থ "ইহার"। এবং "যতঃ" শব্দের অর্থ "যাঁহা হইতে"। সমস্ত সূত্রের অর্থ এই যে "যাঁহা হইতে ইহার জন্মাদি হইয়াছে তিনিই ব্রহ্ম।" এক্ষণে দেখা যাউক "জন্মাদি" এবং "অস্য" (ইহার) শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়োপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে ভৃগুবল্লী নামে একটী আখ্যায়িকা আছে। ভৃগুনামা বরুণতনয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া স্বীয় জনক বরুণের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন"। বরুণদেব পুত্রকে কহিলেন "অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্য ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার অর্থাৎ এই সকলকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলে ব্রহ্মকে জানা যায়। এবং ব্রহ্মের লক্ষণ এই যে, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্ত এই সমস্ত ভূত তাঁহা হইতে জন্মগ্রহণ করে, তাঁহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে তাঁহাতে বিলীন হয়। কেবলমাত্র উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মকে জানিতে হইলে তপস্যা করিতে হয়। যে সকল পদার্থ পরীক্ষা করিলে ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় তাহা তোমাকে বলিলাম। এবং ব্রহ্মের লক্ষণও তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে তুমি এই লক্ষণ সমূহ দ্বারা তাঁহাকে পরোক্ষরূপে বুঝিয়া তাঁহার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছায় তপস্যা কর। তাহা হইলে তাঁহাকে অপরোক্ষরূপে জানিতে পারিবে"।

তদনন্তর ভৃগুমুনি তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া স্থির করিলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত এই সমস্ত ভূতগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন হইতেছে, অন্নদ্বারা জীবিত আছে, এবং বিনাশকালে অন্নে

বিলীন হয়। কিন্তু এই প্রকার সিদ্ধান্তে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায় তিনি পুনরায় পিতার নিকট গিয়া ব্রহ্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বরুণদেব কহিলেন, "এখনও তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। যে পর্য্যন্ত তোমার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হইবে, ততক্ষণ তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হইবে না। একমাত্র তপস্যাই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, অতএব তুমি তপস্যা করিতে থাক"। ভৃগুমুনি পুনরায় তপশ্চরণ পূর্ব্বক প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন, যেহেতু প্রাণ হইতে ভূত সকল জন্মগ্রহণ করে, প্রাণ দ্বারা জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালে প্রাণে লয় হয়। কিন্তু তখনও তাঁহার সমস্ত সন্দেহ অপনোদন না হওয়ায় তিনি পুনরায় পিতার নিকট গেলেন এবং উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বরুণদেব তাঁহাকে পুনরায় তপ করিতে বলিলেন। তিনি পুনরায় তপ করিয়া মনকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন, যেহেতু মন হইতে ভূত সকলের জন্ম হয়, মন দ্বারা ভূত সকল জীবিত থাকে, এবং অন্তে ভূত সকল মনেই বিলীন হয়। কিন্তু তখনও নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া তিনি পুনরায় পিতার নিকট গিয়া ব্রহ্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বরুণদেব তখনও তাঁহাকে তপ করিতে বলিলেন। তিনি আবার তপশ্চরণ করিয়া বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন। যেহেতু বিজ্ঞান হইতেই ভূত সকলের জন্ম, বিজ্ঞানে ভূতগণের স্থিতি, এবং বিজ্ঞানে ভূতগণের লয় হয়। কিন্তু তখনও স্বসিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস না হওয়ায় পুনরায় পিতার নিকট গেলেন। পিতা আবার বলিলেন, "তুমি এখনও ব্রহ্ম জানিতে পার নাই। এখনও তপ করিতে থাক"। ভৃগুমুনি পুনরায় তপ করিয়া "আনন্দই ব্রহ্ম" ইহা জানিতে পারিলেন। সেই আনন্দ হইতেই ভূত সকলের সৃষ্টি হয়, আনন্দ দ্বারা তাহারা জীবিত থাকে এবং শেষে আনন্দেই তাহারা বিলীন হয়। এইবার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ভৃগুমুনির সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইল। ভৃগু কর্ত্তৃক বিদিতা বরুণপ্রোক্তা এই বিদ্যা অদ্বৈত পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিতা এবং পরিসমাপ্তা।*

---

* যে প্রকার বিচার দ্বারা ভৃগুমুনি স্বসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা দশম প্রবন্ধে বিবৃত হইবে।

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। বেদান্তশাস্ত্র মতে ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। জীবের পক্ষে অন্নময় কোষ যেরূপ, ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে স্থূলজগৎ সেইরূপ। জীবের পক্ষে প্রাণময় কোষ যে কার্য্য করে, ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে সমস্ত শক্তির সমষ্টি সেই কার্য্য করে। এই প্রাণময় কোষ ও শক্তির সমষ্টিকে সংক্ষেপে প্রাণ বলা যায়। চিত্ত অহ-ঙ্কার বুদ্ধি ও কল্পনা লইয়া যেরূপ জীবের মনোময় কোষ বা মন হয় সমস্ত জগতের মনোময় কোষের সমষ্টি সেইরূপ হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকাশিত হন। বিবিধ পদার্থের জ্ঞান যেরূপ জীবের বিজ্ঞানময় কোষ বা বিজ্ঞান-রূপে বর্ত্তমান থাকে সমস্ত জীবের বিজ্ঞানের সমষ্টি সেইরূপ হিরণ্যগর্ভের বিজ্ঞান বা হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিতে প্রকাশিত বেদরূপে বর্ত্তমান থাকে। জীবন ভিন্ন যেমন জীব থাকিতে পারে না মুখ্য প্রাণ ভিন্ন সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড থাকিতে পারে না। মৃত্যুর পর জীবের বিজ্ঞান মন প্রাণ ও শরীর যেমন লিঙ্গশরীররূপে অবস্থান করে প্রলয়কালে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সেইরূপ অব্যক্তা প্রকৃতি বা প্রধানরূপে অবস্থান করে। জীবের লিঙ্গশরীর, বিজ্ঞান, মন,প্রাণ স্থূল ও শরীর যেরূপ জীবাত্মায় প্রতিষ্ঠিত,অব্যক্তা ও ব্যক্তা প্রকৃতি সেইরূপ ঈশ্বর বা জগদ্ধাত্রীতে প্রতিষ্ঠিত। অবিদ্যাধীন জীবাত্মা যেরূপ নির্গুণ আত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হন, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা সেইরূপ নির্গুণ আত্মা হইতে প্রকটিত হন।

উল্লিখিত ভৃগু বরুণ সংবাদ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে অন্ন প্রাণ মন বিজ্ঞান এবং আনন্দ এই কয়েকটী শব্দের প্রকৃত অর্থ জানা প্রয়োজন। উক্ত শব্দগুলির অর্থ প্রশ্নোপনিষদে বলা আছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য সেই অর্থগুলি এখানে লিখিত হইল। প্রশ্নোপনিষদে অন্ন শব্দের পরিবর্ত্তে রয়ি শব্দের প্রয়োগ আছে এবং ক্ষিতি অপ্‌ তেজ এই তিন মূর্ত্ত ভূত এবং বায়ু ও আকাশ এই দুই অমূর্ত্ত ভূতকে রয়ি বলা হইয়াছে। সুতরাং অন্ন শব্দের অর্থ পঞ্চ ভূতাত্মক জগৎ। প্রাণ সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন যে আত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়। পুরুষ এবং পুরুষের ছায়ায় যে সম্বন্ধ আত্মা এবং প্রাণের কতকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। পুরুষ সত্য,

ছায়া মিথ্যা ; সেইরূপ আত্মা সত্য ও চিন্ময়, এবং প্রাণ মায়াময় ও অচিৎ। পুরুষের সত্ত্বা ব্যতিরেকে ছায়ার সত্ত্বা থাকিতে পারে না, সেইরূপ আত্মার সত্ত্বা ব্যতিরেকে প্রাণের সত্ত্বা থাকিতে পারে না। এই প্রাণে বিজ্ঞান মন ও সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের বীজ সকল নিহিত থাকে। এই প্রাণ সমস্ত অচেতন শক্তির বীজ বা মূল অচেতনশক্তি। ইহা মুখ্য প্রাণরূপে ঈশ্বরে এবং জীবনরূপে জীবাত্মায় প্রতিষ্ঠিত আছে। জীবের সঙ্কল্পেচ্ছাদি নিষ্পন্ন কর্ম্মফল দ্বারা মুখ্য প্রাণই জীবনরূপে প্রাণিগণের শরীরে আগমন করে। সম্রাট্ যেমন আপনার ক্ষমতা বিভাগ করত স্বীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে আপন প্রতিনিধিভাবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করেন মুখ্য প্রাণও সেইরূপে অপান, প্রাণ, সমান, ব্যান ও উদান এই পঞ্চভাগে আপনাকে বিভক্ত করত তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিয়োগ করেন। পায়ু (মলদ্বার) উপস্থ (মূত্রদ্বার) নাসিকা, মুখ প্রভৃতি দ্বার দিয়া মল মূত্র প্রশ্বাস নিষ্ঠীবন প্রভৃতির নিঃসরণ অপান বায়ুর কার্য্য। অপান বায়ু প্রধানতঃ পায়ু এবং উপস্থে অবস্থান করে। চক্ষু, শ্রোত্র, মুখ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ প্রভৃতি দ্বার দিয়া আলোক, শব্দ, আহার, রস, নিশ্বাস, স্পর্শ প্রভৃতির প্রবেশ প্রাণবায়ুর কার্য্য। প্রাণবায়ু প্রধানতঃ চক্ষু শ্রোত্র মুখ ও নাসিকাতে অবস্থান করে। প্রাণবায়ু ও অপান বায়ুর মধ্যদেশে সমান বায়ুর স্থান। সমান বায়ু প্রধানতঃ নাভিদেশে অবস্থান করে। প্রাণবায়ু কর্তৃক যে সমস্ত পদার্থ শরীরমধ্যে আনীত হয় তাহাদিগকে পরিবর্ত্তন ও বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তাহাদের সারাংশ গ্রহণ করত সমান বায়ু ঐ সারাংশ যথাস্থানে প্রয়োগ করে এবং অসার অংশ বিসর্জ্জনের জন্য অপান বায়ুকে অর্পণ করে। ঐ সারাংশ সকল প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি আপন আপন কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়। যে মুখ্যপ্রাণ জগতের প্রতিষ্ঠা তাহাই জীবশরীরে হৃদয়দেশে জীবনরূপে অবস্থান করে। এই হৃদয়ে একাধিক শত নাড়ী আছে। ইহাদের প্রত্যেক নাড়ীর সহিত এক একশত শাখানাড়ীর যোগ আছে এবং প্রত্যেক শাখানাড়ী দ্বিসপ্ততিসহস্র (৭২,০০০) প্রতিশাখা নাড়ীর সহিত সংযুক্ত আছে। এই সমস্ত

নাড়ী শাখানাড়ী ও প্রতিশাখানাড়ীর মধ্যে ব্যানবায়ু বিচরণ করত জীবকে আকুঞ্চন, প্রসারণ, লম্ফন, ঝম্ফন, গ্রহণ, নিক্ষেপণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে সক্ষম করে। পূর্ব্বোক্ত একাধিক শত নাড়ীর মধ্যে কোন একটী দিয়া উদান বায়ু মৃত্যুকালে জীবকে এক স্থূল শরীর হইতে অন্য স্থূল শরীরে লইয়া যায়। অন্যান্য প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ন্যায় উদানবায়ুর এই ক্রিয়াও প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত। জীবের আপন কর্ম্মফল দ্বারাই জীবের গন্তব্য স্থল স্থির হয়। যদি জীব পুণ্যকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মৃত্যুর পর উদানবায়ু তাঁহাকে দেবলোকাদি উত্তম স্থানে লইয়া যায়। আর যদি জীব পাপকর্ম্ম করিয়া থাকে তাহা হইলে মৃত্যুর পর উদানবায়ু তাহাকে তির্য্যক্‌যোনি প্রভৃতি নরকলোকে লইয়া যায়। এবং যদি জীব পাপ পুণ্য উভয় কর্ম্মই করিয়া থাকে তাহা হইলে মৃত্যুর পর উদান বায়ু কর্ত্তৃক সে মনুষ্যলোকই পুনঃ প্রাপ্ত হয়।* জীবশরীরস্থ প্রাণবায়ু, অপানবায়ু, সমান বায়ু, ব্যানবায়ু ও উদান বায়ুর সমষ্টিকে প্রাণময় কোষ বা সংক্ষেপে প্রাণ বলা যায়। মুখ্য প্রাণের যেরূপ অংশ জীবের শরীরের মধ্যে প্রাণবায়ুরূপে অবস্থিত সেইরূপ অংশই বাহ্য জগতে জগৎ প্রকাশক আদিত্যরূপে (Sun) বর্ত্তমান। আদিত্যই প্রাণবায়ুকে আপন কার্য্য করিতে সমর্থ করে, এবং প্রাণবায়ু না থাকিলে জীব বাহ্য জগৎ অনুভব করিতে পারিত না। এইরূপে মুখ্য প্রাণের যেরূপ অংশ জীবশরীরের অভ্যন্তরে অপানবায়ুরূপে অবস্থিত সেইরূপ অংশই মাধ্যাকর্ষণ বিশিষ্ট স্থূল জগৎ ও পৃথিবীরূপে (matter) বাহ্য জগতে বর্ত্তমান। ইহারা পরস্পরকে আপন আপন কার্য্য করিতে সক্ষম করে। যদি পৃথিবী ও বাহ্য জগতের অন্যান্য স্থূল পদার্থ জীবের শরীরস্থ পার্থিব পদার্থকে আকর্ষণ না করিত তাহা হইলে জীবের শরীরস্থ অপানবায়ু আপন কার্য্য করিতে পারিত না; এবং জীবের শরীরে যদি অপানবায়ু না থাকিত তাহা হইলে

* যোগিপুরুষেরা যোগবলে উদানবায়ুকে জয় করিয়া জীবদ্দশাতেই ঐ বায়ুর প্রভাবে আপন ইচ্ছামত সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারে।

জীবশরীরের উপর বাহ্য জগতের কোন প্রকার আকর্ষণ শক্তি কার্য্য করিত না। মুখ্য প্রাণের যেরূপ অংশ জীব শরীরের মধ্যে সমান বায়ুরূপে অবস্থিত, মুখ্য প্রাণের সেইরূপ অংশই বাহ্য জগতে আকাশরূপে (Space and ether) প্রতিষ্ঠিত। ইহারা পরস্পরকে আপন আপন কার্য্য করিতে সক্ষম করে। সমান বায়ুর ন্যায় আকাশ কোন দ্রব্য আনয়নও করে না এবং কোন দ্রব্য পরিত্যাগও করে না। শরীরের অভ্যন্তরে সমান বায়ু যে প্রকার প্রাণ ও অপানবায়ুর কার্য্য সম্পাদন করে বাহ্য জগতেও আকাশ সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও স্থূল পদার্থকে আপন আপন কার্য্য করিতে সক্ষম করে। শরীরের অভ্যন্তরে মুখ্য প্রাণের যেরূপ অংশ ব্যানবায়ুরূপে অবস্থিত মুখ্য প্রাণের সেইরূপ অংশই বাহ্য জগতে বায়ু বা ব্যক্তশক্তিরূপে (Force) বর্ত্তমান। বায়ুই স্থিতিস্থাপকতা, বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে। জীব শরীরে মুখ্য প্রাণের যেরূপ অংশ উদান বায়ুরূপে অবস্থিত মুখ্য প্রাণের সেইরূপ অংশই বাহ্য জগতে তেজ বা অব্যক্ত শক্তিরূপে (energy) বর্ত্তমান। এক শরীরের মৃত্যু হইলেও উদান বায়ু যেমন জীবকে বিনষ্ট হইতে না দিয়া অপর শরীরে লইয়া যায় সেইরূপ তেজও কোন পদার্থকে বিনষ্ট হইতে না দিয়া কোন পদার্থের একভাব বিনষ্ট হইলে ইহাকে অপর ভাবে রাখিয়া দেয়। যখন জীব ক্ষীণায়ু হইয়া মুমূর্ষু দশা প্রাপ্ত হয় তখন তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-শক্তি ও মন ও বুদ্ধি উপশান্ত হয় এবং তাহার আপন কর্ম্মফলবশতঃ যে লোকে যাওয়া উচিত সেই লোকের জ্ঞান তখন তাহার চিত্তে কল্পনাভাবে প্রকাশিত হয়। অনন্তর জীবের উক্ত কল্পনাজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়সকল ও মনোময় কোষ ও বিজ্ঞান সমস্তই লিঙ্গশরীররূপে পরিণত হয়। তখন উদান বায়ু উক্ত লিঙ্গ শরীরকে যথাসঙ্কল্পিত লোকে লইয়া যায়। মন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন হে গার্গ! সূর্য্যের কিরণজাল যেমন সূর্য্যাস্ত কালে সূর্য্যের সহিত বিলীন হয় এবং সূর্য্যোদয় কালে যেমন পুনরায় সূর্য্যের সহিত প্রকাশিত হয় সেইরূপ সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি অহঙ্কার ও কল্পনারূপ চিত্তবৃত্তি সকল মন বা চিত্তে বিলীন হয় এবং মন তখন বৃত্তিশূন্য

ভাবে অবস্থান করে। কিন্তু সুষুপ্তাবস্থাতেও জীবের বিবিধ জ্ঞান সকল একেবারে লোপ পায় না। তাহারা সর্ব্বদাই অব্যক্ত বীজভাবে মনে বর্ত্তমান থাকে এবং জাগরণ ও স্বপ্নকালে ঐ সমস্ত জ্ঞান হইতেই জীবের বুদ্ধি অহঙ্কার ও কল্পনা প্রাদুর্ভূত হয়। জীবের বিবিধ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা যায়। সর্ব্বেন্দ্রিয়াধ্যক্ষ মন সুষুপ্তিকালে বৃত্তিশূন্য ভাবে থাকে বলিয়া সুষুপ্তাবস্থায় জীব কোন শব্দ শুনে না, কোন বস্তু দেখে না, কোন গন্ধ আঘ্রাণ করে না, কোন বাক্য বলে না, কোন দ্রব্য হস্তাদি দ্বারা গ্রহণ করে না, কোন প্রকার বৈষয়িক আনন্দ ভোগ করে না, আপন ইচ্ছামত কোন পদার্থ পরিত্যাগ করে না এবং পদাদি দ্বারা বিচরণ করে না। এই জন্য লোকে বলিয়া থাকে যে জীব সুষুপ্তিকালে আপন আত্মাতে বিলীন থাকে। নিদ্রাকালে যখন সুষুপ্তি না থাকে তখন জীব স্বপ্নে নানা প্রকার মনঃকল্পিত পদার্থ দর্শন করে। এই মনঃকল্পিত পদার্থ সকল জীবের বিবিধ জ্ঞান বা বিজ্ঞান হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়। জীবের জ্ঞানপথে কখন আসে নাই এমন কোন পদার্থ স্বপ্নে কল্পিত হয় না। অপূর্ব্বদৃষ্ট কোন কোন পদার্থ কখন কখন স্বপ্নে কল্পিত হয় বটে, কিন্তু যে সকল পদার্থের মিশ্রণে উক্ত পদার্থ কল্পিত হয় তাহাদের প্রত্যেকটীই পূর্ব্বে কখন না কখন জীবের জ্ঞানপথে কোন না কোন প্রকারে অবশ্য আগত হইয়া থাকিবেই থাকিবে। জাগ্রৎকালে চক্ষু যে সকল পদার্থ দর্শন করে স্বপ্নকালে মন সেই সকল পদার্থ বা তাহাদের মধ্যে এক বা অধিক পদার্থ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্য পদার্থ দর্শন করে। জাগ্রৎকালে কর্ণ যে শব্দ শ্রবণ করে স্বপ্নকালে মন সেই সকল শব্দ বা তাহাদের মধ্যে এক বা অধিক শব্দ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্য শব্দ শ্রবণ করে। কোনও কালে বা কোনও স্থলে মন যে কোন পদার্থ অনুভব করে সেই পদার্থ বা সেই সময়ে বা অন্য সময়ে অনুভূত অন্য পদার্থ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন বা তাহাদের মধ্যে একাধিক পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্য পদার্থ সকল মন স্বপ্নকালে আপনার মধ্যে কল্পনা করত আপনিই জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞাতা ভাবে প্রকাশিত হয়। আনন্দ সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন :—

সুষুপ্তি বা সমাধি দ্বারা যখন মন সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয় সেই সময় মন কোন প্রকার স্বপ্ন দেখে না। তখন জীবের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান বীজভাবে বিলীন হওয়ায় কেবল একমাত্র স্বপ্রকাশ আনন্দ আত্মা জীবকর্তৃক অনুভূত হন এবং জীব প্রতিবন্ধশূন্য পূর্ণানন্দ ভোগ করেন।

পক্ষিসকল বাসার্থ যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করে সেইরূপ পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম) ও তাহাদের আপন আপন বিশেষ গুণ সকল (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (ঘ্রাণ, আস্বাদন, দর্শন, স্পর্শন এবং শ্রবণ শক্তি সকল) ও তাহাদের বিষয় (ঘ্রাতব্য, রসয়িতব্য, দ্রষ্টব্য, স্পর্শয়িতব্য, এবং শ্রোতব্য পদার্থ সকল) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ) ও তাহাদের বিষয় (বক্তব্য, আদাতব্য, গন্তব্য, বিসর্জ্জয়িতব্য এবং আনন্দয়িতব্য পদার্থ সকল) চিত্ত (অন্তঃকরণ বা মননেন্দ্রিয়) ও চিত্তের তিন প্রকার বৃত্তি (মন বা কল্পনা, বুদ্ধি বা জ্ঞানগম্য পদার্থ সকলের নিশ্চয়াত্মক বোধ এবং অহঙ্কার বা আমি একজন পৃথক সত্ত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নিশ্চয়াত্মক বোধ) ও চিত্ত এবং চিত্তবৃত্তিসমূহের বিষয় (চেতয়িতব্য, মন্তব্য, বোদ্ধব্য এবং অহঙ্কর্ত্তব্য পদার্থ সকল) বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিতব্য পদার্থ সকল ও প্রাণ এবং শক্তিদ্বারা ধারয়িতব্য পদার্থ সকল—এই সমস্তই ঈশ্বর বা পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ঈশ্বর বা পরমাত্মাই দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা জীবভাবে প্রকাশিত হন। এই পরমাত্মা সেই অক্ষর আনন্দ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত। হে সৌম্য, যে সাধক সেই তমোরহিত, নাম রূপ শরীর মন বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত, অক্ষর, সচ্চিদানন্দ আত্মাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন তিনি সেই অক্ষর সচ্চিদানন্দ আত্মাকে আপন আত্মা বলিয়া দেখিতে পান। তখন সাধক ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ব হন।

উপরে তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ হইতে ভৃগুবল্লীর যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, (১) শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণ, মন এবং বাক্য ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার স্বরূপ; (২) "যাঁহা হইতে এই ভূতগণ জন্মগ্রহণ করে,

যাঁহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম” এই শ্রুতিবাক্যটী ব্রহ্মের লক্ষণ-বাচক ; এবং (৩) ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ভৃগুমুনি তপ করিয়া “আনন্দই ব্রহ্ম” ইহা জানিতে পারিলেন ; সেই আনন্দ হইতেই ভূত সকলের সৃষ্টি হয়, আনন্দ দ্বারা তাহারা জীবিত থাকে এবং অন্তকালে আনন্দেই তাহারা লয়প্রাপ্ত হয়—এই শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণয় বাক্য। উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রথম সূত্রোক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা) ও দ্বিতীয় সূত্রোক্ত জন্মাদি (জন্ম প্রভৃতি) ও যতঃ (যাঁহা হইতে) এই কথাগুলি ব্রহ্মের লক্ষণবাচক শ্রুতিবাক্যটীর অন্তর্ভূত। বাস্তবিক উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি অবলম্বন করিয়াই এই দুইটী সূত্র উপনিবদ্ধ হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দ্দশ খণ্ডেও ব্রহ্মের লক্ষণ-বাচক এইপ্রকার শ্রুতি আছে। “এই সমস্তই ব্রহ্ম ; যেহেতু এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে, ব্রহ্মে লয় পাইবে, এবং ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত আছে।” ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় বাক্যও অন্যান্য শ্রুতিতেও আছে। ঐতরেয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—“চিৎ বা প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।” কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—“সেই ব্রহ্মকে কেহ বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে পারে না, চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, অন্য কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না এবং মনেও কেহ তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না। তিনি আছেন অর্থাৎ তিনি সৎ এই জ্ঞান ব্যতিরেকে তাঁহাকে উপলব্ধ করিবার আর কি উপায় হইতে পারে?” এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে ইহাই স্থির হয় যে, সচ্চিদানন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ ; এবং সমস্ত জগৎ তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়, তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় ইহা তাঁহার লক্ষণ। স্মৃতিতেও এই প্রকার বাক্য দেখা যায়। ৺ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—“আমা হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয় এবং আমাতেই ইহা লয় পাইয়া থাকে। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে পৃথক্ কোন বস্তু নাই। যেমন সূত্রে মণি সকল গাঁথা থাকে সেই প্রকার এই সমস্ত জগৎ আমাতে প্রতিষ্ঠিত।” বিষ্ণুপুরাণে আছে—“যিনি এই

জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের মূল কারণ, যিনি এই জগদ্রূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে প্রণাম করি।”

এই সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য পর্য্যালোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় সূত্রোক্ত “জন্মাদি” শব্দের অর্থ জন্ম স্থিতি এবং নাশ, এবং “অস্য” শব্দের অর্থ এই সমস্ত জগতের, এবং সমুদায় সূত্রের অর্থ এই যে যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহাতে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাঁহাতে এই জগৎ লয় পাইয়া থাকে সেই সৎ চিৎ আনন্দই ব্রহ্ম।

—০()০()০—
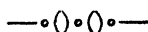
ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

তৃতীয় সূত্র।

এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রের অর্থ করিবার জন্য এত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য আলোচনা করিবার প্রয়োজন কি? বস্তু মাত্রেরই একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। বস্তুর ধর্ম্মই এই যে তাহা জন্মায়, কিছুকাল থাকে ও পরে বিনাশ পায়। এই বাহ্য ও অন্তর্জগৎ যেরূপ সুনিয়মে চালিত হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ এবং অবিনাশী। তাঁহার কোন প্রকার দুঃখ থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং তিনি অবশ্য আনন্দময়। অতএব ভগবান্ সূত্রকার এই সমস্ত বস্তু-ধর্ম্ম ও বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ পরিচালনার নিয়মাবলী দেখিয়াই অনুমানমূলে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ "যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও নাশ হয় তিনিই ব্রহ্ম" এই সূত্র করিয়াছেন। সুতরাং অনুমানই উক্ত সূত্রের মূল, শাস্ত্র নহে। এই রূপ পূর্ব্ব পক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ সূত্রকার তৃতীয় সূত্রে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। সেই সূত্র এই—

তৃতীয় সূত্র। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ॥

শাস্ত্র (অর্থাৎ বেদ বেদান্ত) যোনি (অর্থাৎ কারণ অর্থাৎ প্রমাণ) যাঁহার তিনি শাস্ত্রযোনি। শাস্ত্রযোনির ভাব, শাস্ত্রযোনিত্ব। হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তিতে শাস্ত্রযোনিত্বাৎ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। সূত্রের অর্থ এই যে, শাস্ত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র দ্বারা ব্রহ্মকে এই নিখিল জগতের মূল কারণ সৎ চিৎ আনন্দ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

বেদান্ত দর্শন অনুমানমূলক নহে। এবং সূত্রকার বেদান্তসূত্র দ্বারা কোন নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন নাই। এবং এই ধর্ম্ম পূর্ব্বে ছিল কিন্তু

অজ্ঞাত ছিল এমন কথাও তিনি বলেন নাই। তাঁহার মত এই যে এই ধর্ম্ম সনাতন। বেদ বেদান্তে চিরকালই এই ধর্ম্ম প্রকটিত আছে। তবে সমগ্র শাস্ত্র আয়ত্ত করা অতি দুরূহ ব্যাপার, সেই জন্য লোকে যাহাতে সহজে সমগ্র শাস্ত্র স্মৃতিপথে রাখিতে পারে তজ্জন্য সূত্রগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। বাস্তবিক শাস্ত্রের বাক্য সকল উদাহৃত হইয়াই বেদান্তসূত্র সমূহে বিচারিত হইয়াছে। এই সকল সূত্রের সাহায্যে বেদান্ত বাক্য সকল পুনঃ পুনঃ বিচার করত শাস্ত্রোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করিলে ব্রহ্মাবগতি হয়। কেবলমাত্র তর্ক বা অনুমান দ্বারা ব্রহ্মাবগতি হয় না।

ইন্দ্রিয় পথে সর্ব্বদা বর্ত্তমান পদার্থ সমূহের জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত জীবের যত প্রকার জ্ঞান হইতে পারে সে সমস্তই প্রমাণ সাপেক্ষ। ন্যায় দর্শন মতে প্রমাণ চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, শব্দ, অনুমান এবং উপমান। কিন্তু অনেকে উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না এবং সাংখ্য ও যোগ দর্শনেও উপমান স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাই। উপমান সাদৃশ্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। গবয় নামক আরণ্য জন্তু দেখিতে গোরুর মত এই কথা অরণ্যচারিগণের মুখে শুনিয়া অরণ্যে গমন পূর্ব্বক গো সদৃশ জন্তু দর্শন করিলে "উক্ত জন্তুই গবয়" এইরূপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানকে উপমান প্রমাণ জনিত বলা যায়। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই জ্ঞান যথার্থও হইতে পারে, ভ্রান্তও হইতে পারে এবং উপমান প্রমাণ অনুমান প্রমাণেরই অন্তর্গত। সুতরাং উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করাই সঙ্গত। অপর তিনটী প্রমাণ সহজে বুঝাইবার জন্য একটী আধুনিক দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। আমেরিকা খণ্ডের আবিষ্কারক কলম্বস নামক নাবিক নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার দৃষ্ট সমস্ত জলরাশিরই উভয় প্রান্তে ভূভাগ বর্ত্তমান থাকে। আটলাণ্টিক মহাসাগরও একটী জলরাশি ও উহার এক দিকে স্থল বর্ত্তমান। সুতরাং কলম্বস অনুমান করিলেন যে আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারেও অবশ্যই ভূখণ্ড থাকিবে। আমে-

রিকা খণ্ডের আবিষ্কারের পূর্ব্বে অনুমান মূলে আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কলম্বসের যে পরোক্ষ জ্ঞান হইয়াছিল সেই জ্ঞানের প্রমাণ অনুমান। অনুমান প্রমাণের পাঁচটী অবয়ব থাকে যথা—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন। (১) আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার্শ্বে ভূখণ্ড আছে এইটী প্রতিজ্ঞা, (২) যেহেতু আটলাণ্টিক মহাসাগর একটী জলরাশি, যাহার এক প্রান্তে ভূখণ্ড বর্ত্তমান আছে এইটী হেতু, (৩) যে জলরাশির এক প্রান্তে ভূখণ্ড বর্ত্তমান আছে তাহার অপর পার্শ্বে অবশ্যই ভূমি আছে, যথা ভূমধ্যস্থ সাগর, এইটী উদাহরণ, (৪) আটলাণ্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যস্থ সাগরের ন্যায় একটী জলরাশি, যাহার এক পার্শ্বে ভূখণ্ড বর্ত্তমান আছে এইটী উপনয়, (৫) অতএব আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার্শ্বে ভূমি আছে এইটী নিগমন। এই অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভর পূর্ব্বক কলম্বস অর্ণবযানে আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার্শ্বে ভূভাগ অন্বেষণে যাত্রা করিয়া আমেরিকা খণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমেরিকা দর্শনের পর আমেরিকার অস্তিত্বের বিষয়ে কলম্বসের যে জ্ঞান হইয়াছিল সেই জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান এবং তাহার প্রমাণের নাম প্রত্যক্ষ। কলম্বস এবং অপর যাঁহারা আমেরিকা খণ্ড দর্শন করিয়াছেন আমেরিকার অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁহাদের সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়াছে। যাঁহারা আমেরিকা সন্দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন সেই বাক্য বা গ্রন্থ হইতে আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে পরোক্ষ জ্ঞান হয় তাহাকে শব্দপ্রমাণজনিত জ্ঞান বলা যায়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শাব্দ জ্ঞান প্রত্যক্ষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এবং অনুমানজনিত জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট *। বেদান্ত দর্শন মতেও প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

---

* যে জলরাশির এক পার্শ্বে ভূখণ্ড বর্ত্তমান আছে তাহার অপর পার্শ্বে অবশ্যই ভূমি খণ্ড আছে এইরূপ জ্ঞানকে ব্যাপ্তি জ্ঞান বলে। ভূয়োদর্শন বা ভূয়োদর্শকের উপদেশ হইতে এইরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই ব্যাপ্তি জ্ঞান সমস্ত অনুমানজনিত জ্ঞানের প্রধান অবলম্বন। আটলাণ্টিক মহাসাগর একটী জলরাশি যাহার এক পার্শ্বে ভূখণ্ড

যতক্ষণ না অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ততক্ষণ বেদান্ত দর্শন মতে পরাবিদ্যা হয় না। এই অপরোক্ষ জ্ঞান কি উপায়ে লাভ করা যায় এবং এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইলে কি ফল হয় সমগ্র বেদান্ত দর্শনে তাহারই উপদেশ আছে। যাঁহারা এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের বাক্য-গুলিই এই উপদেশ সমূহের প্রধান প্রমাণ। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণের মুখনিঃসৃত বাক্য সকলই শাস্ত্র। সুতরাং বেদান্তদর্শনমতে অনুমান অপেক্ষা শাস্ত্রপ্রমাণই সমধিক আদৃত এবং গ্রাহ্য। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় এবং অবিদ্যাগ্রস্ত মন দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বলিয়া ব্রহ্মকে অপরোক্ষ জ্ঞানের অতীত বলা যায় না। কেন না ঋষিগণ তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে দেখিয়াছেন এবং তাঁহারাই তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলিয়াছেন ব্রহ্মবাক্যও মনের অগোচর বটেন কিন্তু শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করিলে তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। তিনি পূর্ণানন্দ। তাঁহাকে অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারিলে জীব সর্ব্ব প্রকার ভয় হইতে মুক্ত হয়।

বর্ত্তমান আছে এইরূপ জ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ বলে। ব্যাপ্তি জ্ঞান এবং লিঙ্গপরামর্শ অভ্রান্ত হইলে তবে অনুমান অভ্রান্ত হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান অথবা লিঙ্গ পরামর্শ এই উভয়ের মধ্যে কোন একটীতে ভ্রম থাকিলে অনুমানেও ভ্রম থাকিয়া যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অন্য কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। শাব্দ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং অনুমান জ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং শাব্দ এই উভয় জ্ঞান হইতে উৎপন্ন। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা শাব্দ জ্ঞানে ভ্রমের সম্ভাবনা অধিক; এবং অনুমান জনিত জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভ্রম থাকার সম্ভাবনা।

সপ্তম প্রবন্ধ।

—:*:*:*:—

বেদান্তশাস্ত্রে তর্কের আবশ্যকতা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে বেদান্ত সূত্রগণের সাহায্যে শ্রুতিবাক্য সকল পুনঃ পুনঃ বিচার করিলে, ও শ্রুতি বাক্যোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করিলে, ব্রহ্মাবগতি হয়। কেবল মাত্র তর্ক বা অনুমান দ্বারা হয় না। বেদান্তদর্শনে তর্ক বা অনুমানের আবশ্যকতা নাই এরূপ প্রতিপন্ন করা উল্লিখিত উক্তির উদ্দেশ্য নহে। বিচার করিতে গেলেই তর্কের প্রয়োজন। তবে তর্ক দুই প্রকার। ১ম শুষ্ক তর্ক, তাহার উদ্দেশ্য যে, সকল প্রকার সিদ্ধান্তেই কোন না কোন দোষ দেখাইয়া তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিব; নিজে কোন সিদ্ধান্তে যাইব না। এবং ২য় ফলশিরস্ক তর্ক। অর্থাৎ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখিয়া শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণের ইচ্ছায় বিচার করিব এবং ঐ প্রকার বিচার দ্বারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে অবিচাল্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইব। এই ২য় প্রকার অর্থাৎ ফলশিরস্ক তর্কের সাহায্য গ্রহণ শ্রুতিতেই বিহিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি স্বীয় ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন "হে মৈত্রেয়ী! স্ত্রী পুত্র পরিবার বান্ধব প্রভৃতির স্বার্থের জন্য তাহারা সকলে প্রিয় নহে, আত্মার প্রয়োজনের জন্যই স্ত্রী পুত্র পরিবার বান্ধব প্রভৃতি সকলে প্রিয় হইয়া থাকে। অতএব আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। সুতরাং আত্মজ্ঞানই মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। তজ্জন্য ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধিকে সমস্ত অনাত্ম পদার্থ হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োগ করিবে, ভগবদ্‌ভক্তগণের এবং গুরুর নিকটে ভক্তিভাবে আত্মতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র শ্রবণ করিবে; শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আপন হৃদয়ে প্রোথিত করিবে এবং আত্মার ধ্যান করিবে। অনাত্ম পদার্থ হইতে উপরতি এবং আত্মায় প্রেম, আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, অনুকূল

যুক্তিসহ আত্মতত্ত্ববিচার এবং আত্মধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ আত্মতত্ত্ব অপরোক্ষভাবে বিদিত হয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইলে এই সমস্ত জগৎ বিদিত হয়। সুতরাং ভক্তিপূর্ব্বক অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বিচার আত্মজ্ঞান সাধনের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে চতুর্দ্দশ খণ্ডে ভগবান উদ্দালক আরুণিঋষি আপন পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন "হে সৌম্য! তস্করেরা কোন ব্যক্তির চক্ষু ও হস্ত বদ্ধ করিয়া তাহাকে গান্ধারদেশ হইতে আনিয়া বিজন অরণ্যে বদ্ধাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে সেই ব্যক্তি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া চোরেরা আমাকে বদ্ধ করিয়া আনিয়া বদ্ধাবস্থায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এই বলিয়া যেমন ইতস্ততঃ চীৎকার করিয়া বেড়ায় এবং আপন গন্তব্য পথ ঠিক করিতে পারে না, পরে ঈশ্বরেচ্ছায় কোন দয়াশীল ব্যক্তির সম্মুখে পড়িলে সেই দয়াশীল ব্যক্তি যেমন তাহার বন্ধন মোচন করত তাহাকে বলেন এই দিকে গান্ধারদেশ, তুমি এই দিকে যাও; এবং সেই বন্ধনমুক্ত ব্যক্তি যেমন কোন্ গ্রামের পর কোন্ গ্রাম এই প্রকার প্রশ্ন পূর্ব্বক উপদেশ পাইয়া উপদেশ অনুসারে আপন বুদ্ধিবলে স্বীয় গন্তব্য পথ অবধারণ করত গান্ধারদেশ পুনঃ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব পাপপুণ্য কর্ম্ম-ফল দ্বারা মায়াচ্ছন্ন হইয়া সৎচিৎআনন্দময় আপন আত্মাকে ভুলিয়া অবিদ্যা বশতঃ জড়দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কারকে আপন আত্মা মনে করিয়া সংসারারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভার্য্যা পুত্র পশু বন্ধু প্রভৃতি দৃষ্টাদৃষ্ট অনেক বিষয়ে তৃষ্ণারূপ পাশদ্বারা বদ্ধ হয় এবং আমি অমুকের পুত্র বা কন্যা, আমি অমুকের স্বামী বা স্ত্রী, আমি অমুকের পিতা বা মাতা, ইহাঁরা আমার বান্ধব, আমি দুঃখী, আমি সুখী, আমি মূঢ়, আমি পণ্ডিত, আমি ধার্ম্মিক, আমি বুদ্ধিমান্, আমি জাত, আমি মৃত, আমি জীর্ণ, আমি পাপী, আমার পুত্র মরিয়াছে, আমার ধন নষ্ট হইয়াছে, আমি হত হই-লাম, আমি কিরূপে জীবিত থাকিব, আমার কি উপায় হইবে, কে আমাকে ত্রাণ করিবে, এইরূপ শত সহস্র অনর্থ ভাবনায় কষ্টবোধ করে। পরে পুণ্যফলে ঈশ্বরানুগ্রহে পরম কারুণিক ব্রহ্মাত্মবিৎ কোন সদ্‌গুরু

পাইয়া তাঁহার উপদেশে সংসারারণ্যের দোষ সকল দেখিতে পাইয়া তাঁহার উপদেশে সংসারাসক্তি হইতে বিমুক্ত হয়, এবং সেই নিত্যশুদ্ধ মুক্ত সৎচিৎ আনন্দের তত্ত্ব পরোক্ষভাবে শুনিয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া তিনি কে, কোথায় থাকেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে পাইব ইত্যাদি জানিবার ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গুরুকে ভক্তি এবং গুরুর উপদেশের উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক শাস্ত্রবাক্য সকল বিচার করত দেখিতে পায় যে, এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত হইতে আমি পৃথক্, সৎচিৎ আনন্দ ভিন্ন আমার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ অন্য কিছুই হইতে পারে না, এবং এই কৃৎস্ন জগতের আত্মাও সেই সৎচিৎ আনন্দ। অনন্তর শাস্ত্রোপদিষ্ট ধ্যানদ্বারা জীব দেখিতে পায় যে তাহার আপন আত্মা এবং জগতের আত্মা এক ও অভিন্ন। এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই অপরোক্ষানুভূতি বলে। সেই সৎচিৎ আনন্দস্বরূপ আত্মা যখন এই সমস্ত জগতের আত্মারূপে প্রকাশিত হন তখন তিনি এই সমস্ত জগতের স্রষ্টা ও ঈশ্বর এবং পরমাত্মা (১) বলিয়া অভিহিত হন এবং সেই সৎ চিৎ আনন্দ যখন জীবগণের আত্মা বলিয়া প্রতিভাত হন তখন তিনি এই জগতের অধীন জীবাত্মা (২) বলিয়া খ্যাত

(১) ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

হিরণ্যগর্ভ হইতে অতি সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মের একটি সামান্য অংশমাত্র। চিন্ময় অমৃত পরমাত্মাই ব্রহ্মের স্বরূপ ভাব।

৺ গীতা বলিয়াছেন—

আমি একাংশ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করত অবস্থিত আছি।

(২) কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—

জীবাত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে অশ্ব পরিচালন রজ্জু বলিয়া জান। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়,) উক্ত রথের অশ্ব, এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় (অর্থাৎ রূপ, রস.গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) উক্ত অশ্বগণের বিচরণের পথ, এবং ইন্দ্রিয় মন যুক্ত আত্মাই এই সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। যে রথীর সারথি সুদক্ষ এবং অশ্ব সকল সম্যক্ বশীভূত সেই রথী যেমন অনায়াসে পথ অতিক্রম করত অভিলষিত স্থানে গমন করিতে পারে তপস্যা ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা যে সাধকের বুদ্ধি নির্ম্মল হয় এবং

হন। সেই আত্মা নিত্য ও অবিনশ্বর। এই জগৎ তাঁহা কর্তৃক সৃষ্ট স্থাপিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই জগৎ পূর্ব্বেও ছিল না পরেও থাকিবে না কেবল এখন জীবের স্বপ্নের মত ঈশ্বরের মায়াদ্বারা উদ্ভাসিত রহিয়াছে। যখন এই মায়িক জগতের বিষয় কিছুমাত্র মনে না করিয়া কেবল মাত্র সেই আত্মাকে মনে করা যায় তখন তিনি মায়াতীত নির্গুণ আত্মা। যখন তিনি এই জগতের প্রতিযোগিরূপে অভিহিত হন তখন তিনি মায়াধ্যক্ষ পরমাত্মা। এবং যখন তিনি জীব শরীরের প্রতিযোগিরূপে উক্ত হন তখন তিনি মায়াধীন জীবাত্মা। বাস্তবিক আত্মা এক ভিন্ন অনেক নহেন। যখন ঈশ্বরানুগ্রহে কোন মনুষ্যের এই জ্ঞান দৃঢ় হয় এবং সেই মনুষ্য আপনাকে সেই নির্গুণ আত্মা ভিন্ন অন্যরূপে না দেখেন তখনই সেই মনুষ্য আপনাকে নিত্য শুদ্ধমুক্ত সৎ চিৎ আনন্দ বলিয়া দেখিতে পান, ও পুর্ব্ব কথিত ব্যক্তির গান্ধার প্রাপ্তির ন্যায় তাঁহার আত্মপ্রাপ্তি হয়। যেমন ধনুক হইতে মুক্ত তীরে যতক্ষণ গতিশক্তি থাকে ততক্ষণ সেই তীর আকাশপথে চলে, পরে তাহা ভূমিতে পড়িয়া যায়, সেই প্রকার যে কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্ম্ম যতক্ষণ উপভোগ দ্বারা ক্ষয় না পায় ততক্ষণ সেই জ্ঞানী ব্যক্তি জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকেন। কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই সেই সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানদ্বারা ধ্বংস হইয়া যাওয়ায়, প্রবৃত্ত কর্ম্মফল, উপভোগ দ্বারা, ধ্বংস পাইবা মাত্র তাঁহার শরীরপাত হয়; এবং তিনি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ বা

মনও ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ ভাবে বিজিত হয় সেই সাধকও সেই রূপে সংসারাবর্ত্ত অতিক্রম করত ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

৮ গীতা বলিয়াছেন—

আমারই অংশ সংসারে সনাতন জীবাত্মারূপে প্রকৃতিস্থ মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে লইয়া যান। বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধ বহন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ জীবাত্মা যখন এক শরীর পরিত্যাগ করেন এবং অন্য শরীর গ্রহণ করেন তখন তিনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে সঙ্গে লইয়া যান। শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে অধিষ্ঠান করিয়া জীবাত্মা বিষয় সমূহ ভোগ করেন।

মুক্তিলাভ করেন; এবং নির্গুণ আত্মা হইতে তাঁহার আর কোনরূপ পার্থক্য থাকে না। হে শ্বেতকেতো! পূর্ব্বে (অষ্টম খণ্ডে) যিনি সৎ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন তিনিই এই অণিমা অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মা। এই সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ সেই সৎ পদার্থ। কেবলমাত্র মায়া দ্বারাই সেই সৎ পদার্থ জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। সেই সৎ পদার্থই একমাত্র সত্য, এবং সেই সৎ পদার্থই মায়াতীত নির্গুণ আত্মা। সেই সৎস্বরূপ মায়াতীত নির্গুণ আত্মাই তুমিরূপে প্রতিভাত হইতেছে। বাস্তবিক তোমার স্বরূপ সেই সৎ পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি সেই আত্মা।"

ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত এই শ্রুতিতেও আত্মজ্ঞানের জন্য পুরুষের মেধার আবশ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অষ্টম প্রবন্ধ।

ব্রহ্মজ্ঞান সাধন

এক্ষণে দেখা গেল যে, আত্মজ্ঞানের জন্য বিচারের প্রয়োজন। কিন্তু সেই বিচার বেদের অনুকূল যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক না করিলে ফলদায়ক হয় না। শ্রুতি ও স্মৃতিতে অতি স্পষ্টরূপেই বলা আছে যে, শুষ্ক তর্কে কোন ফল নাই। কঠোপনিষদে ভগবান্ যমরাজ নচিকেতাকে বলিয়াছেন—

"যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তাহারা আত্মাকে অস্তি, নাস্তি, কর্ত্তা, অকর্ত্তা, শুদ্ধ, অশুদ্ধ ইত্যাদি নানাবিধ ভাবে চিন্তা করিয়া থাকে। সুতরাং অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শুনিয়া আত্মার তত্ত্ব জানা যায় না। তত্ত্বজ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত নিজ বুদ্ধিবলেও আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। যেহেতু ইহা অতি সূক্ষ্ম ও তর্কের অতীত। হে প্রিয়তম নচিকেতঃ। আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য তোমার যে প্রকার মতি হইয়াছে, গুরূপদেশ ব্যতীত শুষ্ক তর্ক দ্বারা এই প্রকার মতি জন্মে না। শুষ্ক তর্ক পরিত্যাগী সাধক, আত্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর উপদেশে, বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এই প্রকার মতি পাইলে তবে আত্মজ্ঞান পাইতে পারে। হে নচিকেতঃ! তুমি প্রেয় বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মজ্ঞানলিপ্সু হইয়া সত্যসন্ধ হইয়াছ। তোমার মত প্রশ্ন-কর্ত্তা শিষ্য আমাদের প্রার্থনীয়।"

স্মৃতিতেও লিখিত আছে যাহা অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার অতীত সেখানে তর্ক প্রয়োগ করিতে নাই। অচিন্ত্য বস্তুর লক্ষণ এই যে, তাহা প্রকৃতির পর।

ভগবান্ বাসুদেব বলিয়াছেন—আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

যাঁহারা ধর্ম্মশুদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুমান (তর্ক) এবং বিবিধ শাস্ত্র বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবেন।

যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা ঋষিগণপ্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশ গুলির যথার্থ অর্থ অনুসন্ধান করেন, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হন। যাঁহারা সেরূপ করেন না, তাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে পারেন না। বাস্তবিক শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে গেলে অনেক তপস্যা করিতে হয়।

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—

শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ পরস্পর পৃথক্। তাহারা মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রবর্ত্তিত করে। যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন করেন তাঁহার মঙ্গল হয়। আর যে ব্যক্তি প্রেয়ঃ গ্রহণ করে তাহার পুরুষার্থ বিফল হয়।

স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি বহির্ম্মুখী করিয়াছেন। অতএব জীবগণ স্বভাবতঃ বাহ্য পদার্থ সকলই অবলোকন করিয়া থাকে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কদাচ কোন বিবেকী পুরুষ অমৃতকামী হইয়া বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাকে সন্দর্শন করেন।

দুশ্চরিত হইতে বিরত, ইন্দ্রিয়লৌল্য হইতে উপরত, একাগ্রমনা এবং অবিক্ষিপ্তচিত্ত না হইলে মনুষ্য কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

উঠ, মোহনিদ্রা বিসর্জ্জন কর, তত্ত্বজ্ঞানবিৎ আচার্য্যের অন্বেষণ করিয়া লও এবং তাঁহার উপদেশে আত্মতত্ত্ব অবগত হও। সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে আত্মজ্ঞান সাধনের পথ তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় অতি দুর্গম।

আত্মা অতি গূঢ় পদার্থ। তাঁহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, বিকার নাই। তিনি মহত্তত্ত্ব (হিরণ্যগর্ভ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিত্যবিজ্ঞপ্তিস্বরূপ, সর্ব্বসাক্ষী, নির্গুণ ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব মৃত্যুর গ্রাস হইতে মুক্ত হয়।

কেবল বেদাদিশাস্ত্রপাঠ বা স্বীয় মেধা বা অপরের উপদেশ শ্রবণ দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু ভজন দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন তিনিই আপনাকে সেই পরাৎপর আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিয়াছেন—

সেই সচ্চিদানন্দ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরে যে মহাত্মার পরাভক্তি হয় এবং যিনি আপন গুরুকে সেইরূপ ভক্তি করেন কেবল তিনিই শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

আহার শুদ্ধি হইলে অন্তঃকরণশুদ্ধি হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইলে সচ্চিদানন্দ আত্মাকে সর্ব্বদা স্মরণপথে রাখা যায়। আত্মাকে সর্ব্বদা ধ্যান করিতে পারিলে সমস্ত বন্ধ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং আহারশুদ্ধি যোগের মূল। এই আহার শব্দ আ পূর্ব্বক হৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং আহার শব্দের অর্থ আহরণ। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, স্পর্শন, নিশ্বসন, ভোজন, মনন প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা কোন চিত্তবৃত্তি বা বাহ্য পদার্থকে জীবের অভ্যন্তরে আনয়ন করাকে আহরণ বলা যায়। এই সমস্ত পবিত্র হইলে তবে অন্তঃকরণশুদ্ধি হয় সুতরাং মুমুক্ষুজীব এমত স্থানে বাস করিবেন যেখান হইতে কোন প্রকার পাপময় দৃশ্য দৃষ্ট হয় না, কোন প্রকার পাপময় শব্দ শুনা যায় না, কোন প্রকার পাপময় গন্ধ আঘ্রাত হয় না, যেখানে কোন প্রকার পাপময় দ্রব্য স্পৃষ্ট হয় না, ও যেখানে দূষিত বায়ু নিশ্বসিত হয় না।

ভোজন সম্বন্ধে ৺ গীতা বলিয়াছেন আয়ু, চিত্তস্থৈর্য্য, শারীরিক বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচির বর্দ্ধনকারী, সুস্বাদু, তৈল ঘৃতাদি যুক্ত, শরীরের স্থায়ী উপকারী এবং দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়গ্রাহী ভোজনই সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

মুমুক্ষুগণের মনন প্রভৃতি কার্য্যকে ৺গীতা সংক্ষেপে তপ নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এই তপকে শারীরিক, বাচিক ও মানসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শুচিতা, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য * এবং অহিংসা শারীরিক তপ নামে উক্ত হই-

---

* গার্হস্থ্যাশ্রমীর পক্ষে ভগবান্ মনু নিম্নলিখিত ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন।—
সর্ব্বদা স্বদার নিরত থাকিবে। স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ঋতুকাল ষোড়শ অহোরাত্র। তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি ও একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি ও অমাবস্যাদি পর্ব্বকাল বর্জ্জন

য়াছে। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয়ভাবে কথিত ও হিতজনক বাক্য, বেদাভ্যাস, এবং ইষ্ট মন্ত্র জপ বাঙ্ময় তপ নামে আখ্যাত হইয়াছে। এবং মনের সাচ্ছন্দ্য, সর্ব্বজীবের হিতৈষিতা, বাক্যসংযম, বিষয়সুখ হইতে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার, এবং সর্ব্ব প্রকার পাপচিন্তা পরিত্যাগ মানসিক তপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। সাধনার প্রথম অবস্থায় সাধকের বারম্বার পদস্খলনের সম্ভাবনা। কেহ কেহ দুই একবার পদস্খলন হইলেই সাধনা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এরূপ করা উচিত নহে। অনেক শ্রেষ্ঠ সাধকও বারংবার স্খলিতপদ হইয়া অধ্যবসায় দ্বারা পরিশেষে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিষয়ে ভগবান্ মনুর নিম্নলিখিত আদেশগুলি প্রতিপালন পূর্ব্বক চলিলে সাধককে আর যোগভ্রষ্ট হইতে হয় না। লোক সমাজে নিজের পাপখ্যাপন, পাপের জন্য অনুতাপ, তপস্যা ও অধ্যয়ন দ্বারা পাপকারী ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং আপদ্ পক্ষে দান দ্বারাও পাপের নিষ্কৃতি হয়। পাপ করিয়া পাপী স্বয়ং লোক সমক্ষে অনুতাপ সহ আত্মকৃত অপরাধ যে পরিমাণে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়, সেই পরিমাণে সেই ব্যক্তি নির্ম্মোকমুক্ত সর্পের ন্যায় সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে পরিমাণে পাপকারীর মন দুষ্কৃত কর্ম্মকে নিন্দা করিয়া থাকে সেই পরিমাণে সেই পাপকারী সেই দুষ্কৃত জন্য পাপ হইতে মুক্ত হয়। পাপ করিয়া যদি পাপীর সন্তাপ উপস্থিত হয় এবং পুনর্ব্বার আর এরূপ করিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পাপকারী যদি উক্ত পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে সে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে ইহা মনে মনে বিশেষ আলোচনা করিয়া কায়মনোবাক্যে শুভকর্ম্মের আচরণ করিবে। অজ্ঞানকৃত হউক বা জ্ঞানকৃত হউক পাপকর্ম্ম করিয়া উক্ত কর্ম্মজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকিলে ঐ পাপকর্ম্ম আর দ্বিতীয়বার করিবে না। বিহিত প্রায়-

---

করত অবশিষ্ট প্রশস্ত দশ রাত্রির মধ্যে কেবল মাত্র দুই রাত্রিতে স্ত্রী গমন করিলেও গৃহস্থ ব্রহ্মচারী থাকেন।

শ্চিত্ত করিয়াও পাপকারী যদি আপনাকে পাপমুক্ত মনে করিতে না পারে, তাহা হইলে আপন চিত্ততুষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে সেই পাপমুক্তির জন্য তপস্যা করিতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত পাপ বেদাধ্যয়ন দ্বারা নষ্ট হয়। কিন্তু রাগদ্বেষাদি মোহবশত ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃত পাপ হইতে মুক্তির জন্য বিহিত প্রায়শ্চিত্ত সকল কর্ত্তব্য।

——*:**:*——

নবম প্রবন্ধ।

—:*:*:*:—

যোগ বিষয়ক উপদেশ।

যোগশাস্ত্র প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন—

যম নিয়মাদি যোগানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে ক্রমশঃ জ্ঞানের উৎকর্ষ হইয়া অবশেষে আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্ট প্রকার সাধনাকে যোগাঙ্গ বলে। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য* এবং অপরিগ্রহ যম শব্দ বাচ্য। শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানকে নিয়ম বলে। নিশ্চল এবং স্বচ্ছন্দভাবে উপবেশনকে আসন বলে। আসন জয়ানন্তর রেচন, স্তম্ভন ও পূরণ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম। ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের বিষয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ হইতে অপসারণ করার নাম প্রত্যাহার। শরীরের অভ্যন্তরে বা বাহ্য প্রদেশে কোন স্থানে চিত্তকে স্থিরীকরণের নাম ধারণা। যেস্থানে চিত্তের ধারণা হয় সেই স্থানে কোন এক জ্ঞানের সদৃশ প্রবাহকে ধ্যান বলে। ধ্যান করিতে করিতে যখন সেই ধ্যেয় বস্তু মাত্র অন্তঃকরণে প্রকাশ পায়, অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, সেই অবস্থাকে সমাধি বলে। সেই ধ্যেয় বস্তু যখন আত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্ব প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় তখন যোগীর নির্ব্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। ব্যাধি, চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা, সন্দেহ, সমাধি সাধনে ঔদাসীন্য, আলস্য, বিষয়াসক্তি, ভ্রমাত্মক জ্ঞান, সমাধির উপযুক্ত সামর্থ্যের অভাব, সামর্থ্য সত্ত্বেও সমাধিতে অনবস্থিতত্ব এই নয় কারণে সমাধিতে চিত্তের একাগ্রতা হয় না। সুতরাং

---

* ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইলে মৈথুন প্রসঙ্গে সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিতে হয়। দক্ষসংহিতায় আট প্রকার মৈথুনের অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে যথা।— (১) স্মরণ (২) কীর্ত্তন (৩) কেলি (৪) প্রেক্ষণ (৫) গুহ্য ভাষণ (৬) সঙ্কল্প (৭) অধ্যবসায় এবং (৮) ক্রিয়া নিষ্পত্তি।

ইহারা সমাধির অন্তরায়। কোন একটী অন্তরায় দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে যোগীর আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ, মনের সাচ্ছন্দ্যরাহিত্য. অঙ্গ কম্পন এবং অসংযত শ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে। সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। যোগানুষ্ঠান কালে ছিদ্র (অবকাশ) পাইলেই নিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি সকল প্রাদুর্ভূত হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যায়। শাস্ত্রোক্ত যোগাঙ্গানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি নিরোধের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ যত্ন করার নাম অভ্যাস। দীর্ঘকাল নিরন্তর আগ্রহাতিশয় সহকারে চেষ্টা করিলে অভ্যাস সফল হয়। ইহলোকে দৃষ্ট ও শাস্ত্রাদিতে কথিত সমস্ত বিষয়ে তৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণ ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করার নাম বৈরাগ্য। চিত্তবৃত্তি সকল নিরোধ করিতে পারিলে যোগী স্বরূপ বা আত্মভাবে অবস্থান করেন। চিত্ত হইতে আত্মা বিভিন্ন এই জ্ঞান সুস্থির হইলে আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হয়। আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এইরূপ জ্ঞান তিরোহিত হইলে প্রকৃতি মায়াময় ও অসৎ বলিয়া দৃষ্ট হয়। তখন জীব মুক্ত হইয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হন এবং কেবল মাত্র আত্মা বা চিচ্ছক্তিরূপে অবস্থান করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন—

হে মহাবাহো! চঞ্চলস্বভাব মনকে নিগ্রহ করা অতি কঠিন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বশ করা যায়। আমার মত এই যে অসংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু সংযতচিত্ত সাধক শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক যত্ন করিলে যোগ পাইতে সমর্থ হন।

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী পুরুষার্থ বিনাশক এবং নরকের দ্বার স্বরূপ। সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তি এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিবেন। হে কৌন্তেয়! দুঃখ মোহাত্মক নরকের এই তিন দ্বার হইতে বিমুক্ত হইলে মানবগণ আপনার শ্রেয়ঃ আচরণ করেন এবং তদ্দ্বারা ক্রমশঃ মোক্ষপ্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি (অর্থাৎ বেদোক্ত বিধান সকল) পরিত্যাগ

পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হয় সে সিদ্ধি (অর্থাৎ পুরুষার্থ যোগ্যতা) লাভ করিতে পারে না, এবং মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্ত শাস্ত্রই তোমার পক্ষে প্রমাণ। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া এই কর্ম্মভূমিতে তদাচরণে প্রবৃত্ত হও।

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! দ্রব্যসাধনসাধ্য যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে মোক্ষসাধন জ্ঞানের অন্তর্ভূত। অতএব তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী আচার্য্যকে প্রণাম ও সেবা করিয়া বন্ধ, মোক্ষ, বিদ্যা, অবিদ্যা, শ্রেয়ঃ, প্রেয়ঃ ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন করত জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা কর, তিনি তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন। তাঁহার উপদিষ্ট জ্ঞান তাঁহার প্রদর্শিত উপায় দ্বারা লাভ করিতে পারিলে আর তুমি এখনকার মত মোহ প্রাপ্ত হইবে না। বরঞ্চ আত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মে হিরণ্যগর্ভাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত দেখিতে পাইবে।

প্রদীপ্ত অগ্নি, কাষ্ঠ সকলকে যেমন ভস্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্নি সেইরূপ প্রারব্ধফল ব্যতিরিক্ত অন্ত সমস্ত কর্ম্মকে নির্ব্বীজ করে।

এই সংসারে জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই। বহুকালব্যাপী যোগ দ্বারা স্বয়ং জ্ঞানের অধিকারী হইলে তবে মনুষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করে।

ঈশ্বরে ভক্তিমান, গুরূপদেশনিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং সম্যক্ জ্ঞান হইলেই মোক্ষ হয়। সংশয়াত্মা ব্যক্তি ভক্তিবিহীন সুতরাং অনাত্মজ্ঞ থাকিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্মক ব্যক্তির ইহকালও নাই পরকালও নাই এবং তাহার কখনই সুখ হয় না।

স্বগুণ শ্লাঘারাহিত্য, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযম, বিষয়বৈরাগ্য, অনহঙ্কার জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি-দুঃখে যে সকল দোষ আছে তাহাদের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, প্রেয়ঃ বিষয়ে প্রীতিত্যাগ, পুত্র দার গৃহাদিতে অনাসক্তি, ইষ্টানিষ্টলাভে সমচিত্তত্ব, ঈশ্বরে সর্ব্বাত্মতা দৃষ্টিপূর্ব্বক ঐকান্তিক ভক্তি, বিবিক্তদেশসেবিত্ব, প্রাকৃত

জন সভায় অরতি, আত্মজ্ঞান সাধনে নিত্য তৎপরত্ব এবং তত্ত্বজ্ঞান ফলালোচনা, এইগুলি পূর্ণ জ্ঞান সাধনোপযোগী বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান বলা যায়। আর এই গুলির বিপরীত মানিত্ব, দম্ভিত্ব ইত্যাদিকে জ্ঞান সাধনের বিরোধী বলিয়া অজ্ঞান বলা যায়।

পুণ্যকর্ম্মা চারি প্রকার লোক ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মের উপাসনা করেন। যথা—বিপন্ন, কামনাপরতন্ত্র, ভগবত্তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানীব্যক্তি নিত্যযুক্ত হইয়া অনন্যভাবে ঈশ্বরে ভক্তি করিয়া থাকেন। তিনিই ভক্তশ্রেষ্ঠ, তাঁহার ভক্তিই পরাভক্তি, এবং তাঁহার ঈশ্বর-প্রেমই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং তিনিই ঈশ্বরের প্রিয়।

ভক্ত মাত্রেরই প্রকৃতি উদার; কিন্তু জ্ঞানিব্যক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহেন যেহেতু তিনি একমাত্র পরাৎপর ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

বহুজন্ম ভজনা এবং জ্ঞান সাধনা করিলে পর, জ্ঞানিব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পান। তখন তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান হয়। এই প্রকার মহাত্মা সুদুর্লভ।

ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হেতু। ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রবর্ত্তিত হয়। এই তথ্য জানিয়া বিবেকীরা পরমার্থতত্ত্বে অভিনিবেশ পূর্ব্বক ব্রহ্মকে ভজনা করেন। সুতরাং জ্ঞান না হইলে ভক্তি হয় না।

ব্রহ্মার্পিতচিত্ত, ব্রহ্মগতপ্রাণ ভক্ত সমূহ, ন্যায়োপেত শ্রুত্যাদি প্রমাণ দ্বারা পরস্পরকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মবিষয়ে কথোপকথন দ্বারা পরিতোষ ও আনন্দ অনুভব করেন।

সতত যুক্ত ও ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন সেই সকল ভক্তগণকে ঈশ্বর সম্যক্ দর্শন লক্ষণ বুদ্ধিযোগ দান করেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারেন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে তখন তাঁহাদের পূর্ণজ্ঞান হয়, অজ্ঞান জন্য মায়া কাটিয়া যায়, এবং "আমিই ব্রহ্ম" ইহা তাঁহারা দেখিতে পান। তখন তাঁহারা ব্রহ্ম এবং আমি (অহং) শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করেন (ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই অর্থেই অহং শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন)।

ভক্তিদ্বারা মায়াধ্যক্ষ ঈশ্বর ও মায়াতীত আত্মাকে যথার্থভাবে জানা যায়, এবং পূর্ণজ্ঞান হইলেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মোক্ষ হয়। বাস্তবিক ভক্তি ও জ্ঞান পৃথক্ থাকিতে পারে না। ভক্তি না হইলে জ্ঞান হয় না এবং জ্ঞান না হইলে ভক্তি হয় না।

সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে একমাত্র ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করিলেই তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করেন। অতএব ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কর্ম্ম পরিত্যাগের জন্য শোক করিবার কোন কারণ নাই। ইহা বুঝিয়া সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণ লইলেই তাঁহাতে ভক্তি হয়। ভজন করিতে করিতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান বাড়িলেই আবার ভক্তি বাড়ে; আবার ভক্তির বৃদ্ধির সহিত জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। এইরূপে ক্রমশঃ পরাভক্তি ও পূর্ণজ্ঞান ও মোক্ষ হয়। মোক্ষ ও অদ্বৈতজ্ঞান একই কথা। অদ্বৈতজ্ঞান হইলে আর শাস্ত্র, গুরু, পূজ্য, উপাসক, ঈশ্বর, জীব, কিছুরই পার্থক্য থাকে না। তখন একমাত্র সত্য জ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর সমস্তই মায়াময় অতএব অলীক বলিয়া দৃষ্ট হয়।

—০()০()০—

দশম প্রবন্ধ।

—*:*:*—

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জ্ঞান।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অদ্বৈত জ্ঞান হইলে সেই একমাত্র নিরাকার নির্ব্বিকার মায়াতীত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থই মায়াময় বলিয়াই অনুভূত হয়। নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল ও তাহাদিগের সহিত আপনার সংসর্গ যেমন অলীক বলিয়া জানা যায়, অজ্ঞান কাটিয়া গেলে সৃষ্ট পদার্থ সকল এবং তাহাদের সহিত আত্মার সংসর্গও সেইরূপ অলীক বলিয়া দৃষ্ট হয়। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল মিথ্যা হইলেও যেমন নিদ্রাকালে সত্য বলিয়া বোধ হয়, জগৎ মায়াময় হইলেও অবিদ্যাবস্থায় সেইরূপ সত্য বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রা না ভাঙ্গিলে যেমন ব্যবহারিক সত্য প্রতিভাত হয় না, অবিদ্যা না ঘুচিলে সেইরূপ পারমার্থিক সত্য দৃষ্ট হয় না। ব্যবহারিক জগতের সহিত স্বপ্নজগতের যে সম্পর্ক, পারমার্থিক সত্যের সহিত ব্যবহারিক সত্যের কতকটা সেই প্রকার সম্পর্ক। স্বপ্নাবস্থায় যদি দৃঢ় জ্ঞান হয় যে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি তাহা হইলে আর স্বপ্ন থাকিতে পারে না। সেইরূপ অবিদ্যাবস্থায় যদি দৃঢ় জ্ঞান হয় যে আমি অবিদ্যায় ডুবিয়া রহিয়াছি তাহা হইলে আর অবিদ্যা থাকিতে পারে না। জাগ্রত ব্যক্তির আমন্ত্রণে যেমন নিদ্রা ভাঙ্গিতে পারে আত্মজ্ঞ ব্যক্তির অনুগ্রহে সেইরূপ অবিদ্যা ভাঙ্গিতে পারে। নিদ্রার স্বাভাবিক স্থিতিকাল যেমন এক দিবাবসান হইতে দ্বিতীয় দিবারম্ভ পর্য্যন্ত, সেইরূপ অবিদ্যার স্বাভাবিক স্থিতিকাল এক মহাপ্রলয়াবসান হইতে দ্বিতীয় মহাপ্রলয়ারম্ভ পর্য্যন্ত। জাগ্রত ব্যক্তির আমন্ত্রণে নিদ্রা ভাঙ্গিতে কাহারও অল্প সময় লাগে কাহারও অধিক সময় লাগে, জ্ঞানীর উপদেশে অবিদ্যা ভাঙ্গিতেও সেই তুলনায় কাহারও একজন্ম কাহারও বহুজন্ম লাগে। স্বপ্ন ও অবিদ্যার এই প্রকার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় অবিদ্যার মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য

শাস্ত্র অনেক সময় স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়পথে কোন বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও, স্বপ্নবশতঃ যেমন বোধ হয় স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল বাস্তবিক বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন বাস্তবিক অন্য কোন বস্তুর পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলেও অবিদ্যা বশতঃ জাগরণকালে বোধ হয় যে এই ব্যবহারিক জগৎ বাস্তবিক সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায় ততক্ষণ স্বপ্নদৃষ্ট মনুষ্য পশু প্রভৃতি নানাপ্রকার জীব ও অন্যান্য পদার্থ স্বপ্নদ্রষ্টার সম্মুখে সত্যভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই সেই স্বপ্নদৃষ্ট জীব ও অন্যান্য পদার্থগুলিকে দেখিতে পায় না এবং নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে স্বপ্নদ্রষ্টাও সেইগুলিকে অসত্য বলিয়া দেখিতে পায়। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ-গুলি পুরুষতন্ত্র। স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিক কল্পনা ভিন্ন সেগুলির বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে যে সকল পদার্থ দেখা যায় তাহাদের অস্তিত্ব এই ব্যবহারিক জগতের সকলেই দেখিতে পায়। সুতরাং এই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই বাহ্য জগৎ ব্যক্তিবিশেষের মনের নিরপেক্ষ অতএব বস্তুতন্ত্র। মরুভূমিতে জলভ্রম, স্থাণুতে পুরুষ ভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি ব্যবহারিক জগতের ভ্রম সকল পরীক্ষা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, "ভ্রম মাত্রেই পুরুষতন্ত্র"। বাস্তবিক মরুভূমিতে জল নাই—দ্রষ্টার মনেই তাহা হইয়াছে। সুতরাং ভ্রমটা পুরুষতন্ত্র বৈ আর কি হইতে পারে? আবার মরুভূমিতে মরুভূমি জ্ঞান, স্থাণুতে স্থাণুজ্ঞান, রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানসকল পুরুষবিশেষের মনের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং ব্যব-হারিক দৃষ্টিতে সেই জ্ঞান সকল বস্তুতন্ত্র। শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক সূক্ষ্মরূপে বিচার ও তপস্যা করিলে এই ব্যবহারিক বস্তুতন্ত্র জ্ঞান সকলও পারমার্থিক দৃষ্টিতে পুরুষতন্ত্রমাত্র বলিয়া দৃষ্ট হয়। অবিদ্যাবশতঃই ব্যবহারিক জগৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন লোকের দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মায়াময় অতএব ভ্রমমাত্র, সুতরাং পুরুষ-তন্ত্র, এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। সুতরাং অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র বস্তুতন্ত্র।

পঞ্চম প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ হইতে ভৃগুবল্লীর যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে বিচার করিলে এই বিষয়টী বিশদ হইবে। পিতা বরুণদেবের নিকট ভৃগুমুনি ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে বরুণদেব বলিয়াছিলেন যে, "ব্রহ্ম সমস্ত ভূতগণের জন্মস্থিতিলয় কারণ"—এই সূত্রটী অবলম্বনপূর্ব্বক শরীর, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন ও বাক্যবিচার করিতে থাক, ক্রমশঃ ব্রহ্ম জানিতে পারিবে।" পিতার উপদেশ অনুসারে ভৃগুমুনি অনন্যমনে বিচার করত প্রথমে অন্নকে অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষের স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহস্বরূপ এই সমস্ত বাহ্য জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন। সকল মনুষ্যই প্রথমে বাহিরটা দেখে। ভৃগুমুনিও দেখিলেন যে, বিবিধ পদার্থ সমন্বিত এই বাহ্য জগতই সমস্ত ভূতগণের জন্ম, স্থিতি ও লয় কারণ। সুতরাং পিতৃকথিত সূত্র অনুসারে পঞ্চভূতাত্মক জগৎকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করত পিতাকে আপন সিদ্ধান্ত জানাইলেন। কিন্তু পিতা বলিলেন, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, আরও তপস্যা কর। তখন ভৃগুমুনি এই স্থূল জগৎকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এই জড়জগৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দময় মাত্র। এই কয়েকটী গুণ ভিন্ন আমরা অন্য কিছুই উপলব্ধ করিতে পারি না। সম্মুখস্থ একখণ্ড মৃত্তিকা লইয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা যায় যে, মৃত্তিকা খণ্ডটীতে এমত একটী শক্তি আছে যাহা দ্বারা উহা আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের একটী বিশেষ বিকার উপস্থিত করিতে পারে এবং এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের উক্ত বিকার বিশেষের উৎপাদিকা শক্তি ভিন্ন রূপের অন্য কোন অস্তিত্ব নাই। এই প্রকারে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, মৃত্তিকায় রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দময় যে সকল গুণ আছে তাহারাও রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিশেষ বিশেষ বিকারের উৎপাদিকা শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ভৃগুমুনি স্থির করিলেন যে, জড় পদার্থ সকল বিশেষ বিশেষ শক্তির বিকাশ মাত্র এবং অচেতন শক্তি সকল ভিন্ন জড় জগতে অন্য কোন পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তিনি আরও দেখিলেন যে, কেবলমাত্র অচেতন শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়শক্তি সকল না থাকিলে এই অচেতন শক্তি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন

ভাবে উপলব্ধ করা যায় না। যদি পৃথিবীতে কোন জীবেরই দর্শনশক্তি না থাকিত তাহা হইলে আমরা কেহই জগতের রূপ দেখিতে পাইতাম না, রূপের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম না। যদি আমাদের ঘ্রাণশক্তি না থাকিত তাহা হইলে আমরা গন্ধের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতাম না। এই প্রকার যদি আমাদের অন্য কোন ইন্দ্রিয়শক্তির অভাব থাকিত তাহা হইলে সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় আমাদের গোচর হইত না। আবার অন্য কোন জগৎ নক্ষত্র গ্রহ বা উপগ্রহে যদি এমন কোন জীব থাকে যাহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ব্যতীত আরও অধিক ইন্দ্রিয় আছে তাহা হইলে আমাদের অপেক্ষা তাহারা অধিক বিষয় উপলব্ধ করিতে পারে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে কত প্রকার জীব আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে ? সুতরাং ভৃগুমুনি স্থির করিলেন যে জগতে যত প্রকার ইন্দ্রিয়শক্তি ও অচেতন শক্তি আছে তাহাদের সমষ্টিই জগতের মূল কারণ। কিন্তু অচেতন শক্তিও এক প্রকার শক্তি এবং ইন্দ্রিয় শক্তিও এক প্রকার শক্তি। সুতরাং এই উভয় শক্তিই কোন এক মূল শক্তির ভাবান্তর মাত্র। চেষ্টার্থক অন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন প্রাণ শব্দ এই মূল শক্তিকেই বুঝায়।

কৌষিতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে প্রাণশব্দের এই অর্থ অতি পরিষ্কাররূপে উক্ত হইয়াছে—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ও তাহাদের শক্তি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা বা অধিভূত। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা এবং তাহাদের শক্তি শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন এবং ঘ্রাণ, এই দশ পদার্থের নাম প্রজ্ঞামাত্রা বা অধিপ্রজ্ঞ। অধিপ্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রজ্ঞামাত্রা ভূতমাত্রা বা অধিভূতের সাপেক্ষ। যদি ভূতমাত্রা না থাকিত তাহা হইলে প্রজ্ঞামাত্রা থাকিত না। আবার অধিভূত অর্থাৎ ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞামাত্রার সাপেক্ষ। যদি প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিত ভূতমাত্রা থাকিত না। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর নিরপেক্ষ হইলে কিছুই হয় না। কিন্তু ইহারা নানা অর্থাৎ পৃথক্ নহে। যেমন রথ চক্রের অরের অর্থাৎ পাথার উপর নেমি অর্থাৎ চাকার বেড় অর্পিত, আবার চাকায় মধ্যপিণ্ড অর্থাৎ হাঁড়ির উপর অর সকল অর্পিত,

সেইরূপ ভূতমাত্রা সকল প্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল প্রাণে অর্পিত।

অতএব ভৃগুমুনি প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিয়া পিতাকে জানাইলেন। কিন্তু পিতা আবার বলিলেন তোমার এ সিদ্ধান্তও ঠিক নহে। তুমি আবার তপস্যা কর। ভৃগুমুনি আবার একাগ্রমনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে মন বা চিত্ত না থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ কোন কর্ম্মই করিতে পারে না। যদি একমনে কোন বিষয় চিন্তা করা যায় তখন অন্য কোন পদার্থ ইন্দ্রিয়পথে আসিলেও তাহা ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। আরও দেখা যায় যে জীবের মনোরাজ্যে জড় জগৎ হইতে পৃথক্ সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার সকল সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেবলমাত্র অচেতন শক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে সেই মানসিক ব্যাপার সকলের জন্ম স্থিতি ও লয় কিছুতেই সম্ভবে না। সুতরাং পিতার উপদেশমত যদি সমস্ত জগতের একটিমাত্র মূল কারণ থাকে তাহা হইলে সেই মূল কারণটী এমন হওয়া চাই যাহা হইতে এই (১) অচেতন শক্তি সকল (২) এই অচেতন শক্তি সকলকে নানাভাবে অবভাসক (প্রকাশক) ইন্দ্রিয়শক্তি সকল এবং (৩) সুখ দুঃখ ইত্যাদি মানসিক ব্যাপার সকল জন্মিতে, ও যাহাতে ইহাদের স্থিতি ও লয় হইতে পারে।

সেই মূল কারণের অন্বেষণ করিয়া ভৃগুমুনি দেখিলেন যে, স্বপ্নাবস্থায় এই বাহ্য জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর থাকে না। কিন্তু তথাপি স্বপ্নাবস্থায় আমরা বাহ্য জগতের ন্যায় জগৎ প্রত্যক্ষ দেখি এবং সেই স্বপ্নময় জগতের পদার্থ সকলের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ অনুভব করি। অধিকন্তু সুখ দুঃখ কল্পনা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার সকলও স্বপ্নাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। স্বপ্নাবস্থায় আমরা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না যে সেই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকলের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল যে বাস্তবিক অলীক এবং মনঃকল্পিত মাত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ ও মানসিক ব্যাপার সকল যে আমাদের মনের কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে তাহা আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিবামাত্র আমরা অন্য কোন

প্রমাণ ব্যতিরেকেই বুঝিতে পারি। সুতরাং দেখা গেল যে, যদি ইন্দ্রিয় শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে কেবলমাত্র অচেতন শক্তি দ্বারা এই বাহ্য জগৎ হইতে পারিত না এবং মানসিক শক্তি বা মন না থাকিলে কেবল ইন্দ্রিয় শক্তি ও অচেতন শক্তি দ্বারা এই অন্তর্জগৎ হইতে পারিত না। কিন্তু যদি কেবলমাত্র মন থাকে, তাহা হইলে মনের কল্পনা দ্বারা আমরা বাহ্য ও অন্তর্জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং ধ্বংস অনুভব করিতে পারি। সুতরাং পিতার উপদিষ্ট সূত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ভৃগুমুনি স্থির করিলেন যে, জগতে যত মন আছে, তাহাদের সমষ্টি বা হিরণ্যগর্ভ হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হয়, সুতরাং মনই ব্রহ্ম।

কিন্তু তাঁহার পিতা আবার বলিলেন যে, তোমার এ সিদ্ধান্তও ঠিক নহে। তুমি আরও তপস্যা কর তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্ম জানিতে পারিবে। ভৃগুমুনি আবার অনন্যমনে বিচার করত দেখিলেন যে, যে সকল পদার্থ জাগরণাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে, আমরা স্বপ্নে কেবল সেই সকল পদার্থ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্য পদার্থ দেখিয়া থাকি; এবং সেই সমস্ত স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের জন্যই সুঃখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকি। আমাদের জ্ঞানের বাহিরের কোন দ্রব্য আমরা স্বপ্নে দেখি না। যদি আমাদের কোন বিষয়েরই জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কোন বিষয়েরই স্বপ্ন দেখিতাম না ও তজ্জনিত সুখ দুঃখাদি অনুভব করিতাম না। জাগরণ কালে মানসিক কল্পনারও সেই অবস্থা। যে সকল পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে; সেই সকল পদার্থের জ্ঞানই আমাদের সমস্ত কল্পনার মূল। হয় এক পদার্থের জ্ঞান লইয়া অথবা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের জ্ঞান মিশাইয়া আমরা সমস্ত বাহ্য ও অন্তর্জগতের এবং তাহাদের কার্য্যকারণের কল্পনা করিয়া থাকি। আমাদের জ্ঞানগম্য নহে,এমন কোন পদার্থের সহিত আমাদের কল্পনার কোন সংশ্রব নাই। অতএব কেবল-মাত্র মন হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতে পারে না। কিন্তু বিবিধ জ্ঞান বা বিজ্ঞান হইতেই কল্পনা হয় এবং কল্পনা হইতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। অতএব ভৃগুমুনি বরুণদেবপ্রোক্ত সূত্রমতে সমস্ত বিজ্ঞানের

সমষ্টিকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন এবং পিতা বরুণদেবকে আপন সিদ্ধান্ত বলিলেন।

বরুণদেব আবার বলিলেন, তোমার এখনও ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, তুমি আরও তপস্যা কর, তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্ম জানিতে পারিবে। ভৃগুমুনি আবার একাগ্রমনে জগতের মূলকারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন তিনি দেখিলেন, যে একমাত্র বিজ্ঞানও জগতের মূলকারণ হইতে পারে না। বিবিধ পদার্থের এবং তাহাদের কার্য্যকারণের জ্ঞানই বিজ্ঞান। যদি বিবিধ পদার্থ সমন্বিত বাহ্যজগৎ না থাকে, এবং উক্ত বাহ্যজগৎ যদি ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং বিজ্ঞানের মূল বাহ্যজগৎ ও ইন্দ্রিয়শক্তি। তখন ভৃগুমুনি দেখিলেন যে, তিনি সমস্ত ভূতগণের জন্ম, স্থিতি ও লয়কারণ অনুসন্ধানের জন্য বাহ্য জগৎ ও ইন্দ্রিয় শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই বাহ্য জগৎ ও ইন্দ্রিয়শক্তিতেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার বিচার প্রণালীতে অবশ্য কোন ভ্রম হইয়াছে। কেন না যেমন প্রথমে বৃক্ষ হইতে ফলের উৎপত্তি হইয়াছে, কিম্বা প্রথমে ফল হইতে বৃক্ষ জন্মিয়াছে, ইহার সিদ্ধান্ত অনুমানগম্য হইতে পারে না, সেইরূপ বাহ্যজগৎ, ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন্‌টী মূলকারণ তাহাও অনুমানগম্য নহে। তখন তিনি পিতার উপদেশগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে, শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, এবং বাক্যকে তাঁহার পিতা ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ বলিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে তিনি শরীর প্রাণ ইন্দ্রিয় এবং মন পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও তিনি বাক্য পরীক্ষা করেন নাই।

অনন্তর মন্ত্রদর্শী ঋষিগণের তপঃপ্রভাবে ঈশ্বরানুগ্রহে উক্ত ঋষিগণের জ্ঞানপথে উদিত, এবং তদনন্তর তাঁহাদের মুখনিঃসৃত, শাস্ত্রবাক্য সকল অবলম্বনপূর্ব্বক ভৃগুমুনি একমনে সৃষ্টিস্থিতি-লয়-কারণকে চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, অচেতনশক্তি-ইন্দ্রিয়শক্তি-মন-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দবিহীন, স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত নির্ব্বিকার,

মায়াতীত,সচ্চিদানন্দ আত্মাই ব্রহ্ম। * একমাত্র তিনিই চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি এবং একমাত্র তিনিই বাস্তবিক বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহা হইতে পৃথক্ কোন বস্তুরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। অচেতনশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বিজ্ঞান সমস্তই তাঁহারই মায়া। ইহাদিগের পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলেও তাঁহারই লীলাবশতঃ ইহাদের সমষ্টিরূপ চক্র বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎভাবে ভাসমান রহিয়াছে।

---

* কোন একটী পদার্থকে যদি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে সেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ থাকে, তাহাকে স্বগত ভেদ বলে। যথা—একটী বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র প্রভৃতির মধ্যে পরস্পরের পার্থক্যকে বৃক্ষের স্বগত ভেদ বলা যায়। এক জাতীয় পদার্থগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভেদকে স্বজাতীয় ভেদ বলা যায়। যথা— এটী আম্রবৃক্ষ, এটী নারিকেল বৃক্ষ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে। যথা— এটী বৃক্ষ, এটী পর্ব্বত; এটী জীব ইত্যাদি।

—*:*:*—

একাদশ প্রবন্ধ।

—:*:*:*:—

প্রকৃতি।

বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎরূপে ভাসমান অচেতনশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বিজ্ঞানের সমষ্টিরূপ চক্রের অন্য একটী নাম প্রকৃতি। যখন আত্মা এই মায়াময়ী প্রকৃতির অধ্যক্ষরূপে দৃষ্ট হন তখন তাঁহাকে পরমাত্মা বা জগদ্ধাত্রী বা আদ্যাশক্তি বা ঈশ্বর বলা যায়, এবং যখন তিনি এই মায়াময়ী প্রকৃতির অধীনরূপে দৃষ্ট হন তখন তিনি জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। আর যখন প্রকৃতিকে মায়াময়ী বলিয়া পরিত্যাগ করা যায় তখন কেবল একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দ আত্মা অথবা চিন্ময়ীশক্তি বিদ্যমান থাকেন। তখন আর ব্যবহারিক দ্রষ্টা দৃষ্টি এবং দৃশ্য, পূজ্য পূজক এবং পূজা, জ্ঞেয় জ্ঞাতা এবং জ্ঞান, স্রষ্টা সৃষ্টি এবং সৃষ্ট, পরমাত্মা জীবাত্মা এবং প্রকৃতি প্রভৃতি ত্রিপুটীভাব থাকে না। কেবল মাত্র সেই অদ্বয় আত্মামাত্র থাকেন। অদ্বৈতজ্ঞান, মোক্ষ, ব্রহ্ম, অদ্বয় আত্মা, একমেবাদ্বিতীয়ং প্রভৃতিশব্দ সকল সেই একমাত্র পারমার্থিক সত্যকেই বুঝায়। ৺গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

মায়াময় অতএব বাস্তবিক সত্বাহীন জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই এবং সচ্চিদানন্দ আত্মার সত্বা কখনই অবিদ্যমান থাকে না। মায়াময়ী প্রকৃতি এবং সৎ আত্মা ইহাঁদের উভয়ের তত্ত্ব সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা অবগত আছেন। আত্মা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহার বিনাশ নাই। কেহই এই অব্যয় আত্মার বিনাশ সাধন করিতে পারে না।

আত্মার জন্ম ও মরণ নাই; ইনি নিত্য সৎ রূপে বিদ্যমান; অতএব ইনি অনাদি, অনন্ত, নিত্যমুক্ত, নির্ব্বিকার, বৃদ্ধি ক্ষয় রহিত এবং সর্ব্বদা একই রূপে বিদ্যমান থাকেন। প্রকৃতির জন্ম স্থিতি ও লয়ের জন্য ইহাঁর

কোন পরিবর্ত্তন হয় না। (কঠোপনিষৎ হইতে এই শ্রুতিবাক্যটী ৺গীতায় প্রমাণ স্বরূপে উদাহৃত হইয়াছে)।

মনুষ্যেরা যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেইরূপ নির্ব্বিকার আত্মা এক শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শরীর গ্রহণ করেন।

হে কৌন্তেয় অর্জ্জুন! আমার মায়াপ্রযুক্ত স্থিতিকালে অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থায় আমাতে ভাসমান এই ভূত সকল প্রলয়কালে আমারই মায়ারূপিণী অব্যক্তা প্রকৃতিতে লোপ পায়, আবার নূতন কল্পারম্ভে আমিই তাহাদের সৃষ্টি করি :

স্বপ্নবিহীন গাঢ় নিদ্রাকালে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব অনুভূত না হইলেও তাহারা একেবারে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু অব্যক্ত বীজ ভাবে বর্ত্তমান থাকে এবং সুষুপ্তিকাল অতিক্রান্ত হইলেই আবার মন ও বুদ্ধিরূপে ব্যক্ত হয়। যদি সুষুপ্তি হইলেই মন ও বুদ্ধি বিনষ্ট হইত তাহা হইলে সুষুপ্তির পর আর এমন বোধ হইত না যে, যে আমি সুষুপ্তিগ্রস্ত হইয়াছিলাম সেই আমি এখন আবার সুযুপ্তি হইতে মুক্ত হইয়াছি। সেইরূপ প্রলয় হইলেই জীবের মন বাসনা ও কর্ম্মফল একেবারে ধ্বংস পায় না, কিন্তু তাহারা অব্যক্ত বীজভাবে বর্ত্তমান থাকে। আবার প্রলয়াবসানে তাহারা ব্যক্ত হয়। সুতরাং প্রলয় হইলেই জীব মুক্ত হয় না। মুক্তির জন্য জীবকে শাস্ত্রোপদিষ্ট মতে চলিয়া ঈশ্বরকে অনন্যভাবে ভক্তি করত শাস্ত্রবাক্য বিচার ও ঈশ্বরধ্যানপূর্ব্বক জানিতে হইবে যে আমি বদ্ধ নহি, আমি বাস্তবিক মুক্ত কেবল ভ্রম প্রযুক্তই আমি আপনাকে বদ্ধ মনে করিতেছি। নতুবা মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত জীবকে বদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং আপন আপন কর্ম্মফলে মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত বারম্বার জন্ম-গ্রহণ, সুখ দুঃখ ভোগ, এবং শরীর পরিত্যাগ করিতে হইবে। মহা-প্রলয়ের কালগণনা পুরাণমতে নিম্নলিখিতরূপে করিতে হয়। যথা, মনুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র। দেবতাদিগের দ্বাদশ সহস্র বর্ষে এক চতুর্যুগ। চতুর্যুগ সহস্রে অর্থাৎ এক প্রলয়ের

অবসান হইতে নূতন প্রলয়ারম্ভ পর্য্যন্ত সময়ে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার এক দিন। এবং চতুর্যুগ সহস্রে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার এক রাত্রি অর্থাৎ এক প্রলয়ের আরম্ভ হইতে সেই প্রলয়ের শেষ পর্য্যন্ত। সুতরাং অষ্টযুগ সহস্রে হিরণ্য-গর্ভ ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। এই প্রকার অহোরাত্রের হিসাবে একশত বৎসর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পরমায়ু। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পরমায়ুর শেষে মহাপ্রলয় আরম্ভ। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পরমায়ুর পরিমাণ, প্রকৃতির স্থিতি কাল*। সুতরাং অতিশয় দীর্ঘকালব্যাপিনী বলিয়া প্রকৃতিকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অনাদি অনন্তকাল ব্যাপিনী বলা যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কতকগুলি বিশেষ নিয়ম দ্বারা এই প্রকৃতি অন্তঃ ও বাহ্যজগৎরূপে ব্যক্তা ও চালিতা হইয়া থাকে, আবার অব্যক্তা হইয়া বীজরূপে থাকে। এই জন্য ভগবান বলিতেছেন এই সমস্ত ভূতগণ প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত। আমি সেই প্রাকৃতিক নিয়মগুলির নিয়ন্তা। সেই প্রাকৃতিক নিয়ম মতই এই সমস্ত ভূতগণ সৃষ্ট হইয়া থাকে। আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিই এই চরাচর জগৎ প্রসব করে এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে।

হিরণ্যগর্ভাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ সৎ চিদাত্মা বলিয়া জান। যেমন অগ্নির উত্তাপে লৌহখণ্ড অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে, জীবের মন বুদ্ধি প্রভৃতিও সেইরূপ আমার প্রভাবে চেতনের ন্যায় দৃষ্ট হয়। আমার মত এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান। (৫) পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম, (১) অহঙ্কার অর্থাৎ আমি একজন পৃথক্ সত্ত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রকার মোহ, (১) বুদ্ধি, (১) অব্যক্ত অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতি অব্যক্ত প্রাণ এবং অব্যক্ত বিজ্ঞান, (১০) দশ ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, (১) মন-নেন্দ্রিয় বা চিত্ত বা মন এবং (৫) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ, রস, রূপ,

* বাস্তবিক হিরণ্যগর্ভ একজন স্বতন্ত্র জীব বা দেবতা নহেন। সমস্ত জীবের মনোময় কোষের সমষ্টির নাম হিরণ্যগর্ভ। উপাসনা এবং উপদেশের সৌকর্য্যার্থ হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটপুরুষ কল্পিত হয় (১৬ প্রবন্ধ দেখ)।

স্পর্শ ও শব্দ, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক সঙ্কল্প সকল শরীর, চেতনা, এবং ধৈর্য্য ইহাদিগকে সংক্ষেপে ক্ষেত্র বলা যায়। ইহারা সকলেই বিকারশীল। হে অর্জ্জুন! অন্তর্যামী ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে আছেন। সূত্রধর সকল দারু যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকাগণকে যেমন আপন আপন ইচ্ছামত চালাইয়া থাকে, ঈশ্বর সেইরূপ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরাভিমানী জীব সকলকে আপন ইচ্ছামত ভ্রমণ করান।

মন, বুদ্ধি, কর্ম্ম ও বাক্যে সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের স্মরণ গ্রহণ কর। তাঁহার অনুগ্রহে আত্মজ্ঞানলাভ করত আপনাকে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিবে এবং পরাশান্তি লাভ করিবে।

বরুণদেব পুত্রকে একেবারে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেন নাই। তাহার কারণ এই যে তপস্যা দ্বারা অধিকারী না হইলে জীবের বুদ্ধিতে আত্ম-জ্ঞান প্রকাশিত হয় না। তবে তিনি পুত্রকে আত্মজ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন। সেই উপায় মত চলিয়া ক্রমশঃ চিত্তের উন্নতিলাভ করত আত্মজ্ঞানে অধিকারী হওয়ার পর ভৃগু মুনির আত্মজ্ঞান হইয়াছিল। আত্মার লক্ষণ ও স্বরূপবাচক শাস্ত্রবাক্য সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা করত শাস্ত্রের উপদেশমত একাগ্রমনে আত্মচিন্তাই আত্মজ্ঞানের একমাত্র উপায় এবং শাস্ত্রপ্রদর্শিত এই উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করাই পরম পুরুষার্থ। অতএব ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি এই সূত্র প্রতিপন্ন হইল।

——*:**:*——

দ্বাদশ প্রবন্ধ।

নির্গুণ আত্মার তত্ত্ব।

ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর ব্যবহারিক দৃশ্য, দর্শন ও দর্শক প্রভৃতি ভেদজ্ঞান থাকে না, তখন কেবল একমাত্র স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত আত্মা ব্যতীত আর সমস্ত পদার্থই মায়াময় অতএব সত্ত্বাবিহীন রূপে দৃষ্ট হয়।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

যে অদ্বৈত ব্রহ্মে (১) এক অন্যকে দেখে না, এক অন্যকে শুনে না, এক অন্যকে জানে না, সেই অদ্বৈত ব্রহ্ম বৃহত্ত্বার্থক ভূমা শব্দ বাচ্য। যে অবস্থায় এক অন্যকে দেখে, এক অন্যকে শুনে, এক অন্যকে জানে সেই দ্বৈত ভাবাপন্ন জগৎ অল্পশব্দবাচ্য। ভূমা অমৃত এবং অল্প মর্ত্ত্য।

নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে ভগবন্! সেই ভূমা কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" উত্তরে ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়াছিলেন "ভূমা আপন মহিমাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অপর কোন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। তিনি নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠা।"

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—

অদ্বৈত আত্মা মায়া প্রভাবে যখন দ্বৈতভাবে প্রতিভাত হন, তখন দ্রষ্টা দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা দ্রষ্টব্য পদার্থ দর্শন করে, ঘ্রাতা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাতব্য পদার্থ আঘ্রাণ করে, শ্রোতা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করে, বক্তা বাগিন্দ্রিয় দ্বারা অপর ব্যক্তিকে অভিবাদন করে, মন্তা মননেন্দ্রিয় দ্বারা মন্তব্য বিষয় মনে করে, এবং বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বিজ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু স্বপ্নকালে দৃষ্ট জগৎ জাগরণা-

(১) সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থায় যখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, এবং জ্ঞানীর চক্ষে এখনও যেরূপ এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই সেই অবস্থায়।

বস্থায় যেরূপ লোপ পায়, সেইরূপ যখন ব্রহ্মবিদের জ্ঞান দৃষ্টিতে সমস্ত বাহ্য ও অন্তর্জগৎ কেবল এক অদ্বৈত আত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয় তখন তিনি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিষয় দর্শন, আঘ্রাণ, শ্রবণ ও মনন করিবেন, কোন ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবেন, এবং কোন বিষয় জানিবেন ? ব্রহ্মবিদের অবিদ্যা নাশ হওয়ায় তিনি কর্ত্তা, করণ, কর্ম্ম, ও ক্রিয়া ও সমস্ত জগৎকে মায়াময় দেখেন, তাঁহার দৃষ্টিতে একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দ আত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তু সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় না। যেমন ভ্রম কালে ভ্রান্ত ব্যক্তি মরুভূমিকে জল মনে করে এবং ভ্রম ঘুচিয়া গেলে মরুভূমিকে মরুভূমিই দেখে সেইরূপ অবিদ্যাকালে ভ্রান্ত জীব আত্মাকে জগৎ দেখে, অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলে আত্মাকে আত্মাই দেখে।

ঈশোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

পরমার্থবস্তুদর্শী যখন সমস্ত জগৎকে একমাত্র আত্মারূপে দেখেন তখন তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞানে মোহ এবং শোকের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ভগবান বাসুদেব গীতায় বলিয়াছেন—

যে ব্যক্তি আত্মাতেই রতি, তৃপ্তি ও তুষ্টি উপভোগ করেন সেই আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই নাই। তিনি বিধি নিষেধের অতীত। কর্ম্ম-অকর্ম্ম-পুণ্য-পাপ প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার দৃষ্টিতে মায়াময়। সুতরাং পুণ্যার্থে তাঁহার কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই এবং কর্ম্ম না করার জন্য তাঁহার কোন প্রত্যবায় হয় না। আব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতই তাঁহার দৃষ্টিতে ইন্দ্রজাল সদৃশ মায়াময় হওয়ায় তাহারা তাঁহার কোন প্রয়োজনেই লাগে না।

কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

যাহাকে জগৎ বলিয়া মনে হয় তাহাই আত্মা; সেই নিরাকার নির্ব্বিকার আত্মাই মায়া-প্রভাবে দ্রষ্টা ও দৃশ্যভাবে ভাসমান রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই জগৎ ও আত্মাকে পৃথক্ মনে করে তাহাকে বারম্বার জন্ম ও মৃত্যু পরিগ্রহ করিতে হয়।

কৈবল্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদ শূন্য যে পরব্রহ্ম সকলের আত্মা, কোন পদার্থেরই যাঁহা হইতে পৃথক অস্তিত্ব নাই, যিনি এই মায়াময়ী প্রকৃতির অধিষ্ঠান, যিনি সমস্ত মহৎ পদার্থ অপেক্ষা মহত্তর, এবং সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, যিনি জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু প্রভৃতি বিকারশূন্য, তিনিই মায়াদ্বারা জীবাত্মাভাবে প্রকাশিত হন। বাস্তবিক জীবাত্মা ও নির্গুণ ব্রহ্ম অভিন্ন।

জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে যে সমস্ত প্রপঞ্চ প্রকাশ পায় সে সমস্তই ব্রহ্ম। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মকেই জীব অবিদ্যাবশত ঐ সমস্ত প্রপঞ্চভাবে দর্শন করে। বাস্তবিক এক নিরাকার নির্ব্বিকার নির্গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন এই জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সাধক "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইলে সর্ব্ব প্রকার বন্ধ হইতে মুক্ত হন।

ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে সাধক দেখিতে পান যে জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কালে যাহা কিছু ভোগ্য ভোক্তা ও ভোগভাবে প্রকাশিত হয় সে সমস্তই মায়াময়। স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ যেমন স্বপ্নকল্পিত জগৎ হইতে পৃথক এবং স্বপ্নকল্পিত জগতের সাক্ষী সেইরূপ মায়াময়ী প্রকৃতির কর্ত্তা আত্মা এই সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক এবং এই সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চের সাক্ষী। তখন সাধক দেখিতে পান যে আমি চিন্মাত্র কৈবল্যাত্মা সদাশিব ভিন্ন আর কিছুই নহি।

তখন সাধক দেখেন যে আমিই নিখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ, দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদ শূন্য, জ্ঞাতৃ জ্ঞেয়াদি বিভেদরহিত অদ্বয় ব্রহ্ম। আমিই মায়াদ্বারা দৃশ্য দর্শক ও দর্শনভাবে প্রকৃতির বিস্তার করি। আমিই এই সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চ উপসংহার পূর্ব্বক প্রলয়কালে প্রকৃতিকে অব্যক্ত ভাবে রাখি এবং মহাপ্রলয় কালে প্রকৃতি আমাতেই বিলীন হয়।

আমিই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও মহান্ হইতে মহত্তর। আমিই অনন্ত ভেদবান্ বিরাট পুরুষ, আমিই সর্ব্বপ্রথম সৃষ্ট হিরণ্যগর্ভ। আমিই

প্রকৃতির স্রষ্টা অধিষ্ঠাতা ও সংহারকর্ত্তা ঈশ্বর। এবং আমিই সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্ম।

হস্ত পদাদি আমার নাই অথচ আমি সর্ব্বশক্তিমান্। চক্ষু কর্ণাদি আমার নাই অথচ আমি সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন। মন বুদ্ধি প্রভৃতি আমার নাই অথচ সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের শক্তি আমাতে বিদ্যমান। আমি নির্গুণ আমাকে কেহ জানে না, আমি কিন্তু সর্ব্বদা সমস্ত জগৎকে জানিতেছি।

বেদ সমুদয় আমারই তত্ত্ব প্রকাশ করে। উপনিষৎ সমূহ আমা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। বেদের যথার্থ মর্ম্ম কেবল আমিই অবগত আছি। পাপ পুণ্য আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমার জন্ম নাই, আমার বিনাশ নাই,আমার দেহ নাই,আমার ইন্দ্রিয় নাই,এবং আমার বুদ্ধি নাই।

আমি ভূমি নহি, আমি জল নহি, আমি অগ্নি নহি, আমি বায়ু নহি, আমি আকাশ নহি। এই পঞ্চভূতের মধ্যে দুই বা অধিক ভূতের মিশ্রণও আমাতে নাই। আমি স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত অদ্বয় আত্মা। এই সমস্ত জগৎ আমার কল্পনা প্রসূত এবং আমার কল্পনা ভিন্ন ইহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। মায়াময়ী ব্যক্তা ও অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে আমি সম্পূর্ণ পৃথক্। এই ভাবে আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি হইলে সাধক অদ্বৈত ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেন—

যখন সাধক অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন যে শরীর ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্ নির্গুণ আত্মাই আমি তখন আর তাঁহার কোন প্রকার ইচ্ছা বা কামনা থাকিতে পারে না। যে যে কারণে সাধারণ লোকের শরীর ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত কারণ ঘটিলেও তাঁহার পূর্ণানন্দের বিকার হয় না।

অনেকানর্থ সঙ্কুল, বিবেকজ্ঞান প্রতিপক্ষ, অবিদ্যাময় সংসারে প্রবিষ্ট জীবাত্মাকে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া যখন সাধক অপরোক্ষভাবে দেখিতে পান তখন তিনি আপনাকে সর্ব্বাত্মা সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বাধার সর্ব্বসাক্ষী অদ্বয় চিন্ময় বলিয়া জানিতে পারেন।

এই দেহে থাকিতে থাকিতে সাধক যদি ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে সাধক কৃতার্থ হন। যতকাল না অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয় ততকাল জীবকে বারম্বার জন্ম মৃত্যু পরিগ্রহ করিতে হয়। যাঁহারা এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাঁহারা মুক্তির জন্য শাস্ত্রপ্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করেন এবং ক্রমশঃ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যাহারা এই তথ্য জানে না তাহারা সত্য মার্গ না পাইয়া জন্ম মরণাদি দুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন দ্বারা যখন জীব ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে সক্ষম হয় তখন কোন পরম কারুণিক আচার্য্য উক্ত জীবের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন। সেই আচার্য্যের উপদেশ পাইয়া জীব মুক্তির জন্য শাস্ত্রোক্ত মার্গ অবলম্বন করেন; এবং তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব অপরোক্ষ ভাবে অবগত হন। স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত চিন্ময় ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে ব্রহ্ম হইতে আমি ভিন্ন এইরূপ ভেদ জ্ঞান সাধকের চিত্তে আর থাকিতে পারে না এবং সাধক ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

——*:**:*——

ত্রয়োদশ প্রবন্ধ।

নির্গুণ আত্মার উপাসনা।

অদ্বৈতজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, অদ্বৈত জ্ঞানলাভই পরম পুরুষার্থ এবং তপস্যা বা একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মের উপাসনাই অদ্বৈত জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়, এই তথ্য শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। উপবেশনার্থক আস্ ধাতু হইতে উপাসনা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। উপাস্য বস্তুতে চিত্তকে নিশ্চল ভাবে স্থাপিত করার নাম উপাসনা। চিত্তের ধর্ম্মই এই যে, ইহা রূপ ও গুণ দ্বারা সহজেই আকৃষ্ট হয়। সুতরাং রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দবিহীন মায়াতীত নির্গুণ ব্রহ্মতে চিত্তকে নিশ্চল ভাবে স্থাপিত করা অতি দুরূহ ব্যাপার। নিরুপাধিক ব্রহ্ম বিষয়ক শাস্ত্রবাক্য সকল বারম্বার আলোচনা পূর্ব্বক সকল প্রকার রূপ ও গুণ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত নির্গুণ আত্মাতে মনঃসংযোগ করিতে করিতে অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ এই নির্গুণ উপাসনা আয়ত্তা হয়।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—

স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই এই তথ্যে সর্ব্বদা মনোনিবেশ করিবে। যে ব্যক্তি জগৎকে অখণ্ডৈকরস ব্রহ্ম হইতে পৃথক মনে করে তাহাকে বারম্বার জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। এই অপ্রমেয় অবিনাশী ব্রহ্মকে একরস (অর্থাৎ ভেদ রহিত ও এক ভাবে স্থিত) বিজ্ঞানঘন (অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্য) বলিয়া জানিবে, যেহেতু ইনি আকাশাদি সম্বলিত সমস্ত মায়াময় জগতের অবলম্বন, ধর্ম্মাধর্ম্মাদিমলরহিত, জন্মমরণাদি বিক্রিয়াশূন্য, নিত্য, মহত্তম, আত্মা।

শাস্ত্রাধ্যয়ন, গুরূপদেশ, মনন, ধ্যান প্রভৃতি উপায় দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিয়া পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করা ধীর ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। বহুত্ব প্রতিপাদক

বহুসংখ্যক শব্দ চিন্তা করিও না। ওঙ্কার, বা অন্য বীজমন্ত্র, বা একমেবাদ্বিতীয়ং, বা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, বা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, বা সৎ চিৎ আনন্দং ব্রহ্ম, বা অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম, বা তত্ত্বমসি, বা অহং ব্রহ্মাস্মি, প্রভৃতি একত্ব প্রতিপাদক স্বল্পশব্দ বা বাক্যসকল অবলম্বনপূর্ব্বক সেই নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান করিবে। অনেক শব্দের অভিধ্যান ভ্রান্তিজনক, তদ্দ্বারা সমাধি হয় না।

আত্মা জড় জগৎ নহেন, আত্মা অচেতন শক্তি নহেন, আত্মা শরীর নহেন, আত্মা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ নহেন, আত্মা মন নহেন, আত্মা বুদ্ধি নহেন, আত্মা ইন্দ্রিয় নহেন, এই প্রকারে ইহা নহেন, ইহা নহেন, অর্থাৎ নেতি, নেতি, এই বাক্য দ্বারা আত্মতত্ত্ব শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয়। সকল ইন্দ্রিয়ের অগম্য বলিয়া আত্মা অগৃহ্য, আত্মা কাহারও শরীর নহেন সুতরাং আত্মা অশীর্য্য, কোন পদার্থের সহিত আত্মার সংসক্তি হয় না সুতরাং আত্মা অসজ্য, এবং আত্মা কোন পদার্থের সহিত বদ্ধ নহেন, অতএব আত্মা অসিত। এই অগৃহ্য, অশীর্য্য, অসজ্য, অসিত আত্মা সুখদুঃখাতীত এবং অবিনাশী। শরীর ধারণ হেতু পাপক্রিয়া-জনিত পরিতাপ বা পুণ্যকর্ম্ম জনিত হর্ষ নিত্যমুক্ত আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে ইহজন্মে অথবা পূর্ব্বজন্মে আত্মজ্ঞানী যে কোন পাপ বা পুণ্যকর্ম্ম করিয়া থাকিতে পারেন সে সমস্ত কর্ম্মের ফল আত্মজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং আত্মজ্ঞানলাভের পর অনাত্মজ্ঞানীর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মজ্ঞানী কোন পুণ্য বা পাপ করিলেও তজ্জনিত ফল আত্মজ্ঞানীকে স্পর্শ করে না। সুতরাং প্রবৃত্ত ফল কর্ম্ম উপভোগ দ্বারা ক্ষয় পাইলেই আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এই সংক্রান্ত একটী ঋক্ (মন্ত্র) আছে। যথা—"তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের নিত্য মহিমা এই যে,ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে কর্ম্মকে শুভ বা অশুভ বলা যায় তিনি সকাম ভাবে সে কর্ম্ম করেন না এবং নিষ্কামভাবে সেই কর্ম্ম করিলে তাঁহার কোন বৃদ্ধি বা ক্ষতি হয় না।

সুতরাং এই মহিমার তত্ত্ব বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য। যিনি এই মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন তিনিও কামনা পরতন্ত্র হইয়া পুণ্য পাপ করেন

না এবং অন্য কোন কারণে কোন পুণ্য বা পাপ কর্ম্ম ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাঁহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলেও তিনি তজ্জনিত পুণ্য ও পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না।" উক্ত মহিমার তত্ত্ব জানা কর্ত্তব্য, এবং উক্ত মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারিলে জীব কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হয়। শাস্ত্রের এই বিধান জানিয়া সাধক বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে শান্ত, অন্তঃকরণ তৃষ্ণা হইতে দান্ত, সর্ব্বপ্রকার কামনা হইতে উপরত, সুখ দুঃখাদি তিতিক্ষু এবং ব্রহ্মে একাগ্রচিত্ত হইলে আপন আত্মাতে ব্রহ্ম দর্শন করেন এবং সেই অদ্বৈত ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ ভ্রান্তিকল্পিত বলিয়া দেখিতে পান। প্রবৃত্ত ফল ভিন্ন ইহাঁর অপর সমস্ত পাপ পুণ্য কর্ম্মফল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে অন্য কোন পাপ পুণ্য কর্ম্মফল ইহাঁকে স্পর্শ করে না। ইনি বিগত-ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিগতকাম, এবং অহং--ব্রহ্ম--অস্মি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চিতমতি হইয়া ব্রাহ্মণ শব্দ বাচ্য হন। যে সকল ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবগণের এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান হয় না তাঁহারা গৌণ ব্রাহ্মণ, মুখ্য ব্রাহ্মণ নহেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

নির্গুণ ব্রহ্মও পূর্ণ, সগুণ ব্রহ্মও পূর্ণ। মায়াময়ী প্রকৃতিরূপ আবরণ হেতু নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্মভাবে দৃষ্ট হন। প্রকৃতি মায়াময়ী অতএব অস্তিত্ববিহীন এই জ্ঞান সুস্থির হইলে কেবলমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

ভগবান্ বাসুদেব গীতাতে বলিয়াছেন—

সঙ্কল্পপ্রভব কাম সকলকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবেকযুক্ত মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করত বুদ্ধি ও ধৈর্য্য সহকারে পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকে আত্মাতে প্রবিলার্পণ করিবে। অনন্তর সমস্তই আত্মা,আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া মনকে আত্মাতে নিশ্চল ভাবে স্থাপন করিবে এবং আত্মা ভিন্ন আর কিছুই চিন্তা করিবে না।

স্বভাবতঃ চঞ্চল অতএব (ধার্য্যমান হইলেও) অস্থির মন যদি শব্দাদি কোন কারণ হেতু আত্মচিন্তা হইতে বিচলিত হয় তাহা হইলে মনকে

নিগ্রহ করত সেই সমস্ত মায়াময় কারণ হইতে সংযমন পূর্ব্বক আত্মচিন্তায় স্থির করিবে।

এই প্রকার যোগাভ্যাস দ্বারা যে যোগী আপন মনকে প্রকৃষ্টরূপে শান্ত করিতে পারেন তাঁহার মোহাদি ক্লেশরজঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং "সমস্তই ব্রহ্ম" ইহা তাঁহার স্থিরনিশ্চয় হয়। তখন তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবর্জ্জিত হইয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হন।

যোগ সাধনের অন্তরায় সমূহ হইতে এইরূপে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা আত্ম-ধ্যান করত বিগতপাপ জীবন্মুক্ত যোগীপুরুষ অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎরূপ নির-তিশয় সুখভোগ করেন।

যোগাভ্যাস দ্বারা সমাহিতচিত্ত যোগীপুরুষ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত একরস আত্মাকে সর্ব্বত্র অবলোকন করত আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতগণকে আত্মাতে দর্শন করেন।

এইরূপ উপাসনায় সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে প্রবিলাপিত হইয়া যায় এবং ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি মায়াসংশ্লিষ্ট লক্ষণ সকল উপাসকের মন ও বুদ্ধি হইতে অপসৃত হয়। এই উপাসনায় ব্রহ্মের স্বরূপভাব উপাসিত হয় বলিয়া এই উপাসনা সর্ব্বোচ্চাধিকারী উপাসকের উপাসনা। কিন্তু ইহা আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত নিম্ন অধিকারীর পক্ষে অতিশয় কঠিন। সুতরাং নিম্ন অধিকারী সাধককে উন্নত করত তাঁহাকে ব্রহ্মের স্বরূপ সন্নিবিষ্ট উপাসনার অধিকারী করার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রে তটস্থ লক্ষণ* ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে। তটস্থ লক্ষণ ব্রহ্মের উপাসনায় ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কারণরূপে উপাসিত হওয়ায় ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব প্রভৃতি লক্ষণ উপাসকের অবলম্বন হয়। সুতরাং এই উপাসনা পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ সন্নিবিষ্ট উপাসনা অপেক্ষা সহজে আয়ত্ত হয়। এবং তটস্থলক্ষণ উপাসনা আয়ত্ত হইলে পর স্বরূপ সন্নিবিষ্ট উপাসনায় জগৎকে ব্রহ্মে বিলীন করিয়া

* যে পুষ্করিণীর ধারে তালবৃক্ষ সকল বর্ত্তমান থাকে সেই পুষ্করিণীকে যেমন তটস্থ তালবৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক 'তালপুকুর' বলা যায় সেইরূপ ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা ইত্যাদি ভাবে উপাসনাকে তটস্থ লক্ষণ উপাসনা বলে।

নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অদ্বয় আত্মার উপাসনা করা হয়। তটস্থলক্ষণ উপাসনায় জগৎ মায়াময় বলিয়া অবধারিত হইলেও জগৎ-জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু ব্রহ্মের উপাসনার উপায়স্বরূপ থাকে। স্বরূপ সন্নিবিষ্ট উপাসনায় মন ও বুদ্ধির গোচর সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কেবল মাত্র নির্গুণ আত্মার জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে।

পঞ্চদশী গ্রন্থোক্ত নিম্নলিখিত বাদানুবাদ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে নির্গুণ আত্মার তত্ত্ব কতক পরিমাণে ধারণা করিতে পারা যায়,—

"বৌদ্ধতপস্বিগণ মূর্খতাপ্রযুক্ত শ্রুতিবাক্য সকল অনাদর পূর্ব্বক কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে আত্মারূপ কোন পদার্থ নাই। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল মাত্র শূন্য ছিল। কিন্তু যে পদার্থের অস্তিত্ব থাকে কেবল তাহার সম্বন্ধেই 'আছে' 'ছিল' প্রভৃতি পদ প্রয়োগ হয়। যাহা ছিল না তাহা ছিল বলা যুক্তিযুক্ত নহে। যেখানে সূর্য্যালোক আছে সেখানে অন্ধকার নাই, এবং সূর্য্যালোক অন্ধকারময় হইতে পারে না। সেইরূপ যাহা "ছিল না" তাহা "ছিল" হইতে পারে না এবং যাহা আছে তাহাও শূন্যময় হইতে পারে না। সুতরাং "কিছুই ছিল না" এই অর্থে "শূন্য ছিল" এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। বিশেষতঃ যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই না থাকিত তাহা হইলে এই সমস্ত সৃষ্টি কোথা হইতে আসিত? সম্পূর্ণ অভাব হইতে কোন প্রকার ভাব পদার্থ হইতে পারে না। যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই না থাকিত তাহা হইলে কখনই সৃষ্টি হইতে পারিত না এবং বর্ত্তমান কালেও কিছুই থাকিত না।

বৈদান্তিকেরা বলিয়া থাকেন যে মায়াদ্বারা আকাশাদি ও তাহাদের নাম ও রূপ কল্পিত হয় কিন্তু তাঁহাদের মতে আত্মা বা সদ্বস্তু এই সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান। বৌদ্ধেরা যদি স্বীকার করেন যে তাঁহাদের শূন্য ও আকাশাদির ন্যায় সদ্বস্তুতে কল্পিত তাহা হইলে তাঁহাদিগের সহিত বৈদান্তিকদিগের আর বিশেষ পার্থক্য থাকে না। কিন্তু যদি বৌদ্ধেরা বলেন যে আত্মা বা সদ্বস্তুও কল্পিত এবং ভ্রমময় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে এই কল্পনা এবং ভ্রম কাহার? নিরধিষ্ঠান কল্পনা বা

ভ্রম কখনই হইতে পারে না। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে এই ভ্রম বা কল্পনার অধিষ্ঠান নাই। সুতরাং বৌদ্ধদের মত অসঙ্গত এবং বাস্তবিকই এই প্রপঞ্চের সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মামাত্র ছিলেন এবং সেই আত্মার সঙ্কল্প দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ মায়াময় হইয়াও সত্যরূপে মায়াময় মন ও বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে। সেই আত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় এই যে, প্রথম সমস্ত মূর্ত্ত পদার্থ মন হইতে অপসারিত করিতে হইবে। সমস্ত মূর্ত্ত পদার্থ মন হইতে অপসৃত হইলে পর অমূর্ত্ত আকাশ এবং অন্য যাহা কিছু মন বা বুদ্ধির গোচর হয় সে সমস্ত মন হইতে বিদূরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই আত্মা। এক্ষণে হয়ত কেহ বলিবেন যে মন হইতে সমস্ত বিদূরিত করিলে মনে আর কিছুই থাকে না। তাহার উত্তর এই যে ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, বৌদ্ধেরা যাহাকে শূন্য বা কিছুই না বলে তাহাই আত্মা, সেইরূপ তুমিও যাহাকে কিছুই না বলিতেছ তাহাও সম্পূর্ণ অভাব নহে কিন্তু তাহাই বাস্তবিক নির্গুণ আত্মা। কিছুই না এমত অবস্থা হইতেই পারে না, মন বুদ্ধির গোচর সমস্ত পদার্থ নিরাকরণ করিলে পর যাহা অবশিষ্ট থাকে এবং যাহাকে কোন মতেই নিরাকরণ করা যায় না সেই নিত্য সৎ পদার্থই আত্মা এই বলিয়া শ্রুতি আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন।”

—•0•0•—

চতুর্দ্দশ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

তটস্থ লক্ষণ আত্মার উপাসনা।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে যদিও ব্রহ্ম নিজে বাস্তবিক নির্ব্বিকার তথাপি তিনি আপন মায়া দ্বারা আপনাকে দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে বিবর্ত্তিত করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে কিন্তু বিবর্ত্ত। দুগ্ধের বিকারে দধির উৎপত্তি হয়; এখানে দধির উৎপত্তির জন্য দুগ্ধের স্বরূপ বিকৃত হইয়া যায়, দধিতে আর দুগ্ধের স্বভাব থাকে না। দ্রষ্টার ভ্রমবশতঃ এক বস্তু অন্যরূপে দৃষ্ট হইলে সেই বস্তুটী বিবর্ত্তিত হইয়াছে বলা যায়। কোন বস্তুর বিবর্ত্ত হইলে সেই বস্তুর নিজের স্বরূপে কোনরূপ বিকৃতি হয় না। রজ্জুকে সর্পভাবে দর্শন, মরুভূমিকে জলভাবে দর্শন, প্রভৃতি ভ্রান্তি-মূলক দৃষ্টি বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত। নির্ব্বিকার ব্রহ্মই আপন মায়ার প্রভাবে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন সমন্বিত জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। এই বিবর্ত্তনে ব্রহ্মের কোনরূপ বিকার হয় নাই। ঐন্দ্রজালিকের মায়ার ন্যায় এবং স্বপ্নকালের দৃষ্টির ন্যায় ঈশ্বরের মায়াবশে এই মিথ্যা জগৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মের স্বরূপ উপাসনা পারমার্থিক সত্যমূলক ও তটস্থ লক্ষণ উপাসনা ব্যবহারিক সত্যমূলক। সুতরাং ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ উপাসনা স্বরূপ উপাসনার অপেক্ষা সহজে আয়ত্ত করা যায় বলিয়া শাস্ত্র অনেক স্থলে তটস্থ লক্ষণ ব্রহ্মের উপাসনা বিধান করিয়াছেন। তটস্থ লক্ষণ উপাসনায় নির্গুণ ও অচিন্ত্য ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা ও ঈশ্বর ও অন্তর্যামী ও আদ্যাশক্তি ও জগদ্ধাত্রী ও দুর্গা ও তারা প্রভৃতি ভাবে উপাসিত হন। এই উপাসনায় ব্রহ্মের অব্যক্ত অচিন্ত্য স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ভাব প্রধান ভাবে এবং তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি লক্ষণ ও তাঁহার সৃষ্ট জগৎ অবলম্বন ভাবে উপাসকের মনে বর্ত্তমান থাকে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—

রূপ-রস- গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-বিহীন ভেদ-রহিত চিন্ময় ব্রহ্ম আপন নির্গুণ ভাব প্রতিখ্যাপন জন্য মায়াদ্বারা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ সম্বলিত জড়জগৎ ভাবে এবং বিজ্ঞান-মন-ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পন্ন জীব সমূহ ভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। এই বিবর্ত্তনের জন্য ব্রহ্মের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় নাই। অবিদ্যাধীন, বিবিধ-জ্ঞানযুক্ত, নানা ইন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন, অসংখ্য মন কল্পনা করিয়া তিনি অসংখ্য জীবভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইন্দ্রিয়, মন, ও বিজ্ঞান বর্জ্জিত, এক অদ্বিতীয় চিন্ময় হইলেও জীবগণ অবিদ্যাবশতঃ তাঁহাকেই অসংখ্য জীবাত্মাভাবে, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দযুক্ত অসংখ্য জড় পদার্থ ভাবে, এবং বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত অসংখ্য জীবভাবে অবলোকন করে। অশ্বগণ যেমন সারথিকে আপন গৃহ হইতে নানা স্থানে লইয়া যায় সেইরূপে বিবিধ পদার্থ বিবিধ পদার্থের জ্ঞান অসংখ্য মনোবৃত্তি সকলও ইন্দ্রিয়গণ জীবসকলকে আত্ম পদার্থ হইতে নানা অনাত্ম পদার্থে লইয়া যায়। এই ইন্দ্রিয়গণেরও সংখ্যার সীমা নাই। যে জীবের যত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে সেই জীব নির্গুণ আত্মাকে তত প্রকার ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ ভাবে সন্দর্শন করে। যাহার কেবলমাত্র কর্ণ আছে, অন্য ইন্দ্রিয় নাই সে নির্গুণ আত্মাকে কেবলমাত্র শব্দময় ভাবে শ্রবণ করে। যাহার কেবলমাত্র চক্ষু আছে অন্য ইন্দ্রিয় নাই সে নির্গুণ আত্মাকে কেবলমাত্র রূপময় ভাবে দর্শন করে। যাহার কেবল মাত্র ঘ্রাণ শক্তি আছে সে নির্গুণ আত্মাকে কেবলমাত্র গন্ধময় ভাবে আঘ্রাণ করে। যাহার কেবলমাত্র চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা আছে সে নির্গুণ আত্মাকে রূপ শব্দ ও গন্ধযুক্ত ভাবে সন্দর্শন করে। যাহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ আছে সে নির্গুণ আত্মাকে রূপ শব্দ গন্ধ রস এবং স্পর্শ গুণযুক্ত ভাবে সন্দর্শন করে। যে জীবের আরও অধিক ইন্দ্রিয় আছে সে আত্মাকে আরও অধিক গুণযুক্ত ভাবে দর্শন করে। যে জীবকে ঈশ্বর অসংখ্য ইন্দ্রিয়যুক্ত করিয়াছেন সে জীব নির্গুণ আত্মাকে অসংখ্য গুণযুক্ত ভাবে অবলোকন করে। সেইরূপ যে জীবকে ঈশ্বর যত প্রকার বিজ্ঞান ও

মনোবৃত্তি দিয়াছেন সে জীব নির্গুণ আত্মাকে তত প্রকার বিজ্ঞান ও মনোবৃত্তিযুক্ত মনে করে। বাস্তবিক ঈশ্বর কর্ত্তৃক কল্পিত বিজ্ঞান ও মন ও ইন্দ্রিয়গণই সেই চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মকে অনেক দ্রষ্টা ও দৃশ্য রূপে প্রকাশ করিতেছে। এই বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয়গণও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। সেই এক ব্রহ্মই অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য প্রাণিগণের বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয় এবং অসংখ্য প্রাণিগণের বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করিয়াছেন। স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত দেশ কালানবচ্ছিন্ন অনাদি অনন্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর, তিনিই সমস্ত পদার্থ, তিনিই সকলের আত্মা এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ।

ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন—

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! আকাশ যাহাতে ওতপ্রোতভাবে স্থিত, সেই পরমনিধান ব্রহ্মের কথা বলিতেছি। ইহাঁকে ব্রাহ্মণেরা অক্ষর বলিয়া থাকেন। ইনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, ইনি অগ্নির ন্যায় লোহিত নহেন, জলের ন্যায় দ্রব নহেন, মৃত্তিকার ন্যায় ছায়াবিশিষ্ট নহেন, ইনি অন্ধকার নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, অন্য কোন পদার্থের সহিত ইহাঁর সংসক্তি নাই, ইহাঁর রস নাই, গন্ধ নাই, চক্ষু নাই, শ্রোত্র নাই, বাগিন্দ্রিয় নাই, মনমেন্দ্রিয় নাই, ইনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বর পদার্থ নহেন, ইহাঁর প্রাণ নাই, মুখ নাই, পরিমাণ নাই, ইহাঁর অন্তর নাই, বাহ্য নাই, ইনি কিছুই ভোজন করেন না, এবং ইনি কাহারও ভক্ষ্য নহেন। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ অনন্ত অন্তরীক্ষে আপন আপন মার্গে বিধৃত রহিয়াছে। ইহাঁর প্রশাসনে জীবগণ আপন আপন কর্ম্মফলবশতঃ স্বর্গ পৃথিবী প্রভৃতি নানা লোকে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক বিচরণ করে। ইহাঁরই শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, সম্বৎসর প্রভৃতি কালাবয়ব সকল নিত্য নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। ইহাঁরই শাসনে তুষারমণ্ডিত শ্বেতবর্ণ পর্ব্বত সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া নদী সকল পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রভৃতি নানা দিকে আপন আপন পথে গমন করে। যে নিয়মে এই জগৎ চলিবে

বলিয়া ইনি আদেশ করিয়াছেন সেই নিয়ম খণ্ডন বা ব্যতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। ইহাঁরই শাসনে দান প্রভৃতি শুভকর্ম্মকারী মনুষ্যগণ সমাজে প্রশংসিত এবং সমাদৃত হয়, অশুভকারী পাপিগণ নিন্দিত এবং ঘৃণিত হয় এবং সংসারে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। হে গার্গি! ইনি সেই অক্ষর যিনি সকলকে দেখেন কিন্তু যাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, যিনি সকলকে শুনেন কিন্তু যাহাঁকে কেহ শুনিতে পায় না, যিনি সকলকে মনে করেন কিন্তু যাঁহাকে কেহ মনে করিতে পারে না, যিনি সকলকে জানেন কিন্তু যাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ইনিই একমাত্র দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা। জগতে যত প্রাণী আছে ইনি সকলের আত্মা সুতরাং ইহাঁ ছাড়া দ্বিতীয় দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! এই অক্ষরেতেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে।

ব্রহ্মের অন্তর্যামিত্ব বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—

যিনি পৃথিবীদেবতায় বর্ত্তমান থাকিয়া পৃথিবীদেবতার অভ্যন্তরে আছেন, পৃথিবীদেবতা যাঁহাকে জানেন না, যিনি নিজে অশরীর হইয়াও পৃথিবীদেবতার শরীর দ্বারা কার্য্য করেন, যিনি পৃথিবীদেবতার অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীদেবতাকে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা এবং সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত অমর ও অন্তর্যামী। যিনি জলদেবতায় বর্ত্তমান থাকিয়া জলদেবতার অভ্যন্তরে আছেন, জলদেবতা যাঁহাকে জানেন না, যিনি নিজে অশরীর হইয়াও জলদেবতার শরীর দ্বারা কার্য্য করেন, যিনি জলদেবতার অভ্যন্তরে থাকিয়া জলদেবতাকে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা এবং সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত অমর ও অন্তর্যামী। ইত্যাদি বাক্য সকল ব্রহ্মের আধিদৈবিক অন্তর্যামিত্ব প্রকাশ করিতেছে। যিনি সকল জড় পদার্থে বর্ত্তমান থাকিয়া সকল জড় পদার্থের অভ্যন্তরে আছেন সকল জড়পদার্থ যাঁহাকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর হইয়াও সকল জড়পদার্থরূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন, যিনি সকল জড়পদার্থের অভ্যন্তরে থাকিয়া সকল জড়পদার্থকে স্ব স্ব ব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি

তোমার আমার এবং সর্ব্বভূতের আত্মা ও সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত অমর ও অন্তর্যামী। এই বাক্য ব্রহ্মের আধিভৌতিক অন্তর্যামিত্ব প্রকাশ করিতেছে। এক্ষণে ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক অন্তর্যামিত্বের বিষয় বলা হইতেছে। যিনি প্রাণে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রাণের অভ্যন্তরে আছেন, প্রাণ যাঁহাকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর হইলেও প্রাণরূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন এবং যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণকে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা এবং সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত অমর ও অন্তর্যামী। যিনি বাগিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া বাগিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে আছেন, বাগিন্দ্রিয় যাঁহাকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর হইলেও বাগিন্দ্রিয়রূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন এবং যিনি বাগিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া বাগিন্দ্রিয়কে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী এবং অমৃত। যিনি চক্ষুরিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে আছেন, চক্ষুরিন্দ্রিয় যাঁহাকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর হইলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন এবং যিনি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়কে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনিই তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে আছেন, শ্রবণেন্দ্রিয় যাঁহাকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর হইলেও শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন, যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি অন্তরিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া অন্তরিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে আছেন, অন্তরিন্দ্রিয় যাঁহাকে জানে না, যিনি স্বয়ং অশরীর হইলেও অন্তরিন্দ্রিয়রূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন এবং যিনি অন্তরিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তরিন্দ্রিয়কে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি ত্বগিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া ত্বগিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে আছেন, ত্বগিন্দ্রিয় যাঁহাকে জানে না, যিনি স্বয়ং অশরীর হইলেও

ত্বগিন্দ্রিয়রূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন এবং যিনি ত্বগিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্বগিন্দ্রিয়কে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি বিজ্ঞানে বর্ত্তমান থাকিয়া বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে আছেন, বিজ্ঞান যাঁহাকে জানে না, যিনি অশরীর হইলেও বিজ্ঞানরূপ শরীর দ্বারা কার্য্য করেন, যিনি বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে থাকিয়া বিজ্ঞানকে স্বব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত'। ইহাঁকে কেহ দেখিতে পায় না ইনি সকলকে দেখিতে পান, ইহাঁকে কেহ শুনিতে পায় না, ইনি সকলকে শুনিতে পান, ইহাঁকে কেহ মনে করিতে পারে না, ইনি সকলকে মনে করেন, ইহাঁর বিষয়ক জ্ঞান কাহারও নাই, সকলের বিষয়ক জ্ঞান ইহাঁর আছে। বাস্তবিক ইহাঁ ভিন্ন দ্বিতীয় দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। ইনিই তোমার আত্মা এবং ইনিই সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত সর্ব্ব-সাংসারিক-কর্ম্মফল-বিভাগ-কর্ত্তা অন্তর্যামী অমৃত আত্মা। ইহাঁ ভিন্ন আর সমস্তই নশ্বর।

প্রায় সকল শাস্ত্রেই তটস্থ লক্ষণ উপাসনার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং এ সংক্রান্ত অধিক শাস্ত্রবাক্য উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। আর দুই তিনটী দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করত সগুণ ও সাকার উপাসনার বিষয় আরম্ভ করা যাউক।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা। তুমি বৃদ্ধরূপে দণ্ডধারণ করিয়া বিচরণ কর। তুমি নিজে সর্ব্বোপাধিরহিত, নির্ম্মল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, একরস, অদ্বয়, নেতি নেতি শব্দবাচ্য আত্মা। কিন্তু উপাধি-যোগে তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট প্রভৃতি রূপে প্রতিভাত হও।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে—

হে দেবি! এই সমস্ত জগৎ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তুমিই ইহাকে সৃষ্টি কর, তুমিই ইহাকে পালন কর, এবং প্রলয়কালে তুমিই ইহাকে গ্রাস কর।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে—

এই মায়াময় জগতের কারণ যে সমস্ত তাহা তুমি, তোমাকে প্রণাম। তুমি চিন্ময়, আপন মায়াপ্রভাবে বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইতেছ, তোমাকে প্রণাম। তোমা ভিন্ন আর কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই, তুমি একমেবা-দ্বিতীয়ং, কেবল তোমার প্রসাদেই লোক মুক্তি পাইতে পারে, তোমাকে প্রণাম; তুমি সত্বরজস্তমোগুণাতীত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে প্রণাম।

এই মায়াময় সমস্ত জগতের আত্মা তুমি, তোমাকে প্রণাম। এই জগতের তুমিই প্রতিষ্ঠা ও পালয়িত্রী, তোমাকে প্রণাম। এই জগতের তুমিই আদি, তুমিই অন্ত, তোমাকে প্রণাম। এই জগতের তুমিই সৃষ্টি-কর্ত্রী, তুমিই সংহারকর্ত্রী, তোমাকে প্রণাম।

এই তটস্থ লক্ষণ ব্রহ্মের উপাসনাতেও সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত নিরাকার নির্ব্বিকার আত্মাকে মনে ধারণ করিতে হয়, সেই জন্য এই উপাসনাও অতি কঠিন। নিরাকার নির্গুণ আত্মাকে অনেকে ভাবিতে পারেন না আবার অনেকে এই নির্গুণ উপাসনা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেও ইহাতে আনন্দ অনুভব করেন না এবং নীরস বলিয়া এই উপাসনা পরিত্যাগ করেন। সর্ব্বদিগ্‌দর্শী শাস্ত্র তাঁহাদের জন্য সগুণ ও সাকার ঈশ্বরের উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সগুণ ও সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করত উক্ত ভক্তগণ পরম আনন্দ উপভোগানন্তর ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ-সন্নিবিষ্ট উপাসনার অধিকারী হইয়া ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করেন।

——:*:——

পঞ্চদশ প্রবন্ধ।

—:*:*:*:—

সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, ব্রহ্মের স্বরূপসন্নিবিষ্ট উপাসনায় সৃষ্ট পদার্থ এবং সৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়া উপাসকের মন হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং কেবল এক অদ্বয় নির্গুণ আত্মা ভিন্ন উপাসক অন্য কোন বিষয় উপলব্ধ করেন না। তটস্থ লক্ষণ উপাসনাতেও সেই নিরাকার নির্ব্বিকার সৎ-চিৎ-আনন্দ ব্রহ্ম উপাসিত হন; তবে প্রথম অর্থাৎ স্বরূপসন্নিবিষ্ট উপাসনায় সৃষ্ট পদার্থ এবং সৃষ্টি স্থিতি লয় ক্রিয়া উপাসকের মনে একেবারে স্থান পায় না; কিন্তু দ্বিতীয় অর্থাৎ তটস্থলক্ষণ উপাসনায় সৃষ্ট পদার্থ এবং সৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়া মায়াময়, অতএব বাস্তবিক সত্বাবিহীনরূপে পরিজ্ঞাত হয়, এবং ব্রহ্মকে ঈশ্বর ও অন্তর্যামী ভাবে উপাসনা করিবার অবলম্বনস্বরূপ হইয়া উপাসকের মনে অপ্রধানভাবে উপস্থিত থাকে, এবং ঈশ্বর ও অন্তর্যামীভাবে নির্গুণ ব্রহ্মই প্রধানরূপে উপাসকের মনে উপস্থিত থাকেন এবং উপাসিত হন। এই উভয় উপাসনাতেই অব্যক্ত অচিন্ত্য নির্গুণ ব্রহ্ম বা আত্মাই উপাস্য বলিয়া এই উভয় উপাসনাকেই আধ্যাত্মিক উপাসনা বলে।

কিন্তু অনেকে তটস্থ লক্ষণরূপ অবলম্বন দ্বারাও অব্যক্ত অচিন্ত্য নির্গুণ ব্রহ্মকে ঈশ্বর ও অন্তর্যামীভাবে আপন হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন না। আবার কোন কোন উপাসক ব্রহ্মের ঈশ্বর এবং অন্তর্যামী ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইলেও অব্যক্ত নির্গুণ উপাসনা নীরস বলিয়া পরিত্যাগ করেন, এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে নানাবিধ শক্তির বিকাশ, এবং ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়, দয়ার মাহাত্ম্য, প্রভৃতি সৎকর্ম্মের শুভফল, এবং অসৎ কর্ম্মের অশুভ ফল দেখিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মময়, দয়াময়, প্রেমময়

প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট মনে করিয়া, অথবা তিনিই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা ক্রিয়া বা গুণ ইহা মনে করিয়া তাহার উপাসনা করেন। যথা—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

মনুষ্য কোন না কোন বিষয় বা ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই ভাবিয়া থাকে। যাঁহাকে ইহ জীবনে মনুষ্য সর্ব্বদা ভাবনা করে মৃত্যুর পর মনুষ্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভাবনার তীব্রতার তারম্যানুসারে তাঁহার সালোক্য সারূপ্য বা সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য ব্রহ্মকে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ জানিয়া রাগ দ্বেষাদি দোষ রহিত হইয়া ব্রহ্মকে বক্ষ্যমানগুণসকল সংযুক্ত মনে করিয়া একমনে তাঁহার উপাসনা করিবে।

ব্রহ্ম মনোময় অর্থাৎ সমস্ত জীবের মনের সমষ্টি। যে প্রাণ শক্তি ইন্দ্রিয়ভাবে জ্ঞানোৎপাদক এবং জগৎ ভাবে জ্ঞানের বিষয় সেই প্রাণ ব্রহ্মের শরীর। জীবের চৈতন্য এবং জড় জগতের আলোক তাঁহার রূপ। ব্রহ্ম যথন যাহা সঙ্কল্প করেন তথনই তাহা সৃষ্ট হয়। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত সূক্ষ্ম এবং রূপাদিহীন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ তাঁহার সৃষ্ট। জগতে যে কিছু কামনা হইয়া থাকে সমস্তই তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত। জগতে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা উপলব্ধ করা যায় সেই সমস্ত পদার্থের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ তাঁহা কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত। তিনি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। যদিও তাঁহার কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই তথাপি তিনি সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং সমস্ত জ্ঞান উপলব্ধ করেন। তিনি আপ্তকাম এবং নিত্যতৃপ্ত সুতরাং কোন পদার্থে তাঁহার আদর নাই।

তিনিই আমার আত্মা, তিনি আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজমান আছেন, তিনি ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক (শস্যবিশেষ) অথবা শ্যামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। তবে কি তিনি পরিমাণে অণুর ন্যায় সূক্ষ্ম? না, তাহা নহে। আমার হৃদয়স্থ সেই আত্মা পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অন্তরীক্ষ হইতে বৃহৎ, স্বর্গ হইতে বৃহৎ এবং এই অনন্ত জগৎ হইতেও বৃহৎ। কিন্তু একই বস্তু অতি সূক্ষ্ম এবং অতি স্থূল হইতে পারে না। সুতরাং ইহা বুঝিতে

হইবে যে দয়া, প্রেম, সূক্ষ্মতা, স্থূলতা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি গুণ সকল বাস্তবিক মায়াময় মাত্র। নির্গুণ ব্রহ্মে এই সকল প্রাকৃতিক গুণ অধ্যস্ত হইয়া ব্রহ্মকে দয়াময়, প্রেমময়, সূক্ষ্ম, স্থূল প্রভৃতি সগুণ ভাবে ব্যক্ত করে এবং উপাসক এই সকল গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা ক্রমশঃ নির্গুণ আত্মাকে জানিতে পারেন।

অতএব সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, নিরিন্দ্রিয় অথচ সর্ব্বজ্ঞ, এবং নির্লিপ্ত ঈশ্বরই আমার আত্মা ; তিনি আমার হৃদয়ের মধ্যে আছেন, তিনি ব্রহ্ম, মৃত্যুর পর তাঁহাতেই আমি বিলীন হইব, ইহাই নিশ্চয় এ বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মধ্যান করিবে। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ব্রহ্মধ্যান করেন তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। মহর্ষি শাণ্ডিল্য ঐরূপে গুণ এবং ক্রিয়া সকলকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মধ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে লিখিত আছে—

হে দুর্গে! দুর্গতিগ্রস্তজন তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তাহার ভয়নাশ কর। ভয়াদিরহিত ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তাহাকে তত্ত্ববুদ্ধি প্রদান কর। হে দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-হারিণি দেবি! সকলের উপকার করিবার জন্য তোমার ন্যায় সর্ব্বদা আর্দ্রচিত্তা আর কে আছে?

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে অন্যত্র লিখিত আছে—

যে দেবী সকল প্রাণীতে মহামায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ও ভ্রান্তিরূপে বর্ত্তমানা আছেন সেই আদ্যাশক্তি জগন্মা-তাকে প্রণাম। ইন্দ্রিয়গণ ও মহাভূতগণের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া যিনি সর্ব্বদা সমস্ত পদার্থে বর্ত্তমানা রহিয়াছেন, সেই ব্যাপ্তি দেবীকে প্রণাম। যিনি এই কৃৎস্ন জগৎ ব্যাপিয়া চিৎরূপে বর্ত্তমানা রহিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম।

এই প্রকার উপাসনায় গুণযুক্ত বা সোপাধিকভাবে ব্রহ্ম উপাসিত হন বলিয়া ইহাকে সগুণোপাসনা বলে। এই সগুণ উপাসনাও দ্বিবিধ—১ম আধিদৈবিক ২য় আধিভৌতিক।

(১) আধিদৈবিক উপাসনায় ঈশ্বর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-বিহীন কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তৃত্ব, অন্তর্যামিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব চেতনা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি মানসিক গুণযুক্ত এবং দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন ভাবে উপাসিত হন।

(২) আধিভৌতিক উপাসনায় উপরিউক্ত গুণসমূহ ঈশ্বরে আরোপ করা ব্যতীত তাঁহাতে ভৌতিক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-গুণ ও অধ্যস্ত হয়। আধিভৌতিক উপাসকগণ বলেন যে ঈশ্বর চিন্ময় ও অরূপ হইলেও উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকেন।

স্মৃতিতে আছে—হে নারদ! তুমি আমার যে রূপ দেখিতেছ ইহা আমি মায়ার দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। এইরূপ সর্ব্বভূত গুণযুক্ত। আমার স্বরূপভাব তোমার ইন্দ্রিয়গম্য নহে।

বাস্তবিক ব্রহ্মের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উভয় ভাবই মায়াময় উপাধিযুক্ত। নিরস্ত সর্ব্ব বিশেষণ অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অরস অগন্ধ অবিদ্যারহিত অব্যয় চিন্ময় ভাবই ব্রহ্মের স্বরূপ ভাব।

——*:**:*——

ষোড়শ প্রবন্ধ।

ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বিরাট জীব ও দেব দেবীর বিষয়।

আবার অনেকে প্রকৃতি হইতে পৃথক ঈশ্বরকে অনুধাবন করিতে পারেন না। শাস্ত্র তাঁহাদের জন্য হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষের উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষ উভয়েই প্রকৃতিচক্রের অন্তর্ভূত। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে তাঁহারা আবির্ভূত হন এবং প্রলয়কালে অব্যক্তা প্রকৃতিতেই তাঁহারা বীজভাবে বিলীন থাকেন। বিজ্ঞান, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন জীব সমূহের সমষ্টিই হিরণ্যগর্ভ। এবং (১) বিজ্ঞান, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তি ও শরীরসম্পন্ন জীব সমূহের,(২) অচেতন শক্তি* সমূহের এবং (৩) রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ সমন্বিত সমস্ত পদার্থের সমষ্টিই বিরাট পুরুষ। নির্গুণ আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে মহাপ্রলয়ান্তে অব্যক্তা প্রকৃতি উৎপন্না হয়। জীবের বিজ্ঞান হইতে যেমন জীবের কল্পনা সকল প্রাদুর্ভূত হয় সেইরূপ অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট পুরুষ প্রাদুর্ভূত হন। সুতরাং জীবের কল্পনার সহিত জীবের বিজ্ঞানের যেরূপ সম্বন্ধ হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষের সহিত অব্যক্তা প্রকৃতির সেইরূপ সম্বন্ধ। খণ্ড প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ, সমস্ত শক্তি, সমস্ত মনোময় কোষ ও সমস্ত বিজ্ঞান অব্যক্তা প্রকৃতিভাবে বিলীন হয়, আবার খণ্ড প্রলয়ান্তে উক্ত অব্যক্তা প্রকৃতিই বিজ্ঞান সমষ্টি মনোময় কোষ সমষ্টি, শক্তিসমষ্টি ও সমস্ত জগৎরূপে ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হয়! সুতরাং পূর্ব্ব সৃষ্টির জ্ঞান হইতে হিরণ্যগর্ভের বিজ্ঞান হয় এবং সেই বিজ্ঞান হইতে পর সৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভের কল্পনা সকল প্রাদুর্ভূত হয়।

---

*হিরণ্যগর্ভোপাসকগণের মতে ইন্দ্রিয়শক্তি অচেতনশক্তি এবং জড় জগৎ হিরণ্যগর্ভের কল্পনা সম্ভূত। হিরণ্যগর্ভ আপন মনোমধ্যে তাহাদের কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে ভোগ করেন। সুতরাং হিরণ্যগর্ভের কল্পনা ভিন্ন তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বাস্তবিক হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটপুরুষ উভয়ই ঈশ্বরের কল্পনা।

যখন নির্গুণ আত্মা সর্ব্বপ্রকার উপাধিবর্জ্জিত স্বরূপ ভাবে দৃষ্ট হন তখন তিনি ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন। যখন আত্মা প্রকৃতির স্রষ্টা রূপে তটস্থ-ভাবে দৃষ্ট হন তখন তিনি ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। কিন্তু ঈশ্বর যে কেবল এক ভাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে? এক এক সৃষ্টির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক এক প্রকৃতি। ঈশ্বর কত প্রকার প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। আমরা যে সৃষ্টির অন্তর্গত সেই সৃষ্টির প্রকৃতি, হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাটপুরুষই আমাদের মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের গোচর। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে এককালে আমরা এক বিষয়ের অধিক চিন্তা করিতে পারি না তবে ঈশ্বর এককালে একের অধিক প্রকৃতি কি প্রকারে কল্পনা করেন! এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, জীবের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলিয়া ঈশ্বরের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ মনে করা যুক্তি সঙ্গত নহে। জীব এককালে একাধিক সঙ্কল্প করিতে পারেনা বটে কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর একইকালে অনায়াসে অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিতে পারেন। নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিতে যেমন জীবের কিছু মাত্র কষ্ট হয় না সেইরূপ অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিতে ঈশ্বরের কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। আবার উক্ত প্রকৃতি সকলকে ঈশ্বর এমন সুকৌশলে কল্পনা করেন যে, ইহারা আপনা আপনিই আপনাদের সমস্ত ব্যাপার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মতে সম্পন্ন করে। কিন্তু এই সমস্ত কল্পনা সেই অনন্ত চিন্ময় ঈশ্বরের চিচ্ছক্তির তুলনায় অতি সামান্য এবং নগণ্য। সুতরাং অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিয়াও ঈশ্বর কল্পনাশূন্য অবস্থায় থাকিতে পারেন। ঈশ্বরের এই শক্তিকে নির্দ্দেশ করা বা চিন্তা করা জীবের বুদ্ধির অগোচর। জীবকে এই অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বরিক শক্তি বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র সেই এক অদ্বিতীয় অবিভাজ্য ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বা আত্মাতে অংশ কল্পনা করেন এবং সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রভৃতি সমস্ত কল্পনাশূন্য অদ্বিতীয় অবিভাজ্য অচিন্ত্য আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সর্ব্ব প্রকার সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং মহাপ্রলয়কালে আত্মার ভাব আলোচনা করিলে এই ব্রহ্মের তত্ত্ব কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যখন আত্মাকে সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা

বলিয়া আলোচনা করা হয় তখন শাস্ত্র আত্মাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করেন। সুতরাং যদিও ঈশ্বর এবং আত্মা একই তথাপি তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শনহেতু শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে ঈশ্বর ব্রহ্ম এবং আত্মা শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কল্পিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন করিয়াই বলা হয় যে প্রত্যেক বিভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা এক একজন পৃথক্ ঈশ্বর। কিন্তু বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন পৃথক্ ঈশ্বর নাই। সেই আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র ঈশ্বর। তিনিই এককালে অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিয়া অসংখ্য ঈশ্বর এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা নির্গুণ আত্মাভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন।

ঈশ্বর ব্রহ্ম বা আত্মার অন্য এক প্রকার কল্পিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্র অনেক স্থলে অসংখ্য জীবাত্মাকে ঈশ্বর ব্রহ্ম বা আত্মার পৃথক্ পৃথক্ অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক জীবাত্মা অনেক নহে। সেই একই আত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জীবের বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয় শক্তি সকল এমন ভাবে কল্পনা করিয়াছেন যে জীব যতকাল অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে ততকাল সে মনে করে যে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আছে। অবিদ্যামুক্ত হইলেই জীব দেখিতে পায় যে জীবাত্মা সকল পৃথক্ নহে,ভ্রম বশতই একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা ভাবে দৃষ্ট হন। আবার ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের অন্য একপ্রকার কল্পিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্র সমস্ত বাহ্য ও অন্তর্জগতকে ব্রহ্ম ঈশ্বর বা আত্মার অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের কল্পনা ভিন্ন এই জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মায়াময় জগৎ মায়াধ্যক্ষ ব্রহ্ম বা আত্মা বা ঈশ্বরের অংশ হইতে পারে না। কেবল অবিদ্যাবশতই জগৎকে ঈশ্বরের অংশ বলা হয়। আবার এই প্রকারে ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের কল্পিত অংশাংশী ভাব লইয়াই উপাসনার সৌকর্য্যার্থে শাস্ত্র নানাপ্রকার দেব দেবী কল্পনা করত তাহাদিগকে ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বাস্তবিক ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের অংশ হইতে পারে না। সীমাবদ্ধ মন বুদ্ধি বিশিষ্ট জীব যাহাতে সেই অসীম ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের

দিকে কোন প্রকারে আপন মন ও বুদ্ধি ফিরাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই শাস্ত্র দেব দেবীর উপাসনা কল্পনা করিয়াছেন। শাস্ত্রের এই উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্যই বৃহদারণ্যকোপনিষদে শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের অবতারণা করা হইয়াছে। শকল গোত্রোদ্ভব বিদগ্ধ নামক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দেবতার সংখ্যা কত? যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বৈশ্বদেব প্রকরণের নিবিদ্ নামক দেবতা সংখ্যাবাচক বাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন, বৈশ্বদেব প্রকরণের নিবিদ্ বাক্যে দেবগণের সংখ্যা ৩৩০৬ তিন সহস্র তিন শত ছয় বলিয়া উক্ত আছে। তখন শাকল্য বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য বটে। কিন্তু দেবগণের সংখ্যা সঙ্কোচ করা যায় কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ, দেবগণের সংখ্যা একত্রিংশৎ বলা যায়। তখন শাকল্য বলিলেন, তোমার উত্তর ঠিক হইয়াছে, কিন্তু দেবতাদিগের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ করা যায় কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন হাঁ, দেবগণের সংখ্যা ছয় বলা যায়। শাকল্য বলিলেন, যথার্থ উত্তর হইয়াছে, কিন্তু দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কুচিত করা যায় কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ, দেবগণের সংখ্যা তিন বলা যায়। শাকল্য বলিলেন, তোমার বাক্য সত্য, কিন্তু দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ করা যায় কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ. দেবগণের সংখ্যা দুই বলা যায়। তখন শাকল্য বলিলেন, ইহা ঠিক কিন্তু দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ করা যায় কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ, দেবগণের সংখ্যা অধ্যর্দ্ধ অথবা দেড় বলা যায়। শাকল্য বলিলেন, যথার্থ উত্তর হইয়াছে, কিন্তু দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ করা যায় কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ দেবগণের সংখ্যা এক বলা যায়। শাকল্য তখন যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর অনুমোদন করিয়া বলিলেন, এক্ষণে ৩৩০৬ সংখ্যক দেবগণের বিশেষ বিবরণ বল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, দেবগণের সংখ্যা বাস্তবিক ৩৩ কিন্তু ইহাঁদের মহিমা বা ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিগণকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পনা করা হেতু দেবতার সংখ্যা ৩৩০৬ বলা যায়। শাকল্য বলিলেন, ভাল, ৩৩ দেবতার বিশেষ বিবরণ বল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এই একত্রিংশৎ

এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়স্ত্রিংশ। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বসু কাহাদিগকে বলে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, স্বর্গ, চন্দ্র, এবং নক্ষত্র সকল ইহাঁরাই বসু। ইহাঁরাই নানাভাবে পরিণত হইয়া জীবগণের কর্ম্মফল প্রদান করেন এবং ইহাঁরাই জীবগণের আবাস স্থল। সমস্ত জগৎকে ইহাঁরা বাসস্থান প্রদান করেন বলিয়া ইহাঁরা বসু নামে অভিহিত হইয়াছেন। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, রুদ্র কাহারা? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং মন ইহারা একাদশ রুদ্র। জীবের মৃত্যু হইলে এই একাদশ প্রাণ এক স্থূল শরীর হইতে অন্য স্থূল শরীরে গমন করে। তখন মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনেরা রোদন করে। যেহেতু এই একাদশ প্রাণ এইরূপে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে রোদন করায়,সেইজন্য ইহাদিগের নাম রুদ্র। অনন্তর শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আদিত্য কাহারা? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, এক বৎসরে যে দ্বাদশ মাস আছে তাহাদের নাম আদিত্য। ইহারা পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইয়া জীবগণের আয়ু আদান অর্থাৎ গ্রহণ করত যায় অর্থাৎ গত হয়। যেহেতু ইহারা আদান করিয়া যায় সেইজন্য ইহাদিগকে আদিত্য বলে। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্দ্র কে? প্রজাপতি কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, স্তনয়িত্নু ইন্দ্র। প্রজাপতি যজ্ঞ। শাকল্য বলিলেন, স্তনয়িত্নু কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,বজ্র বা বীর্য্য বা শক্তি (Force) বা বলকেই ইন্দ্র বলে, এবং পশু সকলই (Living bodies) যজ্ঞ। অনন্তর শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিয়াছিলে দেবতাদিগের সংখ্যা ছয় বলা যায়, সেই ছয় দেবতা কাহারা? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অগ্নি,পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য এবং স্বর্গ। ইতিপূর্ব্বে যত দেবতার কথা বলিয়াছি তাঁহারা সকলেই এই ছয় দেবতার অন্তর্গত। শাকল্য বলিলেন, তুমি বলিয়াছিলে দেবতাদিগের সংখ্যা তিন বলা যায়। এই তিন দেবতা কাহারা? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই তিনলোকই সেই তিন দেবতা। ইতিপূর্ব্বে যত দেবতার কথা বলিয়াছি তাঁহারা সকলেই এই তিন দেবতার অন্তর্গত। অনন্তর শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি

বলিয়াছিলে যে দেবতাদিগের সংখ্যা দুই বলা যায়। সেই দুই দেবতা কাহারা? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অন্ন বা প্রকৃতি এবং প্রাণ বা পুরুষ সেই দুই দেবতা। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দেবতা এই দুই দেবতার অন্তর্গত। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিয়াছিলে দেবতাদিগের সংখ্যা অধ্যর্দ্ধ বা দেড়। তিনি বা তাঁহারা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ঈশ্বর যখন সৃষ্টির পর অব্যক্তা প্রকৃতি হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটরূপে প্রকাশ পান, তখন তিনিই সেই অধ্যর্দ্ধ বা দেড় দেবতা। ইহাঁর সংখ্যা অধ্যর্দ্ধ বা দেড় বলিবার কারণ এই যে, ইনি মহাপ্রলয়কালে ভেদরহিত ব্রহ্মভাবে থাকেন এবং মহাপ্রলয়ান্তে ইনি অব্যক্তা প্রকৃতি হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট প্রভৃতি নানা মায়াময় ভাবে বিবর্ত্তিত হন। তখন শাকল্য বলিলেন, ইহাঁকে অধ্যর্দ্ধ বা দেড় বলিবার আর কোন কারণ আছে কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ, অন্য কারণও আছে। যেহেতু এই সমস্ত বাহ্য ও অন্তর্জগৎ ইহাঁতে ঋধি (প্রতিষ্ঠা) প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্যও ইহাঁকে অধ্যর্দ্ধ বলা যায়। শাকল্য বলিলেন, যখন দেবতার সংখ্যা এক বলা যায় তখন কোন দেবকে বুঝায়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তিনি প্রাণ, অর্থাৎ মূল কারণ বা আদ্যাশক্তি; তিনিই ব্রহ্ম, যাহারা তাঁহাকে অপরোক্ষভাবে দেখিতে সমর্থ নহে তাহারা তাঁহাকে ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর এবং বাক্য দ্বারা অনির্দ্দেশ্য মনে করত তাঁহাকে ত্যদ্ অর্থাৎ "সেই" এই পরোক্ষ নামে অভিহিত করেন।

—•○•○•—

সপ্তদশ প্রবন্ধ।

—:*:*:*:—

সম্পদুপাসনা, প্রতীক উপাসনা ও সম্বর্গ উপাসনা এবং সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক উপাসনা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে যে ঈশ্বরের উপাসনার সৌকর্য্যার্থ ভেদরহিত নিরংশ ঈশ্বরে অংশ আরোপণ করিয়া দেবদেবীর কল্পনা করা হয়। অংশ কল্পনা করিতে হইলেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে এবং অংশ ও পূর্ণের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করিতে হয়। কোন এক বস্তু অন্য এক বস্তু হইতে পৃথক্ বলিলে বুঝা যায় যে, প্রথম বস্তুর এমন এক গুণ আছে যাহা দ্বিতীয় বস্তুর নাই। সুতরাং অংশ কল্পনা করিতে গেলেই গুণের কল্পনা করিতে হয়। নিগুর্ণ পদার্থের অংশ হইতে পারে না। সেই জন্য দেব দেবীর উপাসনামাত্রই সগুণ উপাসনা এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ অথবা বিরাট উপাসনার অন্তর্ভূত। যখন দেবদেবীকে সর্ব্বপ্রকার গুণরহিত মনে করা যায়, তখন আর দেবদেবীর পরস্পরের মধ্যে এবং ব্রহ্ম হইতে কোন পার্থক্য থাকে না। সুতরাং সগুণ দেবদেবীর উপাসনা করিতে করিতে যখন দেবদেবীর গুণসকল উপাসকের মন হইতে অপসারিত হয় তখন কেবলমাত্র দেবদেবীর নিগুর্ণ আত্মা উপাসকের মনে বর্ত্তমান থাকেন। কিন্তু নিগুর্ণ আত্মার অংশ বা ভেদ নাই। সুতরাং যখন দেব দেবীর উপাসক দেবদেবীর নিগুর্ণ আত্মা মাত্র উপাসনা করিতে সক্ষম হন তখন আর তিনি দেবদেবীর উপাসক থাকেন না। তখন তিনি সেই নিগুর্ণ ব্রহ্মেরই স্বরূপ সন্নিবিষ্ট আধ্যাত্মিক উপাসনা করিতে থাকেন। কিন্তু এই স্বরূপ সন্নিবিষ্ট আধ্যাত্মিক উপাসনা সহজে আয়ত্ত হয় না। ইহা আয়ত্ত করা অতি কঠিন ব্যাপার। এই উপাসনার সাধনের জন্যই অধিকারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত দেবদেবীর উপাসনা শাস্ত্রে বিহিত আছে। দেবদেবীমাত্রই জীবগণের ন্যায় জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন,

চেতনা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি মানসিক গুণযুক্ত, এবং কতক পরিমাণে সৃষ্টি স্থিতি সংহারকর্তৃত্ব, অন্তর্যামিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, প্রভৃতি ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন। এই সকল ঐশ্বরিক গুণের তারতম্য অনুসারে দেবদেবীগণের পদের তারতম্য কল্পিত হয়। দেবদেবী মাত্রেরই এই সকল মানসিক এবং ঐশ্বরিকগুণ থাকে বলিয়া ঐ গুণগুলিকে দৈবিকগুণ বলা যায়। আবার এই সকল গুণ ব্যতীত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি ভৌতিক গুণও কোন কোন দেবদেবীতে আরোপিত হয়। সুতরাং কতকগুলি দেবদেবী কেবলমাত্র দৈবিক গুণযুক্ত এবং কতকগুলি দেবদেবী দৈবিক ও ভৌতিক এই উভয় গুণযুক্ত।

অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপর ভক্তি হয়। যে দেবতার উপর যে সাধকের সম্যক্ ভক্তি হয় সেই দেবতা সেই সাধকের ইষ্টদেব। এ বিষয়ে একজন ইদানীন্তন কালের ভক্ত বলিয়াছেন—

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান মা ভোজের বাজী।
যে জন তোমায় যে ডাকে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী॥
মগে বলে ফরা তারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা, (মা)
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী॥
শাক্তে বলে তুমি শক্তি শিব তুমি শৈবের উক্তি, (মা)
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকাজী॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ কয় (মা) তুমি ধনেশ,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদোর বলে নায়ের মাঝি।
শ্রীরাম দুলাল বলে, বাজী নয় এ জেনো ফলে,
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজী॥

সাধকের অধিকার ভেদে ইষ্ট দেবের উপাসনা প্রধানতঃ তিন প্রকার। (১) সম্পদুপাসনা, (২) প্রতীক উপাসনা এবং (৩) সম্বর্গ উপাসনা। এই তিন প্রকার উপাসনার মিশ্রণে উপাসনার আরও নানা প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। সম্পদুপাসনায় ইষ্টদেব অবলম্বন স্বরূপ থাকেন এবং ঈশ্বরই প্রধান ভাবে থাকেন। সুতরাং সাধনা ও শাস্ত্রালোচনা এবং উপাসনা দ্বারা

সাধকের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাঁহার ইষ্টদেবের জ্ঞানও ততই উন্নতি লাভ করিতে থাকে। যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর কেবলমাত্র একজন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন জীব তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবকেও একজন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন জীব বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর বিরাটপুরুষ তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবতাকে বিরাটপুরুষ বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবতাকেও হিরণ্যগর্ভ বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর প্রকৃতির সঙ্কল্পয়িতা তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবতাকেও প্রকৃতির সঙ্কল্পয়িতা বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর ব্রহ্ম তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবতাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দেখেন।

প্রতীক উপাসনায় নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের পরোক্ষজ্ঞান অবলম্বন স্বরূপ থাকে এবং ইষ্টদেবতাই প্রধান ভাবে উপাসকের ধ্যানপথে থাকেন। উপাসকের বুদ্ধিতে যে পরিমাণে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান থাকে উপাসক সে সমস্তই আপন ইষ্টদেবে আরোপ করেন এবং ইষ্টদেবকে আরও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। এই উপাসনা দ্বারা উপাসক অপেক্ষাকৃত সহজে জগৎ হইতে আপন মন আকর্ষণ পূর্ব্বক ইষ্টদেবে অর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্র যে উদ্দেশ্যে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছেন কোন কোন প্রতীক উপাসক হয়ত সে উদ্দেশ্য জানেন না অথবা সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান। নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের উপাসনার সৌকর্য্যার্থেই দেবদেবীর কল্পনা। প্রতীক উপাসনার উদ্দেশ্য এই যে,উপাসক এই উপাসনা দ্বারা জগৎ হইতে আপন মনকে প্রত্যাহার পূর্ব্বক মনকে ইষ্টদেবে সুস্থির করিতে শিখিবেন এবং এইরূপে মন আয়ত্ত হইলে মনকে নির্গুণ ব্রহ্মে স্থাপিত করিবেন। কিন্তু কখন কখন প্রতীক উপাসকগণ এত গোঁড়া হইয়া উঠেন যে তাঁহারা আপন ইষ্টদেবকে ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। বাস্তবিক ব্রহ্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে আর কেহ বা কিছু শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ইষ্টদেব শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না। যে উপাসক মনে করেন যে তাঁহার

ইষ্টদেব ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ তিনি অজ্ঞানবশতই এইরূপ কল্পনা করেন। যদি শাস্ত্রালোচনা এবং উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন তাহা হইলে তিনি ঐ প্রকার ভ্রমপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করেন না।

সম্বর্গ উপাসনায় দেবতা বা ঈশ্বর কেহই অবলম্বন স্বরূপ থাকেন না। কোনও জীব বা দেবতার যে অসাধারণ লক্ষণ থাকে সম্বর্গ উপাসক সেই অসাধারণ লক্ষণকেই অবলম্বন করেন এবং ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাটপুরুষ, আপন ইষ্টদেব বা অন্যদেব বা জীবে তৎসদৃশ লক্ষণ দেখিয়া উভয়কে অভিন্ন মনে করেন। অগ্নিতে সমস্ত দ্রব্য দগ্ধ হয়, মহাপ্রলয়কালে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সম্বর্গ উপাসক অগ্নিদেব এবং ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করেন।

ঈশ্বরের সঙ্কল্পরূপ দেবতা বা তপ ভেদশূন্য ব্রহ্মে নানাভাবে বিভক্ত জগৎ দর্শন করান। বায়ু ও নিষ্কম্প জগতে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন দেখান। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সম্বর্গ উপাসক বায়ুদেব ও ঈশ্বরের সঙ্কল্প বা তপকে অভিন্ন মনে করেন।

সূর্য্য সর্ব্বদা উজ্জ্বল এবং একভাবে থাকেন, পরমাত্মাও সর্ব্বদা চিন্ময় এবং একভাবে থাকেন। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সম্বর্গ উপাসক সূর্য্যদেব ও পরমাত্মাকে অভিন্ন মনে করেন।

(১) অদৃশ্য ও অব্যক্ত বাষ্প (২) আর্দ্র-পদার্থে ঈষদ্ব্যক্ত রস (৩) বিস্তীর্ণ সমুদ্র ও (৪) সীমাবদ্ধ কূপ, এই চারি ভাবে অপ্ বা জল দৃষ্ট হন। সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা অপোদেব * (১) নির্গুণ অচিন্ত্য ব্রহ্ম (২) মায়াময়ী প্রকৃতি উপাধিধারী ঈশ্বর, (৩) সমস্ত দৈবিক গুণময় হিরণ্যগর্ভ, এবং (৪) ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃশ্য বিরাটভাবে দৃষ্ট হন। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সম্বর্গ উপাসক মরুভূমির জল ও নির্গুণ ব্রহ্মকে, আর্দ্রস্থানের

---

* প্রাপ্ত্যর্থক ও ব্যাপ্ত্যর্থক আপধাতু হইতে উৎপন্ন অপ্ শব্দ অনেক স্থলে নানারূপে ভাসমান সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়।

রস ও মায়াময়ী প্রকৃতি উপাধিধারী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকে, সমুদ্র ও হিরণ্যগর্ভকে, এবং কূপোদক ও বিরাট পুরুষকে অভিন্ন মনে করেন।

প্রকৃতি যখন অব্যক্ত ভাবে মন বুদ্ধি প্রভৃতির বীজস্বরূপ থাকে তখন তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না। রাত্রিকালে আলোক থাকে না। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সম্বর্গ উপাসক রাত্রি এবং অব্যক্তা প্রকৃতিকে অভিন্ন মনে করেন।

অন্ধকারে আলোক থাকে না, অজ্ঞানে জ্ঞান থাকে না। এই সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সম্বর্গোপাসক অন্ধকার ও কৃষ্ণবর্ণকে অজ্ঞান হইতে এবং আলোক ও শুক্লবর্ণকে জ্ঞান হইতে অভিন্ন মনে করেন।

পিতা মাতা আপন সন্তানের মঙ্গল সাধন করেন। ঈশ্বর বা জগদ্ধাত্রী দেবী জগতের মঙ্গল সাধন করেন। এই সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সম্বর্গোপাসক জগদ্ধাত্রী দেবী বা ঈশ্বর ও পিতামাতাকে অভিন্ন মনে করেন।

সূর্য্যদ্বারা উদ্ভাসিত চন্দ্র জগৎ প্রকাশ করেন, আত্মা দ্বারা উদ্ভাসিত মন জীবকে প্রকাশ করেন; এই সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া সম্বর্গোপাসক মন এবং চন্দ্রকে অভিন্ন মনে করেন।

গুরুদেব অনুগ্রহ দ্বারা অজ্ঞান দূর করেন, ঈশ্বরও দয়া দ্বারা অজ্ঞান নাশ করেন; এই সাদৃশ্য অবলম্বন করত সম্বর্গোপাসক গুরুদেব এবং ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করেন।

এইরূপ লক্ষণ সমূহের সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়াই সাধক ঈশ্বরকে বলিয়া থাকেন, তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই ভ্রাতা, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধন, এবং তুমিই সর্ব্ব। *

---

* সম্বর্গ উপাসনা মূলে অনেক সময় শাস্ত্র সকলে বাক্য সমূহ আপন প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ঐতরেয়োপনিষৎ বলিয়াছেন—দেবগণ অপ্রত্যক্ষ নাম গ্রহণ-প্রিয় বলিয়া বোধ হন।

সম্বর্গ উপাসনা তত্ত্ব মনে রাখিয়া সামবেদোক্ত সন্ধ্যোপাসনার অর্থ করিলেই দেখা যায় যে মায়াময় অনাত্ম পদার্থ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া নির্গুণ আত্মায় সংস্থাপন

আবার কামনার অভাব এবং কামনার ভেদ হেতু উপাসকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) কোনরূপ কামনা না রাখিয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রবিধি প্রতিপালনার্থ যে উপাসক উপাসনা করেন তিনি সাত্ত্বিক উপাসক।

করানই উক্ত উপাসনার তাৎপর্য্য এবং আত্মা হইতে কি প্রকারে এই জগৎ অন্য কোন উপাদান ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে তাহার বিবরণ সেই উদ্দেশ্যেই উক্ত উপাসনায় একাধিকবার সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা—

আচমন। হে সর্ব্বব্যাপিন্ আত্মন্ জ্ঞানীরা সর্ব্বদা আপনার স্বরূপ সন্নিবিষ্ট নির্গুণভাব সন্দর্শন করিয়া থাকেন। আপনার ঐ নির্গুণভাব আপনার চিন্ময় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত।

সন্ধ্যাবন্দনা। নির্গুণ ব্রহ্ম আমাদিগের মঙ্গল করুন। মায়াময়ী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন। হিরণ্যগর্ভ আমাদের মঙ্গল করুন। বিরাটপুরুষ আমাদের মঙ্গল করুন। সূর্য্যোত্তাপে শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত পথিক বৃক্ষতল আশ্রয় করিলে যেমন কষ্ট হইতে মুক্ত হয়, মলযুক্ত ব্যক্তি স্নান দ্বারা যেমন নির্ম্মল হয়, এবং মন্ত্র দ্বারা যেমন যজ্ঞার্থ ঘৃতে নূতন শক্তি সঞ্চার হয়, হে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মা আপনি সেই-রূপে আমার আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ দূর করুন, কাম ক্রোধ লোভাদি সমস্ত পাপ হইতে আমাকে মুক্ত করুন এবং আপনার স্বরূপ তত্ত্ব অপরোক্ষভাবে জানিবার শক্তি আমাকে প্রদান করুন। হে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মা আপনি সকল সুখের অধিষ্ঠান, আপনার তত্ত্ব জানিয়া যাহাতে আমরা অমর হইতে পারি আপনি আমা-দের সেই প্রকার শক্তি দান করুন। মাতা যেমন সন্তানের শুভ কামনা করেন আপনি সেইরূপ আমাদিগকে আপনার পরম আনন্দের ভাগী করুন। যে অদ্বৈতভাব আবরণ পূর্ব্বক আপনি মায়াদ্বারা এই সমস্ত জগৎ এবং আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা যেন আপনার প্রসাদে মায়া কাটাইয়া আপনার সেই অদ্বৈত ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হই। আপনার নিত্য নির্ব্বিকার চিন্ময় ভাবই আপনার স্বরূপ ভাব। আপনি তপ বা সঙ্কল্প দ্বারাই সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার তপ হইতে জ্ঞানবিহীনা অব্যক্তা প্রকৃতি উৎপন্না হন। আপনার তপ হইতে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হন। এবং হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টির পর আপনার তপ হইতেই বিরাটপুরুষ উৎপন্ন হন। খণ্ড প্রলয়কালে পূর্ব্ব সৃষ্টির অন্ন প্রাণ মন ও বিজ্ঞান সমষ্টি বীজ স্বরূপে অব্যক্তা প্রকৃতিভাবে ঈশ্বরে বিলীন থাকে। খণ্ড প্রলয়াবসানে সেই অব্যক্তা প্রকৃতি স্বরূপ বীজকে ঈশ্বর পুনরায় ব্যক্ত প্রকৃতিভাবে বিকশিত করেন। সুতরাং পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে প্রকার সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি ও স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং অন্তরীক্ষ ছিল বর্ত্তমান সৃষ্টিতেও সেই প্রকারই সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি ও স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং অন্তরীক্ষ সৃষ্ট হইয়াছে।

(২) উপাসনা করিলে অন্যে আমাকে ধার্ম্মিক বলিবে অথবা উপাসনা করিলে ঈশ্বর আমাকে বা অন্য কাহাকে আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ প্রদান করিবেন অথবা আমাকে বা অন্য কাহাকে কোন বিপদ হইতে রক্ষা

সপ্ত ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এবং গায়ত্রী শিরঃ—

ভূঃ—পৃথিবী, ভুবঃ—অন্তরীক্ষ, স্বঃ—স্বর্গ, মহঃ—হিরণ্যগর্ভ বা সমস্ত জীবগণের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার চিত্ত এবং বিজ্ঞানের সমষ্টি, জনঃ—অব্যক্তা প্রকৃতি, তপঃ—সৃষ্টি বিষয়ক ঈশ্বরের সঙ্কল্প এবং সত্যঃ—ঈশ্বর, এই সপ্তলোক যে আত্মা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে সেই আত্মা চিন্ময়। তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব বা নিগুর্ণ ভাব আমরা ধ্যান করি। কিন্তু ঐ তত্ত্ব ধ্যান করিবার শক্তি আমাদের নাই অতএব সেই আত্মাই আমাদের বুদ্ধিকে তাঁহার স্বরূপ ধ্যান করিতে নিয়োগ করুন। সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মাই চিৎ আনন্দ সৎ ব্রহ্ম, তিনিই হিরণ্যগর্ভ, এবং তিনিই বিরাটপুরুষ।

আচমন। (সায়ং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন) দিবাভাগে, রাত্রিতে, সমস্ত অহোরাত্রে সাধক যে কিছু পাপ করিয়া থাকে সন্ধ্যা বন্দনা কালে তাহার আলোচনা করত পুনরায় যাহাতে আর সেরূপ পাপ না করেন সাধক তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিবেন।

সূর্য্যোপস্থান। নিগুর্ণ আত্মাই জগৎ ও জগৎ প্রকাশক ভাবে দৃষ্ট হইতেছেন তিনিই বৈশ্রবণ তাঁহাতে সকল পদার্থ লয় পায় এবং তিনিই উপজ তাঁহা হইতে সকল পদার্থের জন্ম হয়।

প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ন্তন গায়ত্রি। সাধনার প্রথমাবস্থায় ঋগাদি মন্ত্র দ্বারা হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাটপুরুষের গুণগান করিবে, সাধনার মধ্যাবস্থায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা পালন কর্ত্তা বিষ্ণুর বা ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করিবে এবং সাধনার শেষাবস্থায় সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল এবং সমাহিত হইয়া অবিদ্যামোচনকারী জ্ঞানময় রুদ্রদেবের বা উপাধিশূন্য নিগুর্ণ আত্মার ধ্যান করিবে। প্রাতঃকালে ঈশ্বরের গুণ গান করিবে, মধ্যাহ্নে তাঁহার প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিবে; সায়াহ্নে তাঁহাকে ধ্যান করিবে। বাল্যকালে তাঁহার সৃষ্ট জগতের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিবে, যৌবনাবস্থায় তাঁহার প্রীত্যর্থে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে; বৃদ্ধাবস্থায় জগৎকে অসার জানিয়া শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল ও সমাহিত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিবে।

আত্মরক্ষা। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে সোমকে অর্থাৎ চন্দ্রকে অর্থাৎ আমার মনকে আহুতি দিতেছি। আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক সমূহ দগ্ধ করত ঈশ্বর ভক্তগণকে আত্মজ্ঞান প্রদান

করিবেন অথবা আমার বা অন্য কাহারও অজ্ঞান নাশ করিবেন এই প্রকার কামনা করিয়া যিনি উপাসনা করেন তিনি রাজসিক উপাসক। (৩) নৃত্যগীত ইত্যাদির উপলক্ষে যিনি উপাসনা করেন তিনি তামসিক উপাসক।

কামনা থাকিলেই পাইতে ইচ্ছা হয়। শাস্ত্রোপদিষ্ট ফল পাইতে বিলম্ব হইলেই শাস্ত্রোপদেশের উপর সন্দেহ এবং বিরক্তি হয়; এবং শাস্ত্রোপদেশের উপর সন্দেহ ও বিরক্তি হইলেই তপস্যা ভ্রষ্ট হয়। সুতরাং উপাসনা নিষ্কাম উপাসনায় পরিণত না হইলে তপস্যার সিদ্ধি হয় না।

——*:**:*——

করেন। এবং যে ভক্তগণ অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন ঈশ্বর তাঁহাদিগকে, নৌকা যেমন আরোহীকে সিন্ধুর অপর পারে লইয়া যায় সেইরূপে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।

রুদ্রোপস্থান। চিন্ময় নিত্য সত্য পরব্রহ্মই অব্যক্তা প্রকৃতি ও বিজ্ঞানসমষ্টি ও মনোময় কোষ সমষ্টিকে উপাধিরূপে গ্রহণ করত সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরভাবে প্রকটিত হন। বাস্তবিক তিনি সর্ব্ব প্রকার লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নের অতীত নিগু́ণ ব্রহ্ম। তাঁহার কোন প্রকার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তি সম্পন্ন বিরূপাক্ষ। তাঁহার কোন প্রকার রূপ নাই। এই বিশ্ব জগৎকেই তাঁহার রূপ মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি।

অষ্টাদশ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

সাকার উপাসনা।

শাস্ত্রোপদিষ্ট দেবদেবীর মূর্ত্তিসকল বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন না কোন ভাবে ঈশ্বরকে উপাসকের মনে পরিস্ফুট করাই শাস্ত্রে মূর্ত্তিকল্পনার উদ্দেশ্য। জীবগণের মানসিক ক্ষমতা এক প্রকার নহে। একজন উচ্চাধিকারী সাধক ঈশ্বরবিষয়ক কোন একটী তথ্য হয়ত সহজেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু অপর সকলে সেই তথ্য সহজে বুঝিতে পারেন না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জীবের মানসিক উন্নতির পরিমাণের উপযোগী করিয়া শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছেন। সম্পদুপাসক কোন এক ঈশসৃষ্ট বা শাস্ত্রকল্পিত মূর্ত্তিকে অবলম্বন স্বরূপ রাখিয়া ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট পুরুষকে ধ্যান করেন। সম্পদুপাসনায় উপাসকের মনে অবলম্বনটী অপ্রধানভাবে থাকে এবং ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট পুরুষই প্রধানভাবে থাকেন। এই উপাসনায় শালগ্রামশিলায় বিষ্ণুবুদ্ধি; দশভুজা-অস্ত্রধারিণী-অসুরনাশিনী-মা দুর্গার প্রতিমায় বিশ্বব্যাপিনী-সর্ব্বশক্তিশালিনী-অবিদ্যানাশকারিণী-দয়াময়ী-দুর্গতি-হারিণী-জগন্মাতাবুদ্ধি; শ্বেত-ত্রিশূলডমরুকর-অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত-ত্রিনেত্র-বৃষভাসনস্থ-শম্ভুমূর্ত্তিতে, শুদ্ধ সত্ত্বময়-অজ্ঞাননাশক-সৃষ্টিকর্ত্তা-জ্ঞাননেত্র-বিজ্ঞান, চেতন এবং অচেতনভাবে প্রকাশিত,তপ সত্য দয়া এবং শৌচসম্পন্ন ধার্ম্মিকগণের মনে বিরাজিত, মঙ্গলময় ঈশ্বরের বুদ্ধি হয়। এই উপাসক গোপালতাপনী উপনিষদুক্ত * চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-ধনু-পদ্ম-গদা-কেয়ূরাদি বিভূষিত নারায়ণ-মূর্ত্তি দেখিলে মনে করেন—

* অনেক পণ্ডিতেরা গোপালতাপনী উপনিষদ্‌কে আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত মনে করেন এবং তজ্জন্য উক্ত উপনিষদ্‌কে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করেন না।

সত্ত্ব রজ তম অহঙ্কার ইহারাই নারায়ণের চারি হস্ত। রজোরূপ হস্তে পঞ্চভূতাত্মক শঙ্খ * রহিয়াছে। অত্যন্ত বালকের মনের ন্যায় বিশুদ্ধ মনরূপ চক্র সত্ত্বাখ্য হস্তে রহিয়াছে। জগতের মূল কারণ মায়ারূপ শার্ঙ্গধনু এবং বিশ্বরূপ পদ্ম তমোগুণরূপী হস্তে রহিয়াছে। বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে তিনি ভক্তগণের মনে অহং ব্রহ্ম অস্মি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ যে অদ্বৈতজ্ঞান দেন সেই বিদ্যারূপ গদা অহঙ্কারাখ্য করে বিদ্যমান রহিয়াছে। চিৎশক্তি হইতে উৎপন্না পৃথিবীতে ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থরূপী দিব্য কেয়ূর সমূহ দ্বারা অহঙ্কারাখ্য হস্ত সর্ব্বদা বিভূষিত রহিয়াছে।

এখানে একটী কথা বলা প্রয়োজন। দেবমূর্ত্তির ব্যাখ্যা এখানে যে ভাবে করা হইয়াছে উহাই যে একমাত্র ব্যাখ্যা তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের হৃদয়ে একই দেবমূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসিত হন। অতএব বুঝিয়া লইতে হইবে যে, উপাসকগণ আপন হৃদয়ের ভাবের সহিত সুসঙ্গত করিয়া অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করিয়া লইতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত হরিমূর্ত্তির অর্থ এবং আচার প্রবন্ধোক্ত বিষ্ণু-মূর্ত্তির অর্থ এখানে দেওয়া গেল।

ভাগবতকার বলিয়াছেন—

চিন্ময় আত্মা ভগবানের বক্ষস্থলে উজ্জ্বল কৌস্তুভমণিরূপে বর্ত্তমান। সেই সচ্চিদানন্দ আত্মার জগৎসৃষ্টিসঙ্কল্প ভগবানের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস নামক রোমাবর্ত্ত ভাবে বিরাজিত। সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী ব্যক্তা প্রকৃতি ভগবানের গলদেশে নানা পংক্তি (হালি বা নর) বিশিষ্ট বনমালারূপে অবস্থিত। ছন্দ সকল ভগবানের পীতবাস। অকার উকার মকারময় ত্রিমাত্র প্রণব ভগবানের ত্রিসূত্রী ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য এবং যোগ ভগবানের মকর এবং কুণ্ডলনামক কর্ণাভরণদ্বয়। সর্ব্বলোকের অভয়প্রদ ব্রহ্মপদই ভগবানের মৌলীরূপ শিরোভূষণ। অব্যাকৃতা প্রকৃতি ভগবানের অনন্ত নামক আসন। ভগবানের আসনে যে পদ্ম আছে তাহাই ধর্ম্মজ্ঞানাদিযুক্ত

---

* কেহ কেহ শঙ্খ অর্থে অনন্ত বিভূতি, চক্র অর্থে অনন্ত কাল, গদা অর্থে শ্রেয়ঃ, পদ্ম অর্থে প্রেয়, এবং শ্যামবর্ণের অর্থ অবিদ্যাময়ী প্রকৃতিরূপ উপাধি বুঝিয়া থাকেন।

সত্বগুণ। তেজ মানসিক বল ও শারীরিক বলযুক্ত মুখ্য প্রাণই ভগবানের করস্থিত গদা। জলদেব শঙ্খরূপে ও অগ্নিদেব সুদর্শনরূপে ভগবানের হস্তে বিরাজিত রহিয়াছেন। আকাশদেব ভগবানের নীলবর্ণ শরীররূপে, বর্ত্তমান। ভগবান তমোগুণকে অসিচর্ম্মরূপে, কালকে শার্ঙ্গধনুরূপে, কর্ম্মময় রজোগুণকে তূণীররূপে এবং ইন্দ্রিয় সকলকে শররূপে ধারণ করিয়া আছেন। ক্রিয়াশক্তিময় মন ইহাঁর রথ। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্র ইহাঁর অভিব্যক্ত ভাব। মুদ্রা সকল ইহাঁর বরদ অভয়দ প্রভৃতি ভাব সকল ব্যক্ত করিতেছে। ইহাঁর পূজাগৃহই দেবগণের যজ্ঞভূমি। ইহাঁর মন্ত্র দীক্ষাই তত্ত্ব জ্ঞানলাভের অধিকার প্রাপ্তি। এবং একাগ্রমনে ইহাঁর পরিচর্য্যাই পাপ ধ্বংসকারক তপস্যা। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, এই ষড়্বিধ ভগশব্দবাচ্য গুণ ভগবানের করে পদ্মরূপে রহিয়াছে। ধর্ম্ম এবং উপমাশূন্যত্ব ইহাঁর চামর এবং ব্যজন। হে দ্বিজগণ! ভয়শূন্য আত্মার কৈবল্য পদই ইহাঁর ভয়হারী বৈকুণ্ঠধাম। ত্রৈগুণ্য বিষয় ঋক্, যজু, সামরূপ বেদ সকল ইহাঁর বাহন গরুড় এবং ইহাঁর পুরুষমূর্ত্তিই যজ্ঞ। ব্রহ্মের অক্ষয় অব্যয় ঐশ্বরিক শক্তিই ভগবানের লক্ষ্মী। আগমশাস্ত্র সকল ভগবানের পারিষদ শ্রেষ্ঠ বিষক্সেন। অণুত্ব, লঘুত্ব, ব্যাপ্তি, স্বচ্ছন্দাবস্থান, মহত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, প্রভুত্ব, এবং সর্ব্বকামপ্রাপ্তি এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যই ভগবানের নন্দাদি অষ্ট দ্বারপাল। ব্রহ্ম ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটপুরুষ এই চারিভাবে অধিকারভেদে সাধকগণ কর্ত্তৃক আত্মা দৃষ্ট হন। সেই চারি ভাবই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ রূপে ভগবানের চতুর্ব্যূহ। জাগ্রদবস্থায় জীব আত্মাকে যে বিশ্বরূপ বা বিরাট ভাবে দর্শন করে, সেই বিরাটভাবই অনিরুদ্ধ। স্বপ্নকালে বাহ্যজগৎ ইন্দ্রিয়পথে না থাকিলেও জীব যেমন বিজ্ঞান মন এবং ইন্দ্রিয়শক্তি সমন্বিত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট বিশ্ব সৃষ্টি করে সেইরূপে যে হিরণ্যগর্ভ, বিজ্ঞান মন এবং ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা আপনার মধ্যে বিরাটরূপ কল্পনা করেন তিনিই প্রদ্যুম্ন। যেমন সুষুপ্তিকালে জীবের কল্পনা অহঙ্কার ও বুদ্ধি জীবের বিজ্ঞানে বিলীন হয় এবং সুষুপ্তির অবসানে পুনরায় বিজ্ঞান হইতে কল্পনা অহঙ্কার ও বুদ্ধি

প্রকাশিত হয়, সেইরূপ যে ঈশ্বর প্রলয়কালে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটকে অব্যক্তা প্রকৃতি ভাবে আপনার মধ্যে বিলীন করেন এবং প্রলয়াবসানে অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে পুনরায় হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটভাব প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বরই সঙ্কর্ষণ। সর্ব্ব প্রকার উপাধি বিনির্ম্মুক্ত সর্ব্বজ্ঞ নির্গুণ ভাবই আত্মার তুরীয় ভাব। বাসুদেবই সেই তুরীয় ভাব। হস্তপদাদি অঙ্গ, গরুড়াদি উপাঙ্গ, সুদর্শনাদি অস্ত্র এবং কৌস্তুভাদি আভরণধারী ভগবান্ হরিই প্রাণ ও শরীরধারী, বিরাটপুরুষ, বিজ্ঞান ও মনোময় হিরণ্যগর্ভ, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর এবং নির্গুণ ব্রহ্ম এই চারিভাবে প্রকাশিত হন; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই ভগবান্ ঈশ্বর হরি হইতেই বেদসকল উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহার কোনপ্রকার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পন্ন। তিনি আপন মহিমাতেই আপনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার অন্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। তিনি কেবলমাত্র মায়া বিস্তারের ন্যায় অন্য কোন উপকরণ না লইয়া আপন সঙ্কল্পমাত্র দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন। তাঁহার পূর্ণজ্ঞান কখন আবৃত্ত হয় না। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু সাধকগণের অধিকার ভেদ হেতু শাস্ত্র তাঁহাকে নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল শ্রেষ্ঠ সাধকেরাই তাঁহাকে আপনাদের আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন।

আচার প্রবন্ধকার বলিয়াছেন—

"প্রথমতঃ দেখা যায় যে বিষ্ণু শ্যামবর্ণ। মেঘশূন্য আকাশের বর্ণও শ্যাম। এবং শ্যামবর্ণটী সকল বর্ণের অপেক্ষা প্রাণী এবং উদ্ভিদ্দিগের শরীর পোষণে অধিকতর কার্য্যকরী। তদ্ভিন্ন, মেঘ ও সূর্য্যকে ধারণ করত আকাশ সর্ব্বদা বিশ্বপালন কার্য্যে নিরত। দ্বিতীয়তঃ, বিষ্ণুর চারিহস্ত। তাঁহার এক হস্তে শঙ্খ, অন্য হস্তে চক্র, অপর হস্তে গদা, এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম। অর্থাৎ বিষ্ণুদেবতা ঐ চারিটী দ্রব্য ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি উহাদিগের আধার এবং উহারা তাঁহার আধেয়। এখন দেখা যাউক ঐ গুলি কি? শঙ্খ বস্তুটী শব্দের দ্যোতক এবং শব্দ আকাশের গুণ (১) অতএব শঙ্খ

(১) শব্দ—শব্দগুণমাকাশং

আকাশের স্থানীয় হইয়াছে। চক্র কালচক্রেরই বোধক। অতএব চক্র অর্থে কাল। গদা * শব্দে প্রকাশ বা দীপ্তি বুঝায়। অতএব গদা অর্থে জ্ঞান। পদ্ম বলিতে সুপ্রসিদ্ধ লোকাত্মক পদ্ম অর্থাৎ জীব। তবেই দেখা গেল যে, আকাশ বা অনন্তবিস্তার, অখণ্ড দণ্ডায়মান অনন্তকাল, জ্ঞান, এবং জীবনের যিনি আধার তিনিই বিষ্ণু। মানুষ গুণমাত্র জানিতে পারে এবং তাহা জানিয়া গুণের আধার বা গুণীর অনুমান করে। সেইরূপে পরব্রহ্মের অনুভূতি হইয়াছে এবং তাঁহার রূপকল্পনাও হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড় † বাঙ্ময় অর্থাৎ বেদকে বুঝায়। অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা উপনিষদ্ পুরুষ বেদ দ্বারা প্রতিপাদ্য। অতএব দেখা গেল যে আকাশ বা বিষ্ণুপদ যাঁহার আধিভৌতিকরূপ, আধিদৈবিক ভাবে তিনি পালন কর্ত্তা বিষ্ণু, এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনিই পরমাত্মা।"

আবার অনেক উপাসক ব্রহ্মকে ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট ভাবে দেখিয়া তৃপ্ত হন না। একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য তাঁহাদের মন লালায়িত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন মূর্ত্তিতে বিশ্বরূপ দেখাইলে পর অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—

"হে ঈশ্বর। হে পূজ্য! আমি সর্ব্বাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক তোমায় প্রণাম করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা করেন, সখা যেমন সখার অপরাধ গ্রহণ করেন না, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ মনে করেন না, আপনি সেইরূপ বাৎসল্য, সখ্য, এবং প্রেমভাবে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন!

আপনার এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি বটে কিন্তু আমার হৃদয়ে এক প্রকার ভয়েরও সঞ্চার হইয়াছে, অতএব হে দেবেশ! হে হিরণ্যগর্ভ! হে জগন্নিবাস বিরাট পুরুষ! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমাকে দর্শন দিন।

---

* গদ্‌ধাতু ভাসন বা প্রকাশার্থ-কর্ত্তৃবাচ্য অচ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ।

† গরুড়—গৃ (নিগরণে) ধাতু, উর প্রত্যয় যোগে গরুর, বর্ণ সাম্যাৎ গরুড়।

আমি আপনাকে শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম-কিরীটধারী দেখিতে বাঞ্ছা করি। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তি! আপনি সেই চতুর্ভুজ রূপটী ধারণ করুন।"

তাহার পর অর্জ্জুনকে ভগবান্ আপন দেবরূপ দেখাইয়া পরে আপনার মানুষরূপ ধারণ করিলেন। তখন অর্জ্জুন বলিলেন—

"হে জনার্দ্দন! আপনার এই সৌম্য মানুষমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম।"

এক শ্রেণীর ভক্তগণ বলেন যে, যতক্ষণ না অর্জ্জুন ভগবানকে মানুষ ভাবে দেখিলেন ততক্ষণ তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। অতএব ভগবানকে মানুষ ভাবে পূজা করাই উচিত। অপর এক শ্রেণীর ভক্তগণ বলেন যে সর্ব্বদা তাঁহাকে মানুষভাবে সন্দর্শন পাওয়াও কঠিন, সুতরাং সর্ব্বদা তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন করা উচিত। সর্ব্বদা তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন—

"হে গোবিন্দ! কলিকালে তোমার নাম তোমা অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ। তোমার পূজার জন্য অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজন। কিন্তু তোমার নাম উচ্চারণ করিলে বিনা অষ্টাঙ্গ যোগেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।"

"নারায়ণ এই মন্ত্র আছে এবং বাগিন্দ্রিয়ও বশবর্ত্তী আছে। ইচ্ছা করিলেই লোকে নারায়ণের নাম গ্রহণ করিতে পারে। তথাপি যে মনুষ্য হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে বিরত থাকিয়া ঘোর নরকে পতিত হয় ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।"

"এই সংসারে দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ বা পিতৃতর্পণ, সমস্তই হরি-সঙ্কীর্ত্তন বিনা নিস্ফল হয়।"

"সংসার-নরক-যন্ত্রণা-গ্রস্ত পাপিষ্ঠেরা যদি ভক্তিভাবে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মুক্তি হয়।"

এইরূপ উপাসনায় ঈশসৃষ্ট বা শাস্ত্রকল্পিত কোন একটী বিশেষ রূপ বা নাম বা বস্তু উপাসকের প্রধান উপাস্য এবং ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা হিরণ্য গর্ভ বা বিরাট পুরুষ উপাসকের মনে অপ্রধান ভাবে থাকেন। এই উপা-

সনার নামই প্রতীক উপাসনা বা অধ্যাসরূপিণী উপাসনা। এই উপাসকগণ শালগ্রামশিলাকেই বিষ্ণু মনে করেন, প্রতিমাকেই ঈশ্বর বা আদ্যাশক্তি মনে করেন, ও শ্রেষ্ঠগুণ সম্পন্ন জীবগণকে এবং আপন আপন গুরুকেই পরব্রহ্ম মনে করেন।

প্রতীক উপাসনায় উপাস্য দেবদেবীর মূর্ত্তি সসীম, সুন্দর এবং মনোহারী হওয়ায় উপাসকের ভক্তি, প্রেম, এবং স্নেহরস সহজেই উথলিয়া উঠে এবং মায়াময় জগৎ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত মনকে উপাস্য ব্যক্তি বা পদার্থে নিশ্চল ভাবে সহজেই স্থাপন করা যায়। অসীম বিরাট পুরুষকে মনে ধারণা অতি কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি ভক্তি, প্রেম এবং স্নেহের আস্পদগণ সকলেই সসীম। সুতরাং অনেকের পক্ষে বিরাট উপাসনা অপেক্ষা প্রতীক উপাসনা সম্যক্ প্রীতিকরী এবং ফলদাত্রী। প্রতীক উপাসনা অভ্যস্তা হইলে সহজেই নিরাকার নির্ব্বিকার নির্গুণ উপাসনা আয়ত্ত হয়। সেই জন্য পুরাণে কথিত আছে যে বলির কাছে ভগবান বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন এবং রাধিকার নিকট ভগবান্ কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভক্তগণ যখন ভগবানকে পূজা করেন তখন তাঁহাকে সসীম বামন অবস্থায় দর্শন করেন, এবং আরাধক আরাধিকাগণ * যখন অন্য সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক এক ভগবানের আরাধনাই সার করেন তখন ভগবান্ ইন্দ্রিয় এবং মন আকর্ষণকারী † পরম সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখা দেন।

কিন্তু প্রতীক উপাসকগণের ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে নির্গুণ নিরাকার অব্যয় অচিন্ত্য ব্রহ্মের উপাসনা যাহাতে সহজে আয়ত্ত হয় সেই উদ্দেশ্যেই প্রতীক উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীরামোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

---

* রাধিকা ও আরাধিকা এবং আরাধক শব্দ রাধ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন।

† কৃষ্ণ ও আকর্ষণ শব্দ কৃষ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন।

ব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, ভেদ রহিত এবং অশরীরী হইলেও উপাসকদিগের সিদ্ধি সৌকর্য্যার্থ তাঁহার রূপ কল্পনা হইয়া থাকে। এইরূপে রূপ কল্পনা দ্বারা নানা দেবতার কল্পনা হওয়ার পর সেই দেবতাদিগের পুংস্ত্ব, স্ত্রীত্ব, হস্ত পদ নয়নাদি অঙ্গ সকল, ত্রিশূল, সুদর্শন, বজ্রাদি অস্ত্র সকল. শঙ্খ, চমরু, হার, কেয়ূরাদি ভূষণ সকল, শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণাদি বর্ণ সকল, বৃষভ, গরুড়, ঐরাবতাদি বাহন সকল, সৃষ্টি স্থিতি সংহারাদি শক্তি সকল, দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষাদি সেনা সকল, কল্পিত হয়। এই সমস্ত কল্পিত হস্ত পদাদির সংখ্যা ও অস্ত্র, বাহন, সেনা, শক্তি, বর্ণ, ভূষণাদি, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কল্পিত হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মের শরীর কল্পনা হইয়া থাকে। তৎপরে সেই শরীর সম্বন্ধীয় (১) পুং স্ত্রীত্ব (২) অঙ্গভূষণ অস্ত্রাদি (৩) বর্ণ ও বাহনাদি (৪) শক্তি এবং (৫) সেনা কল্পনা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনা হইয়া থাকে।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

যাঁহারা উপাসনার তত্ত্ব জানেন, তাঁহারাও প্রণবদ্বারা উপাসনা করেন, যাঁহারা উপাসনার তত্ত্ব জানেন না, তাঁহারাও প্রণব দ্বারা উপাসনা করেন। কিন্তু বাহ্যজগতে কর্ম্মের ফল যেমন জ্ঞান নিরপেক্ষ হইয়া থাকে, উপাসনার ফল সেরূপ নহে। লোকে হরীতকীর গুণ জানুক আর নাই জানুক, সকলেরই হরীতকী ভক্ষণে একই রূপ বিরেচন হয়। লোকে দাহক ও দাহ্য পদার্থের গুণ জানুক আর নাই জানুক দাহ্য ও দাহক পদার্থ একত্র হইলেই একই রূপ দহনক্রিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু উপাসনার ফল ঐরূপ এক প্রকার হয় না। জ্ঞানীর উপাসনার ও অজ্ঞানীর উপাসনার ফল পৃথক। উপাসনার তথ্য জানিয়া এবং ভক্তি সহকারে যে জ্ঞানী উপাসনা করেন তিনি উপাসনার তথ্যানভিজ্ঞ এবং শ্রদ্ধারহিত উপাসক অপেক্ষা অধিক ফল লাভ করেন। অজ্ঞানীদিগের উপাসনার একেবারে ফল হয় না এমত নহে। বাস্তবিক অজ্ঞানীদিগের উপাসনারও কিছু ফল আছে এবং অজ্ঞানীরা উপাসনার অনধিকারী নহে। তবে বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ম্মের সমধিক ফল এবং উচ্চাঙ্গের উপাসনায় কেবল মাত্র বিদ্বান্ ব্যক্তির অধিকার হয়।

কিন্তু সকল প্রকার উপাসকেরই নিম্নোক্ত ভগবদ্বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ পথে রাখা কর্ত্তব্য :—

যজ্ঞ, তপস্যা, দান, এবং ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে "সৎ"শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হে পার্থ, হবন, দান, তপস্যা ও অন্যান্য যে কোন কর্ম্ম অশ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই "অসৎ" বলিয়া অভিহিত হয়। অশ্রদ্ধাসহ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, লোকান্তরে বা ইহলোকে, কোন কালেই ফলপ্রদ হয় না।

বাস্তবিক যে উপাসক আপন ইষ্টদেবে ভক্তি ও প্রেমপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ আনন্দ সহকারে পালন না করে তাহার উপাসনা ভণ্ডামি মাত্র, তাহার উপাসনার কোন ফল নাই।

ঊনবিংশ প্রবন্ধ।

উপাসনা তত্ত্ব।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন—

সেই পরব্রহ্ম চিন্ময়, সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তিবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী ও একরস। তিনি প্রকৃতির স্রষ্টা সুতরাং প্রাণ, ইন্দ্রিয় সকল, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, এবং অবিদ্যা প্রভৃতি কোন প্রাকৃতিক পদার্থই তাঁহার উপাধি নহে।

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—

ব্রহ্মের কোনও প্রকার শরীর বা মূর্ত্তি নাই। শরীরমাত্রই নশ্বর ও মায়াময়। স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থেই ব্রহ্ম নিত্য অবিকৃত আত্মাভাবে অবস্থিত। বাস্তবিক একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। এই মায়াময় জগৎ হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া তিনি সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন। যে সাধক তাঁহাকে আপনার আত্মা বলিয়া অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তিনি সমস্ত শোকসন্তাপ হইতে মুক্ত হন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

ঈশ্বরের শরীর নাই, ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নাই, ঈশ্বরের সমান নাই, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ নাই। স্বভাবতই তাঁহার সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া করিবার শক্তি আছে অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা সমস্ত পদার্থই জানেন এবং তাঁহার সঙ্কল্প মতেই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট ও চালিত হয়।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

আত্মাই সমুদায় দেবতা; সমস্ত জগৎ আত্মাতেই অবস্থিত; আত্মাই শরীরিগণের কর্ম্মযোগ সংঘটন করিয়া থাকেন। অগ্রে দেহাকাশে বাহ্যাকাশ, চেষ্টাস্পর্শের কারণ প্রাণবায়ুতে বাহ্যবায়ু, অন্ন পাককারী ও চাক্ষুষ তেজে বাহ্যতেজ, দেহস্থজলে বাহ্যজল, শারীরিক পার্থিবাংশে বাহ্যপার্থিব-মূর্ত্তি সকল, মনে চন্দ্র, শ্রোত্রে দিক, পাদেন্দ্রিয়ে বিষ্ণু, বলে হর, বাগিন্দ্রিয়ে অগ্নি, বায়ু ইন্দ্রিয়ে মিত্র, এবং উপস্থে প্রজাপতি সন্নিবেশিত অর্থাৎ ভাবনা

বিষ্ণুর নাম শ্রবণ, তাঁহার নাম কীর্ত্তন, তাঁহাকে স্মরণ, তাঁহার পদ-সেবন, তাঁহার পূজা, তাঁহার বন্দন, তাঁহার দাস্য, তাঁহার সখ্য, এবং তাঁহাকে আত্মনিবেদন, এই নয় প্রকারে ভগবান্ বিষ্ণুর ভজনা করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ হইবে এই আশায় কোন কোন ভক্ত আপন শরীরে, গৃহে ও বস্ত্রাদিতে নারায়ণ, শিব, এবং অন্যান্য দেবদেবীর চিত্র ও নাম অঙ্কিত করেন। সর্ব্বদা তাঁহার নাম স্মরণ-পথে থাকিবে এই আশায় কেহ কেহ পুত্র কন্যাদির নাম গোবিন্দ, কৃষ্ণ, শিব, রামচন্দ্র, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, শঙ্করী প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন। এবং দয়া, ভগবৎ-স্পৃহা ও শ্রদ্ধা, এই তিন মানসিক ; সত্যবাক্য, হিতবাক্য, প্রিয়বাক্য, ও স্বাধ্যায়, এই চারি বাচিক ; এবং দান, পরপরিত্রাণ ও পূজা, এই তিন কায়িক ; এই দশ প্রকারে ভগবানের ভজন করেন। তাঁহারা অঙ্কন, নামকরণ, এবং ভজন, এই তিন প্রকারে ভগবানের সেবাই পরমপুরুষার্থ মনে করেন।

আবার কেহ কেহ বলেন উপাসনা পাঁচ প্রকার। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায়, ও যোগ। অভিগমন শব্দে ভগবৎ স্থানের মার্জ্জন ও লেপনাদি। উপাদান শব্দে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদির দান। ইজ্যা শব্দে পূজা। স্বাধ্যায় শব্দে মন্ত্রজপ, নামজপ, স্তোত্রপাঠ. নামসঙ্কীর্ত্তনাদি, ও ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশক শাস্ত্রের অভ্যাস। যোগশব্দে একাগ্রচিত্তে ভগবদনুধ্যান। এই পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে ভক্তি নামক জ্ঞান আবির্ভূত হয় এবং চরমোৎকর্ষ অবস্থায় যখন অহঙ্কারাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ উপাসককে আবৃত্তি রহিত স্বীয় পরমানন্দ ধাম প্রদান করেন।

আবার কোন কোন ভক্ত বলেন যে কোন প্রকারেই হউক না কেন সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করাই পরম পুরুষার্থ। অতএব তাঁহারা শয়ন, ভোজন, গমন, উপবেশন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে, তীর্থাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ ও ব্রত পর্ব্বাদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, এবং বিভূতিশালী শ্রীমান্ এবং তেজস্বী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন

পদার্থে, ভগবান্‌কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চলিলে, ভগবানের অনন্ত মহিমা কোন না কোন ভাবে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র ভক্তের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে।

আবার জ্ঞানভেদেও উপাসনার তারতম্য হইয়া থাকে। ৺গীতা বলিয়াছেন—নানাভাবে প্রতীয়মান জগৎ যে জ্ঞান দ্বারা মায়াময় বলিয়া জ্ঞাত হয় এবং যে জ্ঞান দ্বারা অব্যক্তাদি স্থাবরান্ত সমস্ত ভূতেই এক অদ্বয় কূটস্থ আত্মা-মাত্র দৃষ্ট হন সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান।

নানা ভাবে প্রতীয়মান জগৎ যে জ্ঞান দ্বারা সত্য বলিয়া বোধ হয় এবং যে জ্ঞান দ্বারা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব অনুভূত হয় সেই জ্ঞান রাজসিক। ঐ জ্ঞানের বশীভূত হইয়া স্বর্গ, সমাজ, দেশ, গ্রাম প্রভৃতিকে ঈশ্বর প্রাপ্তি অপেক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর উপাসনাকে ঈশ্বরোপাসনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনুষ্য মনে করে। এই রাজসিক জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

যে জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য মনে করে যে পারমার্থিক অবলম্বন শূন্য কোন এক ব্যক্তি বা বস্তু বা কাষ্ঠ বা লোষ্ট্র বা ধন বা সম্পত্তি বা ক্ষমতা বা বল বা রূপ বা যৌবন বা অন্য কোন তুচ্ছ পদার্থই ঈশ্বর বা সর্ব্বস্বধন,এবং উহা ভিন্ন অন্য কোন ইষ্ট বস্তু বা ঈশ্বর নাই, সেই জ্ঞান তামসিক জ্ঞান। এই জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা অধম।

যে ভক্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ঈশ্বরকে যে ভাবে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে ঈশ্বর তাহাকে সেইভাবে শ্রদ্ধান্বিত করেন।

সে ব্যক্তি সেইরূপ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে সেই ভাবে উপাসনা করে। এবং সেই উপাসনার যে ফল হওয়া উচিত সেই ফল সে লাভ করে। কিন্তু সেই ফল সে স্বতন্ত্র ভাবে লাভ করে না। সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-প্রদাতা ঈশ্বরই তাহার কর্ম্মের উপযুক্ত ফল তাহাকে প্রদান করেন। ঈশ্বর স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন না। তিনি যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম করিয়াছেন তদ্দ্বারাই তপস্যা উপাসনা অহিংসা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি পাপকর্ম্মের ফল নিষ্পন্ন হয়।

অল্পবুদ্ধি উপাসক সকল যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহা অল্প এবং নশ্বর। যাহারা হিরণ্যগর্ভ প্রমুখ দেবগণকে পূজা করে তাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্ত হন। সুতরাং সত্য জ্ঞান আনন্দ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বিবেকশূন্য ব্যক্তিরা ব্রহ্মের নিরাকার নির্ব্বিকার প্রপঞ্চাতীত পরমাত্ম-স্বরূপ ভাব জানিতে পারে না। তাহারা ব্রহ্মকে দেবতা-মনুষ্য-মৎস্য-কূর্ম্মাদি প্রতীক-ভাবে মনে করে।

ব্রহ্মের মায়াপ্রভাবে জীবগণ মোহগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মকে নিত্য,শুদ্ধ,বুদ্ধ,মুক্ত, নির্গুণ আত্মা স্বরূপে না দেখিয়া রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় ব্রহ্মতে জগৎ দর্শন করে। সুতরাং যতদিন না তাহাদের মোহ ঘুচিয়া যায় ততদিন নির্গুণ ব্রহ্ম তাহাদের বুদ্ধিতে প্রকাশ হন না এবং তাহারা ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারে না।

বাস্তবিক নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানই চরম জ্ঞান। অন্য সমস্ত জ্ঞান এবং সাধনা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় মাত্র। নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য উপায় নাই। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

এই ভুবন মধ্যে এক পরমাত্মাই অবিদ্যাদি বন্ধ কারণ নাশ করেন। সেই আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। অগ্নি যেমন সমস্ত পদার্থ দগ্ধ করে, আত্মজ্ঞানও সেইরূপ অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য ধ্বংস করে। বেদান্ত বাক্যের মর্ম্ম সম্যক্ বুঝিয়া যাঁহারা আপন মনকে নির্ম্মল করিতে পারেন তাঁহাদের হৃদয়ে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে। তদ্ভিন্ন মুক্তির অন্য উপায় নাই।

———*:**:*———

বিংশ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

উপাসনার অঙ্গ বা সাধনা।

এক্ষণে দেখা গেল যে এক অদ্বয় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর বা ব্যক্তির পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। অবিদ্যা বশতই জীবগণ স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অদ্বৈত ব্রহ্মে জগৎ দর্শন করে, আবার অবিদ্যা ঘুচিলেই জগতের অস্তিত্বজ্ঞান লোপ প্রাপ্ত হয়। আরও দেখা গেল যে, এই অবিদ্যা নষ্ট করিবার জন্য বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রয়োজন এবং তজ্জন্য ভগবদ্ভক্তগণের সহিত কথোপকথন এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রসমূহ সর্ব্বদা ভক্তিভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আরও দেখা গেল যে, ব্রহ্মের অনুগ্রহ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম সাধকের মনে সম্যক্ প্রতিভাত হয় না এবং সেই জন্য সর্ব্বদা নিশ্চলভাবে ব্রহ্মে চিত্ত সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মের উপাসনা করা সাধকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আরও দেখা গেল যে, অধিকার ভেদে ব্রহ্মের উপাসনা দুই প্রকার। যাঁহারা শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল ও সমাহিত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে নির্গুণ উপাসনাই বিহিত। এবং যাঁহারা নির্গুণ উপাসনার অধিকারী নহেন তাঁহারা সগুণ উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া নির্গুণ উপাসনার অধিকারী হইবেন এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের জন্য সগুণ উপাসনাই বিহিত।

৺গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

যাঁহারা আপন ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত করত সর্ব্বদা হর্ষ বিষাদ রাগ দ্বেষাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত প্রাণিগণের হিতে রত থাকিয়া অক্ষর অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অচিন্ত্য সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বপ্রকার-পরিবর্ত্তনরহিত নির্ব্বিকার নিত্য নির্গুণ আত্মার উপাসনা করেন তাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

অতঃপর ভগবান্ বলিয়াছেন—

জীবগণ স্বভাবত ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ, সুতরাং, মন এবং ইন্দ্রিয়গণকে প্রেয় বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করত ব্রহ্মে সংস্থাপন করা ইন্দ্রিয়সুখ-রত জীবগণের পক্ষে ক্লেশকর। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় কতক পরিমাণে ইন্দ্রিয় ও মনের তৃপ্তি হইতে পারে বলিয়া সাধকগণের পক্ষে সগুণোপাসনা ততটা ক্লেশকর নহে। কিন্তু নিগুর্ণোপাসনায় মন বা কোন ইন্দ্রিয়ই পরিতৃপ্ত হয় না, সুতরাং নিগুর্ণোপাসনা অধিকতর ক্লেশকর।

জীবগণ অতি কষ্টে এই নিগুর্ণোপাসনা আয়ত্ত করিতে পারে। সেই জন্য অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীর জন্য ভগবান্ ব্যবস্থা করিয়াছেন—

যাঁহারা আমার উপর সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ করিয়া আমাকে সগুণভাবে ধ্যান করত আমারই উপাসনা করেন আমি সেই সমস্ত ভক্তগণকে অচিরেই নিগুর্ণোপাসনায় অধি-কারিত্বে উন্নীত করত তাঁহাদিগকে মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। অতএব সগুণভাবেই হউক আর নিগুর্ণভাবেই হউক যে প্রকারে পার সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক আমাতেই মন ও বুদ্ধি স্থাপিত কর। তাহা হইলে পরিশেষে তুমি নিশ্চয়ই ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

যাঁহারা সর্ব্বদা ব্রহ্মে চিত্ত সংস্থাপন করিতে না পারেন তাঁহাদের জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদি স্থিরভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিতে না পার তাহা হইলে স্বল্পকালের জন্যও আমাতে চিত্ত সংস্থাপনের জন্য বারম্বার অভ্যাস কর। অভ্যাস যোগের দ্বারা ক্রমশঃ আমাতে দীর্ঘকাল চিত্ত সংস্থাপন বা আমার উপাসনা করিতে শিখিবে।

যদি স্বল্প কালের জন্যও বারম্বার আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিতে সমর্থ না হও তাহা হইলে আমার উদ্দেশে দান ব্রত উপবাস পূজা পরিচর্য্যা নাম সঙ্কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম করিবে। আমার উদ্দেশে কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমশঃ উচ্চাধিকারী হইয়া অবশেষে মোক্ষপদ পাইবে।

যদি আমার উদ্দেশে কর্ম্ম করিতেও অশক্ত হও তাহা হইলে তোমার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিও, তবে সর্ব্বদা মনে করিও যে ঐ কর্ম্ম তুমি আপন সুখের জন্য করিতেছ না কিন্তু আমার আদেশেই করিতেছ ; এবং এই প্রকার ভাবনার দ্বারা মনকে সংযত রাখিয়া সকল কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিও। এইরূপে কর্ম্মফল প্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই শান্তি আপনা হইতে আসিবে।

বাস্তবিক কর্ম্মফল ত্যাগই সাধনার প্রধান অঙ্গ। ইহাই সাধনার প্রথমে, ইহাই সাধনার মধ্যমে, ইহাই সাধনার চরমে। কর্ম্মফল ত্যাগ ভিন্ন নিবৃত্তি মার্গের কোন সাধনাই সুসম্পন্ন হয় না এবং সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগই মুক্তির অব্যবহিত কারণ। সেই জন্য ভগবান্ নিম্নাধিকারীর পক্ষে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে ঐ কর্ম্মের ফল প্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন এবং পরক্ষণেই বলিলেন—

ব্রহ্মকে না জানিয়া ব্রহ্মতে চিত্ত সংস্থাপনের বারম্বার চেষ্টা করা অপেক্ষা ব্রহ্মকে পরোক্ষভাবে জানা শ্রেষ্ঠ। আবার ব্রহ্মকে কেবল মাত্র পরোক্ষভাবে জানা অপেক্ষা ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান প্রাপ্তির পর তাঁহার ধ্যান করা শ্রেয়ঃ। আবার উক্তরূপে ব্রহ্মের ধ্যান অপেক্ষা সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চিতমতি হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগকরা শ্রেষ্ঠ। সকল কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই অনন্তশান্তি পাওয়া যায়।

সাধক সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন—

যিনি আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি দ্বেষশূন্য, আপনার সমকক্ষ ব্যক্তির প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন এবং আপনার অপেক্ষা হীন ব্যক্তির প্রতি কৃপালু, যিনি সকল বস্তুতেই মমতাশূন্য, তপস্বাধ্যায়ানুষ্ঠান নিমিত্ত কোন অভিমান যাঁহার মনে স্থান পায় না, সুখ বা দুঃখ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। আততায়িগণের প্রতিও যিনি ক্ষমাশীল, যিনি সদা সন্তুষ্ট, যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা আত্মধ্যান নিরত, যাঁহার স্বভাব সংযত, আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যাঁহার কিছুমাত্র সংশয় নাই, যাঁহার মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে আমাতে

অর্পিত, তিনিই আমার ভক্ত এবং তিনিই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে কোন জীব সন্তাপিত হয় না, কোনও জীব হইতে যিনি কোন প্রকার আশঙ্কা করেন না, প্রিয় লাভে হর্ষ, অপ্রিয় ঘটনায় রোষ, তস্করাদি হইতে ভয়, এবং অন্য কোন কারণ জনিত উদ্বেগ যাঁহার মনে স্থান পায় না, তিনি আমার প্রিয়। সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ সম্পন্ন, দক্ষ, অনাসক্তচিত্ত সুতরাং অনিষ্ট ঘটনা হইলেও অক্ষুব্ধ ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে ঐকান্তিক ভক্তি করেন এবং আমার প্রিয় হন। ইষ্ট প্রাপ্তিতে যিনি আনন্দোৎফুল্ল হন না, অনিষ্ট ঘটনাকে যিনি দ্বেষ করেন না, এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না, মঙ্গলামঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যিনি একমনে আমার ভজনা করেন, তিনি আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী, মান ও অপমানে অক্ষোভিতচিত্ত, শীতোষ্ণ সুখ দুঃখে হর্ষ বিষাদশূন্য, সর্ব্বত্র অনাসক্ত, নিন্দা ও স্তুতি দ্বারা অবিচলিত, সংযতবাক্, সদা সন্তুষ্ট, আশ্রয় মণ্ডপাদিতেও মমত্বরহিত, নির্দ্দিষ্ট বাস শূন্য, এবং ব্যবস্থিতচিত্ত, যে সাধক সর্ব্বদা আমার ভজনা করেন তিনি আমার প্রিয়। যে সকল সাধকেরা আমাতে ভক্তিমান্ ও মৎ পরায়ণ হইয়া এই সমস্ত ধর্ম্মপূর্ণ মোক্ষসাধক উপদেশ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পালন করেন তাঁহারা আমার অতিশয় প্রিয়। সুতরাং এইরূপ অনুষ্ঠানই সকল মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য।

কামনা পরিত্যাগই যে প্রধান সাধনা এ কথা নানা স্থানে বারম্বার কথিত আছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

জীব যখন আপন হৃদয়স্থ সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিতে পারেন তখন আপন মরণশীল ভাব পরিত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন এবং এই শরীরে থাকিতে থাকিতেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন—

যে ব্যক্তি দৃষ্টাদৃষ্ট কাম্য বস্তু সকল চিন্তা করত তাহাদিগকে প্রার্থনা করে সেই কামনা পরতন্ত্র ব্যক্তি সেই সকল কামনার জন্য সেই সকল কাম্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষার সহিত ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে

সাধকের এই জীবনেই সমস্ত কামনা ধ্বংস পায় সেই সাধক কামনা বিমুক্ত হইয়া পরমার্থ তত্ত্ব জানিতে পারেন ও কৃতার্থ হন।

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন—

জীবদ্দশায় যে যে বিষয় জীব চিন্তা করে মৃত্যুকালে সেই সেই বিষয়ের চিন্তা জীবগণকে অধিকার করে। তখন জীবের অন্য সমস্ত বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া যায় এবং উক্ত বাসনাময় জীব লিঙ্গশরীরধারী জীবনরূপে অবস্থান করে। অনন্তর যে লোকে উক্ত বাসনা সকলের প্রাধান্য আছে সেই লোকে উদানবায়ু উক্ত বাসনাময় জীবকে লইয়া যায় এবং সেই লোকে ঐ জীবের জন্ম হয়। সুতরাং যে সাধক সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

৺গীতা বলিয়াছেন—

যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহ্যলাভনিরপেক্ষ হইয়া আপন আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন করত সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে বিদ্বান্ বা আত্মারাম বা আত্মক্রীড় বা সন্ন্যাসী বা স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।

দুঃখে পড়িলে যাঁহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় না এবং সুখপ্রাপ্তি হইলে যিনি সেই সুখের স্থিতির আকাঙ্ক্ষা করেন না সেই আসক্তি-ভয়-ক্রোধ-বিমুক্ত সাধককে মুনি বা স্থিতপ্রজ্ঞ বা ত্যক্ত পুত্র মিত্র লোকৈষণ বা সন্ন্যাসী বলা যায়।

পুত্র মিত্র শরীর প্রাণ প্রভৃতি কোন বিষয়েই যে সাধকের আসক্তি নাই, যিনি শুভ বিষয় প্রাপ্তিতেও হৃষ্ট হন না এবং অশুভ বিষয় ঘটিলেও বিষণ্ণ হন না, সেই হর্ষ-বিষাদ-আসক্তি-বর্জ্জিত সাধকের প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যায়। কোন প্রকার ভয় পাইলে কূর্ম্ম যেমন আপনার সমস্ত অঙ্গ সঙ্কুচিত করে সংসারভীত সাধক সেই প্রকার যখন সমস্ত বিষয় হইতে আপনার সকল ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহরণ করেন তখন তাঁহার প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগে অসমর্থ, জড়, আতুর বা উপবাস-পরায়ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু তাহাদের বিষয়াভিলাষ নষ্ট হয় না। যে সাধক স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন তিনিও বিষয়

সমূহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, অধিকন্তু তত্বজ্ঞান হওয়ায় তাঁহার বিষয়াভিলাষ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে সাধক স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে তিনি ইন্দ্রিয় সকলকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিবেন। মনের উপর ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য অতিশয় বলবৎ। এমন কি মোক্ষার্থে যত্নশীল মেধাবী পুরুষের মনকেও কখন কখন তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বলপূর্ব্বক ব্যাকুল করত বিষয়ভোগে লইয়া যায়।

ইন্দ্রিয় সকলকে চিরকালের জন্য দমিত রাখিবার উপায় এই যে প্রথমে ইন্দ্রিয় সকলকে সংযমপূর্ব্বক মনকে আত্মচিন্তায় রত কর এবং তাহার পর ঐ ভাবে সংযতেন্দ্রিয় এবং ব্রহ্মচিন্তায় রত থাকিতে অভ্যাস কর। এইরূপে অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়-গণকে দমন করিতে সক্ষম হইবে এবং স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারিবে। মনকে ব্রহ্মচিন্তায় রত করিতে না পারিলে জীব সংযতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। মনের স্বাভাবিকধর্ম্মই এই যে মন সর্ব্বদা কোন না কোন বিষয় চিন্তা করে। ব্রহ্মচিন্তায় রত না হইলে মন বাহ্য এবং অন্তর্জগতের বিষয় চিন্তা করিবেই করিবে। মন যাহা চিন্তা করে ক্রমশঃ তাহাতে তাহার আসক্তি হয়। আসক্তি হইলে জীব সেই আসক্তির বিষয় পাইতে কামনা করে। কাম্যদ্রব্য না পাইলেই ক্রোধ হয়। ক্রুদ্ধ হইলে জীবের কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান লোপ পায়। কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান লুপ্ত হইলেই হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইলেই মনুষ্য পশুর সমান হয় এবং পশুর ন্যায় বুদ্ধিবিহীন হইলে মনুষ্য বিনষ্ট হয় অর্থাৎ পুরুষার্থ সম্পাদনের কোন ক্ষমতাই তাহার থাকে না। অতএব সর্ব্বতোভাবে বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে ব্রহ্মচিন্তায় রত রাখিবে। যে সাধক বিষয়সমূহে আসক্তি এবং দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে বশীভূত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা শাস্ত্রবিহিত বিষয় সকল যথাবিধি উপভোগ করেন তিনি মনকে ব্রহ্মচিন্তায় রত রাখিতে পারেন এবং চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করেন। চিত্তপ্রসন্ন হইলে জীবের সকল দুঃখ বিনষ্ট হয় এবং বুদ্ধি সংশয়শূন্য হইয়া ব্রহ্মে নিশ্চলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহার ইন্দ্রিয় এবং মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত না হয় তাহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি

হয় না এবং সে ব্রহ্মচিন্তাতে রত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচিন্তায় রত হইতে পারে না তাহার বিষয় তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না এবং বিষয়তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত না হইলে সুখের সম্ভাবনা নাই।

বাত্যা উঠিলে নাবিক অপ্রমত্ত ভাবে থাকিয়া বল এবং কৌশলপূর্ব্বক নৌকাকে আপন গন্তব্য পথে না রাখিলে বায়ু যেমন নৌকাকে পথ ভ্রষ্ট করে এবং বিপথে লইয়া যায় সেইরূপ যে মন ইন্দ্রিয়সকলকে দমনে না রাখিয়া তাহাদিগকে আপন আপন বিষয়ে বিচরণ করিতে দেয় এবং আপনিও সেই সকল বিষয় কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়গণের সহিত আকৃষ্ট হয় সেই মন বিবেক জনিত বুদ্ধিকেও ব্রহ্মধ্যান হইতে বিপথে লইয়া যায় এবং বিষয়-ধ্যানে রত করে। অতএব হে মহাবাহো অর্জ্জুন! যে সাধকের ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয় হইতে সম্পূর্ণভাবে নিগৃহীত হইয়াছে তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। ব্রহ্মতত্ত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে অজ্ঞানান্ধকারাবৃত কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষে আলোকময়।

সাধারণ লোকে বিলাস দ্রব্য সকলের দোষগুণ জানে এবং তাহা-দিগকে ভোগ করে কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সাধক জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় শাস্ত্রানুমোদিত দ্রব্য ভিন্ন অন্য দ্রব্যের সংবাদ রাখেন না এবং তাহা ভোগ করেন না।

নদনদী সকল সমুদ্রে পতিত হইয়া যেমন সমুদ্রের কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারে না কিন্তু সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায় সেইরূপ কাম্যবস্তু সকল যে সাধকের ইন্দ্রিয়গোচর হইলেও তাঁহার মনকে ক্ষোভিত করিতে পারে না কিন্তু তাঁহার মনে লয় প্রাপ্ত হয় সেই সাধকই শান্তি প্রাপ্ত হন।

যে সকল ব্যক্তি কাম্যবস্তু সকল প্রার্থনা করে তাহাদের শান্তি হয় না। অপ্রাপ্ত বস্তুর কামনা এবং প্রাপ্তবস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহ্য-পদার্থ সমূহে এবং শরীর ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে মমত্বজ্ঞান বর্জ্জন করত সমস্তই ঈশ্বরের এই ভাবনা সুস্থির করিয়া যে সাধক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তিনি শান্তিপ্রাপ্ত হন।

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা! ইহা লাভ করিলে আর সংসারের

মোহে মুগ্ধ হইতে হয় না। মৃত্যুকালে ক্ষণকালের জন্যও যিনি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হন তিনিও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা চিরকাল ধরিয়া এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাবান্ তাঁহাদের কথা আর কি বলিব।

-০()০()০—

একবিংশ প্রবন্ধ ।

—:*:*:*:—

কর্ম্মযোগ ।

কর্ম্মফল প্রাপ্তির ইচ্ছাত্যাগ বা কামনাত্যাগই যে একটী প্রধান যোগ তাহা শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। যতক্ষণ সাধক যোগারূঢ় হইতে না পারিবেন ততক্ষণ তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই কর্ম্ম কামনাপরিত্যাগপূর্ব্বক না করিলে সাধক কথনই যোগারূঢ় হইতে পারিবেন না। এই জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার অতএব আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম তুমি সম্যক্-রূপে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা কর। কর্ম্মের ফলে তোমার অধিকার নাই সুতরাং কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করিলেই যে তুমি কৃতকার্য্য হইবে এমন মনে করিও না। এবং কৃতকর্ম্মের ফলকামনা করিও না। আবার কর্ম্মের ফলে তোমার অধিকার নাই বলিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না। কর্ম্ম তিন প্রকার (১) শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, যাহাকে সচরাচর কেবলমাত্র কর্ম্ম বলা যায় ; (২) অকর্ম্ম. অর্থাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ ; (৩) বিকর্ম্ম, অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম। যে কর্ম্ম করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, অর্থাৎ বিকর্ম্ম একেবারেই করিবে না। আলস্য বশত কর্ম্ম পরিত্যাগ বা অকর্ম্ম শাস্ত্রে নিন্দিত, সুতরাং অকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। পরিশেষে কর্ম্মের ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করাই জীবগণের কর্ত্তব্য অতএব তাহাই করিবে।

হে ধনঞ্জয় ! কর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া তুমি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। কর্ম্মের সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমতুল্যভাবে দর্শন করার নাম যোগ। যোগস্থ ব্যক্তি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যদি কৃত-কার্য্য না হন তাহা হইলে দুঃখিত হন না। এবং যদি কৃতকার্য্য হন তাহা হইলেও আনন্দিত হন না।

এই প্রকারে নিষ্কামভাবে এবং ফলনিরপেক্ষ হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে সাধক ক্রমশঃ যোগারূঢ় হন। যতক্ষণ না তিনি যোগারূঢ় হন ততক্ষণ তাঁহার পক্ষে কর্ম্মই একমাত্র সাধনা। এই অবস্থায় তাঁহাকে যোগারুরুক্ষু বলা যায়। উল্লিখিত কর্ম্মযোগরূপ সাধনা দ্বারা যোগারূঢ় হইলে পর সাধক শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল ও সমাহিত হইয়া আপন আত্মাতে পরমাত্মা দর্শন করেন এবং অবশেষে সমস্তই আত্মা বলিয়া দেখিতে পান।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে যোগারূঢ় কাহাকে বলে? তজ্জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন "যখন সাধক ইন্দ্রিয়ভোগ্য সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূন্য হন এবং নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য প্রতিষিদ্ধ কোন কর্ম্মেই তাঁহার প্রবৃত্তি থাকে না এবং ইহলোকে এবং পরলোকে যত প্রকার কামনা হইতে পারে সে সমস্তই তিনি পরিত্যাগ করেন তখন তিনি যোগারূঢ় শব্দবাচ্য হন।"

সংসারে যোগারূঢ় পুরুষ অতি বিরল। সুতরাং সাধারণ সাধকের পক্ষে বুঝিতে হইবে যে কর্ম্মই বিহিত। তবে প্রাকৃত লোকের সহিত সাধকের প্রভেদ এই যে প্রাকৃত লোক ফল-কামনা-পরতন্ত্র হইয়া কর্ম্ম করে কিন্তু সাধকের কর্ম্ম নিষ্কাম।

কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে ৺গীতা বলিয়াছেন—

যাহার পক্ষে যে কর্ম্ম নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত আছে তাহার পক্ষে সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ অকর্ত্তব্য। মোহ বশত নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগকে তামস ত্যাগ বলে। অমুক কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে গেলে আমার শারীরিক ক্লেশ হইবে এই ভয়ে যদি কেহ কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মকে দুঃখজনক মনে করত উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলে। হে অর্জ্জুন! কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে এই ভাবিয়া যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন কিন্তু সেই কর্ম্মানুষ্ঠানে আসক্ত হন না এবং তজ্জনিত কোন ফলেরও কামনা করেন না শাস্ত্র তাঁহাকেই সাত্বিক কর্ম্মত্যাগী বলিয়াছেন।

শ্রুতিও বলিয়াছেন—

যে পর্য্যন্ত সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়া অদ্বৈতজ্ঞান না হয় ততদিন সাধক মনে মনে ভাবিবেন যে এই জগতে যাহা কিছু আছে সে সমস্তেই ঈশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং এই জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে সে সমস্তই ঈশ্বর করিতেছেন এবং ঈশ্বর হইতে পৃথক কিছুই নাই। এই ভাবনা সুস্থির করত সাধক সমস্ত কর্ম্মের ফলাফল ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। যেহেতু ঈশ্বর ব্যতীত কোন বস্তুই নাই এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটে না। অতএব সাধক কোন ধনেরই আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। বাস্তবিক কোন ধনেই কাহারও নিত্য সত্ত্ব নাই। ঈশ্বর যখন যাহাকে যে ধন দেন তখন সে সেই ধন প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বর যখন যাহার নিকট হইতে যে ধন কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা করেন তখন সেই ধন তাহার নিকট হইতে চলিয়া যায়।

কিন্তু ঈশ্বর যাহা করিতেছেন তাহাই হইতেছে, জীবের স্বতন্ত্র কোন ক্ষমতা নাই ইহা বুঝিয়া সাধক কি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন? শ্রুতি বলিতেছেন সাধকের পক্ষে কর্ম্ম পরিত্যাগ বিহিত নহে। অবশ্য সাধক যখন যোগারূঢ় হইবেন তখন তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যতদিন না তিনি যোগারূঢ় হইবেন ততদিন সাধক ফলনিরপেক্ষ হইয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করত যাহাতে সুস্থ শরীরে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন তাহার বিধান করিবেন। কেবল এই ভাবে চলিলেই জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ইহা ব্যতীত কর্ম্মবন্ধন এড়াইবার অন্য উপায় নাই।

আত্মতত্ত্বানুসন্ধানবিমুখ মূঢ়েরা ঈশ্বরকে স্মরণ করে না। তাহারা পুরুষকারকেই সর্ব্বস্ব মনে করে। তাহারা অসুরদিগের গতি প্রাপ্ত হয়। এবং মৃত্যুর পর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অসুরলোকে গমন করে।

ঈশ্বর সমস্ত লোকের এবং সমস্ত ভূতের আত্মা। তাঁহার কখন কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত

একমাত্র পারমার্থিক সত্য। তিনি সর্ব্বব্যাপী সুতরাং মন অপেক্ষা দ্রুতগামী। মন কোন বিষয় ভাবিবার পূর্ব্বেই ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত থাকেন। তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গম্য নহেন। জীবের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন, এবং আস্বাদনশক্তি যতদূর সূক্ষ্ম দ্রব্য অনুভব করিতে পারে তিনি তাহা হইতেও সূক্ষ্মতর। তিনি স্বয়ং নিশ্চল ও অবিক্রিয় হইলেও ধাবমান সমস্ত পদার্থ অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করেন। তিনি নিত্য-চৈতন্যাত্মস্বরূপে সকলের আস্পদভাবে থাকেন বলিয়াই এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকে।

তিনি বাস্তবিক নির্ব্বিকার হইলেও বিকারশীল ভাবে প্রতিভাত হন। তিনি অজ্ঞানীর পক্ষে কোটী কোটী বৎসরেও অপ্রাপ্য কিন্তু ভক্তগণের পক্ষে সুলভ। তিনি সকলেরই আত্মা সুতরাং সকলের অভ্যন্তরে আছেন। সমস্ত জগৎ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সমস্ত জগতের বাহিরে তিনি বর্ত্তমান।

যে সাধক সমস্ত ভূতগণকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সমস্ত ভূতগণে দর্শন করেন তিনি আত্মতত্ত্ব বিদিত হন।

আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া সাধক যখন দেখিতে পান যে এক অদ্বয় আত্মা ভিন্ন আর কোন পদার্থেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, সমস্তই আত্মা মাত্র, তখন তাঁহার দ্বৈতভ্রম বিলুপ্ত হয় এবং তাঁহার পক্ষে শোক ও মোহের কোন কারণ থাকে না। তখন তিনি চৈতন্য-জ্যোতির্ম্ময়, স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর-বর্জ্জিত, অখণ্ড, নির্ম্মল, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবন্ধ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বদর্শী, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বেশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যান।

ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষা এবং ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। যদিও অনেকে বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মজ্ঞানকে নীরস বলেন কিন্তু বাস্তবিক ইহা নীরস নহে। যাঁহারা কখন শর্করা আস্বাদন করেন নাই তাঁহারা শর্করার স্বাদ জানেন না। সেইরূপ যাঁহারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ করিতে পারেন না তাঁহারা আত্মজ্ঞানের রস কি জানিবেন?

কঠোপনিষৎ শ্রুতি বলিয়াছেন—

সেই আত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। সুতরাং

তিনি এক বা অদ্বিতীয়। এই মায়াময় জগৎ তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত। তিনি সমস্ত ভূতেরই অন্তরাত্মা। তাঁহারই জ্ঞানময় রূপ তাঁহারই মায়াবশে দৃশ্যদ্রষ্টা প্রভৃতি নানাভাবে বিবর্ত্তিত হইতেছে। যে সকল সাধকেরা আপনাদিগের মন এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলকে নিবৃত্ত করিয়া আপন আপন হৃদয়াকাশে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহারাই আত্মানন্দরূপ নিত্য সুখ ভোগ করেন। এই পরম সুখ অন্য লোকের ভাগ্যে ঘটে না।

এই সমস্ত অনিত্য জগতে তিনিই একমাত্র নিত্য পদার্থ। যেমন অগ্নি সংযোগে লৌহখণ্ড অগ্নিরূপ ধারণ করে সেইরূপ সেই ব্রহ্মের নিমিত্তই সমস্ত জীবের চেতনা হইয়া থাকে। সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞপুরুষ জীবগণকে আপন আপন কর্ম্মফলরূপ কাম্যবস্তু প্রদান করেন। তাঁহাকে যে সাধকেরা আপনাদিগের হৃদয়াকাশে দর্শন পান, তাঁহারাই নিত্যশান্তি ভোগ করেন অপরের ভাগ্যে তাহা ঘটে না।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিয়াছেন—

সেই ব্রহ্ম বা আত্মাই পূর্ণানন্দ। আত্মজ্ঞানী তাঁহাকে পাইয়া পরমানন্দ ভোগ করেন এবং যাবতীয় জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে যে আনন্দ উপ-ভোগ করে, সেই সামান্য আনন্দমাত্রা সকল পূর্ণানন্দেরই অংশ মাত্র। যদি আত্মা আনন্দময় না হইতেন তাহা হইলে কোন ব্যক্তি আপন আত্মাতে প্রেম করিত? এবং ইহলোকে বা পরলোকে সুখে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিত? বাস্তবিক আত্মাই সকলকে আপন আপন কর্ম্মানুরূপ আনন্দ প্রদান করেন। যখন সাধক এই অদৃশ্য, অশরীর, অনির্দ্দেশ্য, সর্ব্বাধার অথচ স্বয়ং অনাধার, আনন্দ ব্রহ্মকে আপন আত্মা বলিয়া নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারেন, তখন সাধক অভয় হন এবং ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। কিন্তু যতকাল জীব "ব্রহ্ম অন্য এবং আমি অন্য" এইরূপ অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করিবে ততকাল তাহার ভয় থাকিবে। যে সকল পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ এইরূপ ভেদ দর্শন করেন, সেই আনন্দময় ব্রহ্মই তাঁহাদের ভয়ের কারণ হন।

৮ গীতা বলিয়াছেন—

হে ভরতকুলাগ্রগণ্য! এক্ষণে আমার নিকট তিন প্রকার সুখের

বিষয় শ্রবণ কর। অভ্যাসবশতঃ যাহাতে মনুষ্য আনন্দপ্রাপ্ত হয়, যাহাতে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হয়, অভ্যাস বৈরাগ্য যমনিয়মাদি সাধনাপ্রাপ্য বলিয়া যাহা প্রথমে বিষের ন্যায় দুঃখাত্মক বলিয়া বোধ হয় এবং উক্ত সাধনাদি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে পর যাহা অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয় সেই সুখকে সাত্বিক সুখ বলে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে সমুৎপন্ন যে সুখ প্রথমে অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয় কিন্তু পরিণামে যাহা বিষের ন্যায় কষ্টকর তাহাকে রাজস সুখ বলে। নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুদ্ভূত আদি মধ্য ও অন্তে আত্মমোহকর সুখকে তামস সুখ বলে।

বাহ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে আসক্তি শূন্য হইলে তবে আত্মজ্ঞানের সুখ জানা যায়। আত্মজ্ঞানের সুখ জানিতে পারিলে সাধক অন্য সমস্ত সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যমনে ব্রহ্মধ্যানকরত ব্রহ্মে সমাহিতান্তঃকরণ হন এবং অক্ষয় সুখ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিলে যে সুখ বোধ হয় তাহা আদ্যন্তবিশিষ্ট অতএব ক্ষণস্থায়ী এবং তাহা আপাত মধুর হইলেও পরিণামে দুঃখজনক। বিবেকীপুরুষ ঐ প্রকার ভোগে রত হন না।

মরণ কাল পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি ইহলোকে কামক্রোধোদ্ভব বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হন তিনিই যোগী এবং তিনিই বাস্তবিক সুখী। যে যোগী বাহ্য বিষয়ে সুখশূন্য হইয়া কেবল মাত্র আত্মাতেই সুখ এবং আরাম ভোগ করেন এবং যাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা আত্মদর্শনে রত তিনি ইহজীবনে সর্ব্বদুঃখবিমুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকেন এবং দেহত্যাগের পর বিদেহমুক্তি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

যোগী ব্যক্তি নির্জ্জন স্থানে একাকী থাকিয়া চিত্ত এবং দেহকে সংযত রাখিয়া অপ্রাপ্তবস্তুর আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তবস্তুতে মমত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মধ্যানে রত হইবেন।

তিনি পবিত্র স্থানে প্রথমে কুশ তদুপরি ব্যাঘ্রাদি চর্ম্ম এবং তদুপরি বস্ত্র আবৃত করিয়া অনতি উচ্চ ও অনতি নীচ আসন এমন ভাবে প্রস্তত

করিবেন যে তাহার উপর উপবেশন করিলে শরীর চঞ্চল হয় না। অনন্তর সেই আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয় হইতে মন প্রত্যাহার করত এবং ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া সংযত রাখিয়া সমস্ত কামনাশূন্য হইয়া কেবলমাত্র আপন অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইবেন।

শরীরের মধ্যভাগ, মস্তক এবং গ্রীবা সরল ও স্থির ভাবে রাখিয়া যোগী পুরুষ আপনি নিশ্চলভাবে থাকিবেন। তিনি কোন দিকে দৃষ্টি করিবেন না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু নিশ্চল হইয়া এমন ভাবে থাকিবে যেন তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যে তাঁহার দৃষ্টি নাসিকার অগ্রে নিস্পন্দভাবে পতিত রহিয়াছে। তিনি প্রশান্তচিত্ত ভীতিশূন্য এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী হইবেন এবং সমস্ত পদার্থ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত মৎপরায়ণ হইবেন। সংযতচিত্ত হইয়া এইরূপে সর্ব্বদা ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত রাখিতে রাখিতে যোগীপুরুষ ক্রমশঃ মৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বন্ধন মুক্ত হন এবং অনন্তশান্তি লাভ করেন।

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অতি ভোজনশীল অথবা যিনি শরীর ধারণোপযোগী অন্নও ভোজন করেন না, যিনি অতি নিদ্রাশীল এবং যিনি জীবন ধারণোপযোগী পরিমাণেও নিদ্রা যান না তাঁহার যোগসিদ্ধি হয় না। যাঁহার আহার, বিহার (গতি), কর্ম্ম, নিদ্রা, এবং জাগরণ নিয়মিত তিনিই সর্ব্ব-সংসার-দুঃখ-ক্ষয়কর যোগ সাধন করিতে সমর্থ হন।

সাধক যখন সমস্ত পদার্থ হইতে চিত্তকে সংযমন পূর্ব্বক সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করতঃ আত্মাতে সমাধিপ্রাপ্ত হন তখন তাঁহাকে যুক্ত বলা যায়। যোগজ্ঞ পুরুষেরা বলিয়া থাকেন যে আত্মাতে সমাধিপ্রাপ্ত সংযতান্তঃকরণ যোগী পুরুষের চিত্ত নির্ব্বাতপ্রদেশে স্থিত দীপের ন্যায় নিশ্চল ভাবে থাকে।

যোগানুষ্ঠানদ্বারা নিরুদ্ধ যোগীপুরুষের চিত্ত সমাধি অবস্থায় সম্যক্‌ভাবে প্রশান্ত হয়।

সমাধি অবস্থায় যোগীপুরুষ সমাধিপরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা জ্ঞানময় আত্মাকে দর্শন করত আত্মাতেই পরম আনন্দ প্রাপ্ত হন।

যে অনন্ত আনন্দ ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, যে অপার আনন্দ কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করিতে পারা যায়, যোগীপুরুষ সমাধি অবস্থায় সেই বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করেন। সেই অবস্থায় যোগীপুরুষ আত্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাহার পর আর কখনও তিনি সংসার মায়ায় বিমোহিত হন না। অন্য কোনও প্রকার লাভই সমাধি অপেক্ষা অধিকতর সুখকর নহে। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে যে ঘটনা অতীব দুঃখকর সে ঘটনা ঘটিলেও সমাধিপ্রাপ্তি দ্বারা আত্মজ্ঞ যোগীপুরুষ কিছুমাত্র বিচলিত হন না। সমাধি প্রাপ্তির পর যোগীপুরুষ যতদিন বাঁচিয়া থাকেন, জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকেন। কোন প্রকার দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। এই সমাধিকে যথার্থ যোগ বলা যায়। শাস্ত্রবাক্যের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া শাস্ত্রোক্তমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক নিঃসন্দেহচিত্তে সমাধিযোগ অভ্যাস করা সকল জীবের কর্ত্তব্য। এই যোগ সহজে এবং শীঘ্র সিদ্ধ হয় না। যোগসিদ্ধ হইতে কাহারও বা একজন্ম কাহারও বা বহু জন্ম লাগে। সাধনার তীব্রতার তারতম্যের উপর যোগসিদ্ধির কাল নির্ভর করে। সুতরাং সমাধিযোগ শীঘ্র আয়ত্ত না হইলে সাধক বিষণ্ণ হইবেন না। কিন্তু তিনি অনির্ব্বিণ্নচিত্তে অধ্যবসায়সহকারে যোগসিদ্ধির জন্য তপস্যা করিবেন অর্থাৎ যোগ সিদ্ধির জন্য শাস্ত্রে যে প্রণালী বিহিত আছে সেই প্রণালী অবলম্বন করত যোগাভ্যাস করিতে থাকিবেন। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে ইহজন্মেই হউক বা কোন ভবিষ্যৎ জন্মেই হউক সাধক নিশ্চয়ই যোগসিদ্ধ হইবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি এই বাক্য সিদ্ধ হইল।

——*:**:*——

দ্বাবিংশ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

তৃতীয় সূত্রের অন্য প্রকার অর্থ।

কেহ কেহ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই তৃতীয় সূত্রের অন্য প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই দ্বিতীয় সূত্রদ্বারা ব্রহ্মের কেবল তটস্থলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। যাঁহা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাঁহাতে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাঁহাতে এই জগৎ লয় পাইবে তিনিই ব্রহ্ম এরূপ বলাতে এমত নাও বুঝাইতে পারে যে জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয় কারণ চেতন এবং সর্ব্বজ্ঞ। এমন হইতে পারে যে কোন অনির্ব্বচনীয় জড় পদার্থ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাতেই ইহা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পরিশেষে তাহাতেই ইহা লয় পাইবে। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলা হইল যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ জড় নহেন পরন্তু চেতন এবং সর্ব্বজ্ঞ; এবং তাহার কারণ বলা হইল "শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ"। শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ কারণ শাস্ত্রযোনি। শাস্ত্রযোনির ভাব শাস্ত্রযোনিত্ব। হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তিতে শাস্ত্রযোনিত্বাৎ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। সমুদয় সূত্রের অর্থ এই যে, সর্ব্ববিদ্যার আকর ঋগ্‌বেদাদি মহাশাস্ত্র সকল যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি চেতন এবং সর্ব্বজ্ঞ। সচরাচর দেখা যায় কোন গ্রন্থে যে সকল বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় উক্ত গ্রন্থের লেখকের সে সকল বিদ্যা ত আছেই, বরং তাহা অপেক্ষা গ্রন্থকারের অধিক বিদ্যা আছে। সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞকল্প বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র সকল যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি জড় এবং অল্পজ্ঞ হইতেই পারেন না, তিনি অবশ্যই চেতন এবং সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। ব্রহ্মের এই লক্ষণ দ্বিতীয় সূত্রে উপক্ষিপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলা হইয়াছিল কিন্তু তাহা এই তৃতীয় সূত্রে পরিষ্কার ভাবে উক্ত হইল। গায়ত্রীতেও এই দুই ভাব পৃথক্ করিয়া ব্যক্ত আছে যথা—"এই সমস্ত জগতের যিনি প্রস-

বিতা, যিনি চিন্ময়, আমরা তাঁহার স্বরূপভাব ধ্যান করি; তিনি আমাদের বুদ্ধিকে তাঁহার ধ্যানে নিয়োগ করুন"।

ব্রহ্ম হইতে বেদবেদান্তাদির উদ্ভূত হওয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে অতি স্পষ্টভাবে কথিত আছে যথা—

হে মৈত্রেয়ী! যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে ধূম বিস্ফুলিঙ্গাদি বিনির্গত হয় সেইরূপ মহাভূত পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ এই চারি বেদোক্ত মন্ত্র সকল, এবং (১) ইতিহাস, (২) পুরাণ, (৩) আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিদ্যা, (৪) আধ্যাত্মিক বিদ্যা, (৫) ব্যাখ্যাত্মক শ্লোক, (৬) সূত্র, (৭) সূত্রের বিচার এবং (৮) সাধারণ ব্যাখ্যা, এই অষ্টবিধ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদের শ্লোকাত্মক অংশকে মন্ত্র বলে এবং বেদের ব্যাখ্যাত্মক অংশকে ব্রাহ্মণ বলে। মন্ত্রে যাহা অল্প কথায় থাকে ব্রাহ্মণে তাহা বিস্তারিত ভাবে থাকে। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ সমন্বিত বেদ সকলকে সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরকে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। জীবগণ যেমন বিনা আয়াসে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে ঈশ্বর সেইরূপ বিনা প্রযত্নে বেদ সকলকে প্রকটিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত বাক্যসকল প্রত্যক্ষের অথবা অনুমানের অথবা বেদের বিরুদ্ধ হইলে অপ্রমাণ হয়। বেদ কিন্তু অন্য প্রমাণ অপেক্ষা করে না। বেদে যাহা কথিত আছে তাহা স্বতঃই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। কোন স্থলে যদি বেদের কোন অংশকে প্রত্যক্ষ শব্দ বা অনুমানমূলক কোন অংশের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে সেই অংশ অপ্রমাণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে না। সেখানে বুঝিতে হইবে যে, হয় আমরা বেদের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছি না অথবা মরীচিকা দর্শনের ন্যায় আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শনে কোন প্রকার ভ্রম আছে অথবা আমাদের শব্দজ্ঞানে বা অনুমানে কোনরূপ প্রমাদ হইয়াছে। বাস্তবিক বেদ নির্ভুল এবং অন্য প্রমাণ নিরপেক্ষ। এই সপ্রমাণ বেদ যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ।

তৃতীয় সূত্রের এই অর্থ গ্রহণ করিলেও ইহা প্রতিপন্ন হয় যে সত্য,

জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্মই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারাই উক্ত ব্রহ্মকে জানা যায়, উক্ত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এই জগৎ মায়াময় কিন্তু অবিদ্যা বশতই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, ঐ অবিদ্যা ঘুচাইবার জন্য শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত হইয়া সদ্‌গুরুর শরণগ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা এবং বেদান্তবিহিত মার্গে ব্রহ্মের উপাসনা করাই জীবগণের কর্ত্তব্য এবং উক্ত সাধনা দ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহে অবিদ্যা ঘুচিয়া অদ্বৈত জ্ঞান হইলে জীব পরমানন্দ বা অক্ষয় শান্তি বা মোক্ষপদ লাভ করেন।

কেহ কেহ বলেন যে যদি চিরকাল ধরিয়া ঈশ্বরের উপাসনাই করিলাম তবে উপাসনার ফল ভোগ করিব কবে? এই উক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর। এবং প্রথমসূত্রেই ইহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা উপাসনা করিয়া জাগতিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী নহেন। বেদান্তশাস্ত্র সর্ব্বোচ্চ স্বর্গসুখ এবং সর্ব্বনিম্ন নরকদুঃখ উভয়কেই পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেন। বিশেষতঃ এই মায়াময় জগতের নিয়ম এই যে যাঁহারা সুখের জন্য লালায়িত হইয়া কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম করেন তাঁহাদের ভাগ্যে সুখ ঘটে না। যথার্থ সুখ পাইতে হইলে সুখের আকাঙ্ক্ষা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর উপাসনা করিলাম তাহার বদলে আমার সুখ চাই এইরূপ দোকানদারী ভাব ঘৃণার সহিত দেখিতে হইবে। সুখদুঃখে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কেবল মাত্র ঈশ্বরকেই সার সর্ব্বস্ব মনে করিতে হইবে। এরূপ ভাবনা সুস্থির হইলে তখন দেখিতে পাইবে উপাসনা করাই সুখ এবং কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে সাধককে সাংসারিক ব্যাপারেও কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যাঁহারা অনন্যভাবে আমাকে চিন্তা করত কায়মনোবাক্যে আমার উপাসনা করেন সেই মদেকনিষ্ঠ ভক্তগণের যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য না থাকে তাহা আমি তাঁহাদিগকে প্রদান করি এবং তাঁহাদের যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য থাকে তাহা আমি তাঁহাদের জন্য সংরক্ষণ করি।

কিন্তু উপাসনায় সুখ আছে বলিয়া সেই সুখের জন্য উপাসনা করিবে না। সেরূপ করিলেও দোকানদারী ভাব থাকিবে। সুখের কথা একেবারে মনে না আনিয়া শাস্ত্রের বিধি প্রতিপালনের জন্য উপাসনা করিতে থাকিবে এবং শাস্ত্রের আলোচনা করিবে। এইরূপ করিতে করিতে কোন না কোন কালে অদ্বৈত বা মোক্ষ বা অক্ষয় সুখ পাইবে। কিন্তু মোক্ষ পাইব এই আকাঙ্ক্ষা করাও নিষিদ্ধ। আকাঙ্ক্ষা করিলেই তপস্যার প্রত্যবায় হয়। কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া শাস্ত্রের বিধি প্রতিপালন করিয়া চলিবে। যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইবে তখন তিনি অদ্বৈতজ্ঞান দিবেন তজ্জন্য কিছুমাত্র উৎসুক হওয়া উচিত নহে।

আবার কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে মরণ কাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া যদিকোন সাধক অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম না হন তাহা হইলেও তাঁহার তপস্যার কষ্টভোগ করিয়া কি হইল? ইহার উত্তরও ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

প্রাকৃতলোকের দৃষ্টিতে তপস্যা ক্লেশকর বটে কিন্তু তপস্যা বাস্তবিক ক্লেশকর নহে। এমন কি প্রাকৃতলোক সাংসারিক বিষয়ে যে আনন্দ উপভোগ করে প্রকৃত সাধক তপস্যাতে তাহার শতগুণ আনন্দ উপভোগ করেন। বিশেষতঃ এই শরীরের সঙ্গেই জগৎ শেষ হয় না। স্থূলশরীর ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর মুক্তি অথবা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। সুতরাং শাস্ত্রমত তপস্যা করিলে সাধক কোন না কোন জন্মে অবশ্যই অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিবেন। যদি শাস্ত্রমত বরাবর তপস্যা করিতে না পারিয়া সাধক কখন যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়েন তাহা হইলেও তিনি প্রবৃত্তিমার্গস্থ জীব অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করেন এবং অনেক অধিক আনন্দ উপভোগ করেন। ৬ গীতায় এই বিষয় অতি স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে যথা—

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! কোনও শ্রদ্ধাশীল নিবৃত্তিমার্গস্থ সাধক অদ্বৈতজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে যদি কোন কারণে কখন যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়েন তবে তাঁহার কি গতি হইবে?

প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন

করণানন্তর বিমূঢ় হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির মার্গ পরিত্যাগ করায় সুতরাং প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায়, তিনি কি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবেন এবং ছিন্নাভ্রের ন্যায় নাশ প্রাপ্ত হইবেন?

হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সন্দেহটী সম্পূর্ণভাবে অপনয়ন কর। তুমি ভিন্ন আর কেহ এই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবেন না।

ভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! ইহজন্মেই বল আর পরজন্মেই বল নিবৃত্তিমার্গস্থ সাধক কখন হীনতা বা দুর্গতি প্রাপ্ত হন না।

যদি তিনি নিবৃত্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হন তাহা হইলে তিনি ততদিন পর্য্যন্ত যে তপস্যা করিয়াছেন তাহার ফলে অশ্বমেধাদি কর্ম্মকারীদিগের প্রাপ্য স্বর্গলোকে গমন করেন এবং তথায় ভোগদ্বারায় পুণ্যক্ষয় হইলে সদাচারশালী ধনীব্যক্তির বংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।*

কিন্তু যোগভ্রষ্ট হইবার পূর্ব্বে যদি তাঁহার তপস্যা বেশী হইয়া থাকে তাহা হইলে আর তাহাকে স্বর্গলোকে বা ধনীব্যক্তির বংশে যাইতে হয় না। তিনি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পূর্ব্বজন্মের ব্রহ্মানুসারিণী বুদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং সংসিদ্ধির জন্য পুনরায় অধিকতর যত্ন করেন।

তিনি যে পাপের জন্য যোগভ্রষ্ট হইয়া থাকেন ভোগের দ্বারা তাহা ক্ষয় পাইলে পরে নিবৃত্তিমার্গে তিনি আপনা হইতে যাইতে ইচ্ছা না করিলেও তাঁহার পূর্ব্বসংস্কার তাঁহাকে বলপূর্ব্বক যোগের পথে লইয়া যায়। নিবৃত্তি মার্গের কথা অধিক কি বলিব। যাঁহারা যোগের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করিয়া যোগমার্গে প্রবৃত্ত হওয়ার পরেই যোগভ্রষ্ট হন তাঁহারাও বেদোক্ত কর্ম্মফলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠফল প্রাপ্ত হন।

*ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিহিত প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, জীব যতদিন অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে তত দিন আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করে। সেই কর্ম্মফল ভোগ ইহজন্মেই শেষ হয় না। মৃত্যুর পরে এবং প্রলয়ের পরেও কর্ম্মফল ভোগ হয়। কেবল একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সমস্তই নষ্ট হয়। যদি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হয় তাহা হইলে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জীব আপন কর্ম্মফল ভোগ করত সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে।

যোগীপুরুষ অনেক জন্ম যত্ন পূর্ব্বক তপস্যা করিয়া ক্রমশঃ পাপ-পুণ্যমুক্ত হইয়া অবশেষে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেন এবং মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

সুতরাং অবিচলিতচিত্তে, বেদান্তাদি শাস্ত্রের আলোচনা এবং ঈশ্বরের উপাসনাই মুমুক্ষু জীবের প্রধান কর্ত্তব্য এবং অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ইতি তৃতীয় সূত্র।

—:*:*:*:—

ত্রয়োবিংশ প্রবন্ধ।

—:*:*:—

ক্রিয়াই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মোপদেশ বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, এই প্রকার আশঙ্কা ও চতুর্থসূত্র।

তৃতীয় সূত্রে দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ এবং উক্ত জ্ঞানই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কিন্তু বেদের মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে অনধিকারী কোন কোন শাস্ত্র ব্যবসায়ীরা মনে করেন যে কর্ম্মকাণ্ডই বেদের প্রামাণ্য অংশ এবং জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ডের একটী অঙ্গ মাত্র। কোন একটী বিহিত কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া অথবা কোন একটী নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিষেধ করাই তাঁহাদের মতে শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহারা বলেন যে শাস্ত্র কেবলমাত্র বিধি নিষেধেরই ব্যবস্থা করেন। রামের পর শ্যাম রাজা হইয়াছিল, হরি একশত বৎসর বাঁচিয়াছিল, রাখাল এবং বলরাম পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে রাখাল মরিয়াছিল ইত্যাদি বাক্যে কোন প্রকার প্রয়োজন দেখা যায় না। কোনরূপ প্রয়োজন না থাকিলে শাস্ত্র অনর্থক ঐ প্রকার বাক্য বলিবেন কেন? সুতরাং শাস্ত্রে ঐরূপ বাক্য দেখিলে বুঝিতে হইবে যে কোন একটী প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্র ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছেন, কেবল মাত্র ঐ সমস্ত বাক্য বলা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। ঐ উপদেশটী কি তাহা জানা কর্ত্তব্য; এবং ঐ উপদেশের দ্বারা যদি কোন কর্ম্ম করা উচিত বলিয়া বিহিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই বিধি প্রতিপালন করিবে; আর যদি উহা দ্বারা কোন কর্ম্ম নিষেধ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। উক্ত বিধি বা নিষেধই ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য; এবং ঐ বাক্য স্বয়ং অপ্রমাণ। ব্রহ্ম আছেন, ব্রহ্ম নির্গুণ, ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রভৃতি বাক্যও ঐরূপ

স্বয়ং অপ্রমাণ। শাস্ত্রে ঐ প্রকার বিধি-নিষেধ-সংস্পর্শ-বিহীন বাক্য দেখিলে বুঝিতে হইবে যে কেবল ঐ প্রকার বাক্য বলা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে; কোন একটী বিধি বা নিষেধের ব্যবস্থা করিবার জন্যই শাস্ত্র ঐ সকল বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। বৃক্ষ, লতা, ঘর, বাটী, দ্রব্য, সামগ্রী, শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যত কিছু স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ আছে সে সমস্তই ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য। সুতরাং তাহাদের উপদেশের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। বিধি নিষেধ স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা অনুমানের দ্বারা তাহা জানা যায় না। সুতরাং বিধি নিষেধ জানিতে হইলে শাস্ত্রের প্রয়োজন। যাহা কেহ জানে না, যাহা অন্য উপায়ে জানা যায় না, শাস্ত্র কেবল তাহাই জানান।* আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য অথবা অনুমানগম্য। অতএব আত্মতত্ত্বের উপদেশের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্ম বা আত্মা একটী স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ হওয়ায় কেবলমাত্র তদ্বিষয়ক জ্ঞান লইয়া কি হইবে? যতক্ষণ না উক্ত জ্ঞান হেতু কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম করা যায়, বা কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়, ততক্ষণ উক্ত জ্ঞান কোন কাজেই লাগে না। সুতরাং ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া বেদান্তশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। ক্রিয়াই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য বা প্রতিপাদ্য। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে জৈমিনী মুনি বিচার পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন (১)† ক্রিয়ার জ্ঞান জন্মানই উপদেশ, (২) ‡ সেই জন্য বেদে যে সকল সিদ্ধ বস্তুর কথা আছে ক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়াই তাহাদের উল্লেখ হইয়াছে। যথা বেদে যূপকাষ্ঠের উপদেশ আছে। যজ্ঞার্থে পশু বন্ধনের জন্য যূপকাষ্ঠের প্রয়োজন। যজ্ঞক্রিয়ার উপদেশই বেদের উদ্দেশ্য, এবং যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়াই যূপকাষ্ঠের উল্লেখ। স্বতন্ত্রভাবে যূপকাষ্ঠের উপদেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং বুঝিতে হইবে বেদে স্বতন্ত্রভাবে কোন সিদ্ধ বস্তুর উপদেশ

---

* অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্।

† তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ।

‡ তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ।

নাই। যে সকল সিদ্ধ বস্তুর কথা বেদে আছে কোন না কোন ক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়াই তাহাদের উপদেশ আছে। নতুবা ঐ সকল বস্তুর উল্লেখ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না এবং নিষ্প্রয়োজনে শাস্ত্র ঐ সকল বস্তুর উল্লেখ করিতেন না।

(৩) * ক্রিয়াই বেদের প্রতিপাদ্য এবং বেদোক্ত বিধি নিষেধই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য; বেদের যে উক্তির সহিত বিধি নিষেধের সংস্রব নাই তাহা অনর্থক সুতরাং অপ্রমাণ (৪) † সেই রুদ্র রোদন করিলেন; তাহাতে তাঁহার অশ্রুপাত হইল। তাহাতে রজত (রূপা) হইল। বেদে এইরূপ একটী গল্প আছে। ঐ গল্পের শেষে রজতের নিন্দা আছে। কিন্তু ঐ গল্পের কোন অংশে কোন প্রকার বিধি নিষেধ নাই। এইরূপ আখ্যায়িকা সকল একেবারে নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজনীয় এ কথাও বলা যায় না। অবধান সহ পরীক্ষা করিলেই দেখা যায় যে ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা কোন না কোন একটী বিধির সহিত একবাক্য; অর্থাৎ যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে উক্ত আখ্যায়িকা সকলে কোন প্রকার বিধি বা নিষেধ নাই, কিন্তু ঐ সকল আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য অবধারণ করিলেই বুঝা যায় যে ঐ আখ্যায়িকা সকল কোন না কোন একটী বিধি বা নিষেধ বাক্যের পোষণ করে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ঐ আখ্যায়িকা সকল বিধি বা নিষেধের স্তুতিকারক; অর্থাৎ কোন না কোন একটী বিধি বা নিষেধ বাক্যের স্তুতি করাই আখ্যায়িকাসমূহের উদ্দেশ্য, এতদ্ভিন্ন আখ্যায়িকার স্বতন্ত্র কোন অর্থ নাই। আখ্যায়িকার বাক্য সকল যে অর্থ প্রতিপাদন করে সে অর্থ অপ্রমাণ। তাৎপর্য্য অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায় সেই অর্থই প্রামাণ্য। উপরিলিখিত রুদ্ররোদন সংবাদে রজতের নিন্দা থাকায় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ঐ যজ্ঞে রজত দিতে নাই, ইহা বিধান করাই ঐ গল্পের প্রামাণ্য অংশ। রোদন, অশ্রুপাত, তাহা রূপা হওয়া এ সকল অর্থ

* আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্।

† সঃ অরোদীৎ ইত্যাদিনাং আনর্থক্যং মাভূৎ ইতি বিধীনাং তু একবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।

অপ্রমাণ এবং অগ্রাহ্য। যেমন বালকবালিকাগণকে পশুপক্ষীর কথোপকথন সম্বলিত উপন্যাস বলিয়া বিশেষ বিশেষ বিধি ও নিষেধের উপদেশ হিতোপদেশাদি গ্রন্থে দেওয়া আছে, মনুষ্যগণকেও সেইরূপ আখ্যায়িকাগণ দ্বারা শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধি নিষেধের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পশুপক্ষীর কথা কহা, বিচার করা প্রভৃতি যেমন সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, শাস্ত্রের আখ্যায়িকাগণও সেইরূপ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

পুরাণ প্রভৃতিতেও ঐ প্রণালীর অনুসরণ করা হইয়াছে। শম দম প্রভৃতি কাহাকে বলে তাহাদের মধ্যে কোনগুলি শাস্ত্রের অভিমত, অতএব উপাদেয় অর্থাৎ পালনীয়, এবং কোনগুলি শাস্ত্রের অনভিমত, অতএব হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য, তাহার উপদেশ দেওয়া শ্রীমদ্ভাগবতকারের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ বলিয়া একটী আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া উদ্ধবের মুখ দিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করাইয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া তাহাদের উত্তর দেওয়াইয়াছেন। যথা—

উদ্ধব কহিলেন—হে শত্রুকর্ষণ! যম কয় প্রকার? নিয়মই বা কি কি? হে কৃষ্ণ! শম, দম, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষাই বা কাহাকে বলে? দান কি? তপস্যা কি? শৌর্য্য কি? সত্য ও ঋত কাহাকে কহে? ত্যাগ কি? ইষ্টধন কি? যজ্ঞ কি? দক্ষিণা কি? হে শ্রীমন্! পুরুষের বল কি? হে কেশব! ভগ কি? লাভ কি? উৎকৃষ্ট বিদ্যা, হ্রী ও শ্রী কি? সুখ কি? দুঃখই বা কি? পণ্ডিত কে? মূর্খ কে? পথ কি? উৎপথই বা কি? স্বর্গ কি? নরকই বা কি? বন্ধু কে? গৃহই বা কি? ধনী কে? কেই বা দরিদ্র? কৃপণ কে? ঈশ্বর কে? হে সাধুপতি! আমার এই সকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা কর এবং ইহার বিপরীত অর্থ সকলও আমার নিকট ব্যক্ত কর।

ভগবান্ কহিলেন—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, হ্রী, অনাসক্তি, অসঞ্চয়, শাস্ত্রে স্থিরবিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা ও অভয় এই দ্বাদশটী যম আর বাহ্য শৌচ, অভ্যন্তরশৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, ধর্ম্মে আদর, আতিথ্য, আমার পূজা, তীর্থ ভ্রমণ, পরের নিমিত্ত চেষ্টা করা, সন্তোষ এবং আচার্য্যের সেবা করা, এই দ্বাদশটী নিয়ম। হে তাত! এই সকল যম ও

নিয়ম পালন করিলে প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বী ব্যক্তিরা আপন অভীষ্টমত অভ্যুদয় প্রাপ্ত হন এবং নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী সাধকগণ মুক্ত হন। আমাতে বুদ্ধিনিষ্ঠা শম; ইন্দ্রিয়সংযম দম; দুঃখসহন তিতিক্ষা; জিহ্বা ও উপস্থজয় ধৈর্য্য; দ্রোহীকে দণ্ড করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ পরম দান; কাম বিসর্জ্জনই তপস্যা; স্বভাব বিজয় ধীরতা; সমদর্শন সত্য; সুনৃত অর্থাৎ সত্য এবং প্রিয়বাক্য (অর্থাৎ যে সত্য বাক্য প্রিয়ভাবে কথিত হয় তাহা) ঋত; কর্ম্মে অনাসক্তি এবং কর্ম্মফল ত্যাগরূপ শৌচই পরম সন্ন্যাস বা ত্যাগ; ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের ইষ্টধন; পরমেশ্বর আমিই যজ্ঞ সুতরাং আমার উপাসনা করাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ; জ্ঞানোপদেশ দক্ষিণা; প্রাণায়ামই উৎকৃষ্ট বল, যেহেতু প্রাণায়াম দ্বারা মন দমন করা যায়; আমার ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণ ভগ; আমার প্রতি ভক্তি উত্তম লাভ; আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় ও স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত এই জ্ঞান বিদ্যা; অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম পরিত্যাগকে হ্রী বলে, কেবল মাত্র লজ্জা হ্রী নহে; নিরপেক্ষতা গুণই শ্রী, কিরীটাদি অলঙ্কার শ্রী নহে; সুখ দুঃখ পরিত্যাগই সুখ; বিষয়ভোগবাসনা দুঃখ; বন্ধমোক্ষাভিজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত; দেহাদিতে অহং জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মূর্খ; যে নিবৃত্তিমার্গ দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় তাহাই পথ; চিত্ত বিক্ষেপজনক প্রবৃত্তিমার্গ উৎপথ; সত্ত্বগুণের উদ্রেক স্বর্গ; তমোগুণের উদ্রেক নরক; হে সখে! গুরুই বন্ধু এবং আমিই জগদ্‌গুরু অতএব পরমবন্ধু; মনুষ্যদেহ গৃহ; গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই আঢ্য; অসন্তুষ্ট ব্যক্তি দরিদ্র; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ অর্থাৎ শোচ্য; যাঁহার চিত্ত বিষয় সমূহে অনাসক্ত তিনিই ঈশ্বর; গুণগণে যাঁহার আসক্তি তিনি অনীশ্বর; অনীশ্বর শব্দ এবং ঈশ্বর শব্দ পরস্পর যেরূপ বিপর্য্যয়বাচী সেইরূপ শমাদির বিপর্য্যয় ভাব বুঝিয়া লও। হে উদ্ধব! তোমার প্রশ্ন সমূহের মোক্ষোপযোগী ব্যাখ্যা এইরূপ। গুণ ও দোষের লক্ষণ আর বাহুল্য সহকারে কি বর্ণন করিব? গুণ এবং দোষ দর্শনই দোষ ও গুণ এবং দোষ উভয় দর্শন পরিত্যাগই গুণ।

এই আখ্যায়িকায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত উদ্ধবের কথোপকথন অপ্রমাণ।

কিন্তু ঐ কল্পিত কথোপকথনে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রামাণ্য। শাস্ত্রোক্ত ফলশ্রুতিও ঐরূপ। যেমন একটী পীড়িত শিশুকে তিক্ত ভেষজ খাওয়াইবার জন্য ভেষজটীকে শর্করার আবরণ মধ্যে রাখিয়া শিশুর ভোজনার্থে দেওয়া হয়, সেইরূপ মনুষ্যকে বিধি নিষেধের বশবর্ত্তী করিবার জন্য শাস্ত্র বলেন অমুক পুণ্য কর্ম্মের অমুক শুভফল, অমুক পাপ কর্ম্মের অমুক দণ্ড। অমুক কর্ম্ম কর্ত্তব্য বা অমুক কর্ম্ম পরিত্যাজ্য, এই উপদেশ দেওয়াই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু কেবলমাত্র "ইহা কর বা ইহা করিও না" বলিলে দুর্ব্বলচিত্ত মানব অনেক সময় সেই বিধি নিষেধ বাক্যগুলি সম্যক্ পালন করিতে পারে না। সেই জন্য শাস্ত্র ফলশ্রুতির নির্দ্দেশ করিয়া উপদেশগুলিকে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞানবান্ তাঁহারা "বিধি প্রতিপালনই ধর্ম্ম" এবং "ধর্ম্মই পরম হিতকর" ইহা জানিয়া বিধি নিষেধ বাক্যগুলি সম্যক্ পালন করেন। এবং যাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন, তাঁহারা ফলশ্রুতির প্ররোচনায় বা ভয়ে বিহিত কর্ম্ম করেন এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। আরও "অমুক সময়ে বা অমুক দেশে এই প্রকার ঘটনা হইয়াছিল তজ্জন্য মনুষ্য বিশেষের বা মনুষ্য সমাজের এই প্রকার উন্নতি বা অবনতি হইয়াছিল, সুতরাং অমুক কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং অমুক কর্ম্ম অকর্ত্তব্য" এই প্রকারে সমস্ত উন্নতি এবং অবনতির কারণ প্রদর্শন করা অসংখ্যক লোকের বা সমাজের বা দেশের ইতিহাসের দ্বারা হইতে পারে না। সেই জন্য শাস্ত্র দুই চারি আদর্শ পুরুষ ও সমাজকে অবলম্বন পূর্ব্বক নানা-বিধ উপদেশ দিয়াছেন। ঐ উপদেশগুলিই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। আদর্শ পুরুষ বা সমাজগণের ইতিহাসগুলির দিকে শাস্ত্রের লক্ষ্য থাকে না, সুতরাং সেগুলি অপ্রমাণ।

বেদে এবং পুরাণে অনেক স্থলেই দেবাসুরের সংগ্রামের উল্লেখ আছে। বাস্তবিক দেবাসুরের সংগ্রাম বর্ণনা করা উক্ত শাস্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য নহে। জীব ও সমাজগণের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে "অসুর" ভাবে এবং শাস্ত্রানুসারিণী বৃত্তিগুলিকে "দেব" ভাবে বর্ণনা করিয়া বেদ ও পুরাণ

দেখাইয়াছেন যে, স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি শাস্ত্রানুসারিণী বৃত্তিগুলিকে স্বভাবতঃ পরাজয় করে। তবে শাস্ত্রের বিধি পালন এবং ঈশ্বরের ভজনা দ্বারা শাস্ত্রানুসারিণী বুদ্ধি বলীয়সী হইলে স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ নিগৃহীত হয়।

অনেকে গোপিনী-কৃষ্ণ সংবাদের যথার্থ মর্ম্ম অবগত না হইয়া উক্ত সংবাদে কেবল মাত্র পাপাচরণ সন্দর্শন করেন। বাস্তবিক সন্ন্যাস ধর্ম্মের ওরূপ জলন্ত দৃষ্টান্ত আর হইতে পারে না। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মোচন করিব। আমার জন্য সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও শোকের কোন কারণ হয় না"।

সমাজে ঘোরতর নিন্দা এবং সংসারের কঠিন বন্ধন সকল একেবারে তুচ্ছ করিয়া ভক্ত কিরূপে আপন সর্ব্বস্ব ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক একেবারে তন্ময় হইবেন তাহার দৃষ্টান্ত গোপিনী-কৃষ্ণ-সংবাদ ভিন্ন অন্য প্রকারে দেওয়া অসম্ভব। উক্ত ভাবে ঈশ্বরে প্রেম করা কর্ত্তব্য ইহাই উক্ত সংবাদের প্রতিপাদ্য। উক্ত সংবাদের বিবৃত ঘটনাগুলি সমস্তই অপ্রমাণ।

এইরূপে বিচার করিয়া কোন কোন শাস্ত্রব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত করেন যে, ক্রিয়াই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। বেদান্তশাস্ত্রের বিধি নিষেধ প্রতিপালন করিলে মনুষ্য ক্রমশঃ শারীরিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। বেদান্ত শাস্ত্রোক্তরূপে উপাসনা ও অন্যান্য ক্রিয়া (যথা যজ্ঞ, পরোপকার, সদাচার, সর্ব্বভূতে দয়া, মিথ্যা কথা না কহা, পরদ্রব্যে অভিলাষ না করা, জিতেন্দ্রিয় হওয়া ইত্যাদি) এবং বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করিলেই শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হয়। সুতরাং আলোচনা, উপাসনা ও অন্যান্য ক্রিয়ার বিধান করা এবং ক্রিয়ার অঙ্গরূপে দেবতা, দ্রব্য এবং কর্ত্তার বিষয় উপদেশ দেওয়াই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এই শ্রেণীস্থ শাস্ত্রব্যবসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য সকলের সহিত বিধি নিষেধের সংস্পর্শ না থাকায় ঐ বাক্যগুলি নিরর্থক ও অপ্রমাণ এবং ব্রহ্ম বলিয়া কোন

ব্যক্তি বা পদার্থই নাই। সুতরাং ব্রহ্মের ধ্যান বা উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, পরোপকার, দয়া, ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধান সকল মানিয়া চলিলেই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ প্রতিপালন করা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে যদিও বাস্তবিক ব্রহ্ম বলিয়া কোন পদার্থ নাই তথাপি বেদান্ত শাস্ত্র একটী নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, পুরুষের কল্পনা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন যে,তোমরা এই আদর্শধ্যেয় পুরুষের ধ্যান করিতে থাক, এই পরম উৎকৃষ্ট পুরুষকে ধ্যান করিতে করিতে তোমাদের সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইবে এবং তোমরা নির্ব্বাণ পাইবে। আবার ঐ শ্রেণীস্থ অপর কেহ কেহ বলেন যে ঐ বাক্যগুলি একেবারে নিরর্থক ও অপ্রমাণ নহে এবং ব্রহ্ম নাই এ কথাও সত্য নহে। তবে ব্রহ্ম জগতের কারণ, জগৎ মায়াময়, চিন্ময় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, প্রভৃতি তথ্য সকলের উপদেশ দেওয়া বেদান্তশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য নহে। যেমন যজ্ঞ-ক্রিয়ার উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইলেও যজ্ঞসম্পাদনের জন্য পশু-বন্ধন বিহিত, এবং পশুবন্ধনের জন্য যূপকাষ্ঠের প্রয়োজন হওয়ায় পশু এবং যূপকাষ্ঠের উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত মোক্ষপদ পাইবার জন্য নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা ক্রিয়ার বিধানই শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, এবং তজ্জন্যই ব্রহ্ম কি পদার্থ ইত্যাদি উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। কেবল-মাত্র স্বরূপ ভাবে ব্রহ্মকে জান ইহা শাস্ত্রের বিধান নহে। পরন্তু ব্রহ্মকে মোটামুটী বা পরোক্ষ বা তটস্থ ভাবে জানিয়া ব্রহ্মের উপাসনা কর ইহাই শাস্ত্রের বিধান। সুতরাং প্রথমে ব্রহ্মের উপাসনা কর, তৎপরে ব্রহ্মকে জান, এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই জীব মুক্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষ একই কথা, এইরূপ উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। ব্রহ্ম উপাসনা কর, ইহাই বিধি, এবং বাস্তবিক ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

"প্রথমে ব্রহ্মকে তটস্থ বা পরোক্ষ বা মোটামুটী ভাবে জান, তৎপরে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে থাক, এবং উপাসনার ফলে অবশেষে মোক্ষপদ পাইবে এই কথাই সত্য,"—এই উক্তি সমর্থনের জন্য শেষোক্ত শ্রেণীর শাস্ত্রব্যবসায়ীরা নিম্নলিখিত হেতু প্রদর্শন করান।

শাস্ত্র বলিয়াছেন আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, এবং নিদিধ্যাসিতব্য। সুতরাং আত্মদর্শনের পর আত্মার বিষয় শ্রবণ করিবে, তাহার পর আত্মার বিষয় বিচার করিবে এবং অবশেষে আত্মার ধ্যান করিবে। অতএব আত্মার ধ্যানের বিধানই শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, ব্রহ্ম কি বস্তু তাহার উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য নহে। বিশেষতঃ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান জীবের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, জড়পদার্থ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা অনুভব করিতে পারি, তাহা বাস্তবিক বস্তু নহে পরন্তু শক্তির বিকাশ বা গুণমাত্র। মনে কর, আমি একখণ্ড কাষ্ঠ দেখিতেছি। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে কাষ্ঠখণ্ড হইতে একপ্রকার আলোক প্রতিফলিত হইয়া আমার চক্ষুতে পড়িয়া আমার অন্তঃকরণে রূপের জ্ঞান জন্মাইতেছে এবং ইহা ভিন্ন কাষ্ঠখণ্ড দেখা আর কিছুই নহে। সুতরাং শক্তির এক প্রকার বিকাশমাত্রই রূপ। উক্ত কাষ্ঠখণ্ড স্পর্শ করিলে উহা কঠিন বোধ হয় এবং উহাকে উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলে উহা ভারী বোধ হয়। ইহাও শক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমার হস্ত যে দিকে যাইতে চাহে সে দিকে উক্ত কাষ্ঠখণ্ড আমার হস্তকে যাইতে দিতেছে না। এই গুণকেই কঠিনত্ব ও গুরুত্ব বলা যায়, এবং ফলতঃ ইহা শক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে, গুণ বা শক্তির বিকাশ ভিন্ন গুণের আস্পদ বা মূলশক্তি জীবের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে না। বেদান্তশাস্ত্রমতে উক্ত আস্পদ বা মূলশক্তিই আত্মা বা ব্রহ্ম। সুতরাং আত্মা বা ব্রহ্ম জীবের ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত। তাঁহার তটস্থ ভাব ভিন্ন স্বরূপভাব কেহ জানিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। ব্রহ্মকে তটস্থভাবে জানাইয়া তাঁহার আলোচনা ও উপাসনা ক্রিয়ার উপদেশই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত জানা যায় তাঁহাকে কি দিয়া জানিবে? যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখা যায় না; যিনি শ্রবণের শ্রোতা তাঁহাকে শুনা যায় না; যিনি জ্ঞানের জ্ঞাতা তাঁহাকে জানা যায় না। ৵ গীতা বলিয়াছেন—"আত্মা

অব্যক্ত অচিন্ত্য এবং অবিকার্য্য বলিয়া উক্ত হন।" স্মৃত্যন্তরেও লেখা আছে যে রূপধারী নারায়ণ নারদমুনিকে বলিতেছেন—"হে নারদ! তুমি আমাকে যাহা দেখিতেছ তাহা মায়ামাত্র। আমি সর্ব্বভূতের গুণযুক্ত হইয়া তোমাকে দেখা দিয়াছি। আমার নির্গুণ ভাব দেখিতে তুমি সমর্থ নহ।" সুতরাং শাস্ত্রের মত এই যে,আত্মা বা ব্রহ্ম জীবের ইন্দ্রিয় মন, ও বুদ্ধির অগোচর, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান অসম্ভব। যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যায় যে উপায় দ্বারা জীব ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলেও উক্ত জ্ঞানকে বেদান্তশাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্য বলা যায় না। ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, বিধি-নিষেধ-সংস্পর্শ-শূন্য কেবলমাত্র জ্ঞানোপদেশ নিরর্থক ও অপ্রমাণ। জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, ভূগোল, প্রভৃতি শাস্ত্র জানিয়া যদি সেই জ্ঞান কোন কাজে না লাগান যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞান নিষ্ফল এবং অপ্রমাণ। অতএব ব্রহ্মকে জানিয়া যদি ব্রহ্মের আলোচনা এবং উপাসনা বা শাস্ত্রোক্ত অন্য ক্রিয়া করা যায় তাহা হই-লেই ব্রহ্মজ্ঞান সফল হয়। নতুবা কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান অনর্থক ও নিষ্ফল। এবং সেই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—আত্মা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য। অর্থাৎ প্রথমে আত্মাকে মোটামুটীভাবে জানিবে তৎপরে আত্মার বিষয় শুনিবে তাহার পর আত্মার বিষয় বিচার করিবে এবং পরি-শেষে আত্মার ধ্যান করিবে।

এক্ষণে এমন বলা যাইতে পারে যে, কখনও কখনও কেবলমাত্র জ্ঞানোপদেশও সার্থক হয়। মনে কর এক ব্যক্তি একখণ্ড রজ্জু দেখিয়া ভ্রমবশতঃ উহাকে সর্প মনে করিয়া ভীতিজনিত হৃৎকম্পাদি কষ্টভোগ করিতেছে। সেই সময় যদি তাহাকে বলিয়া দেওয়া যায় যে, যাহাকে সর্প মনে করিয়া তুমি ভয় ও কষ্ট পাইতেছ, উহা সর্প নহে রজ্জু মাত্র, তখন তাহার ভয় ও কষ্ট লোপ পায়। সুতরাং কেবল মাত্র জ্ঞানোপদেশ বিধি-নিষেধসংস্পর্শ ব্যতিরেকেও সার্থক ও প্রামাণ্য হইতে পারে। সেইরূপ এই জগৎ মায়াময় এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এই বাক্যও মিথ্যা জগতের অস্তিত্বজ্ঞান লোপ করাইয়া ইহার মায়াময়তা প্রতিপাদন করে।

আপত্তিকারীরা বলেন যে তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" এই বাক্য শত সহস্রবার বলিলেও জগতের অস্তিত্ব লোপ পায় না। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নহে, অদ্বৈতজ্ঞান অসম্ভব, এবং শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, পরিবর্ত্তনশীল এই জগতের উপর আস্থা না রাখিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মকে পরোক্ষভাবে জানিয়া তাঁহার আলোচনা এবং উপাসনা কর, তাহা হইলে সেই আলোচনা এবং উপাসনার ফলে তুমি এমন লোক প্রাপ্ত হইবে যে লোক সুখময় এবং যেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। অতএব ক্রিয়াই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য; কেবল ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহার উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। এইরূপ দুই প্রকার অর্থাৎ (১) ব্রহ্ম নাই, ক্রিয়ার উপদেশই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং (২) ব্রহ্ম আছেন, কিন্তু ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, ব্রহ্মের আলোচনা এবং উপাসনা ক্রিয়ার উপদেশই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। পূর্ব্বপক্ষ হইবার সম্ভাবনা থাকায় ভগবান্ সূত্রকার বলিয়াছেন—

চতুর্থ সূত্র। তত্তু সমন্বয়াৎ।

তৎ তু সমন্বয়াৎ এই তিনটী শব্দ লইয়া সূত্রটী হইয়াছে। "তৎ" শব্দের অর্থ "তাহা" অর্থাৎ "সেই ব্রহ্ম"। "তু" শব্দের অর্থ "কিন্তু" "সমন্বয়" শব্দের পঞ্চমী বিভক্তিতে "সমন্বয়াৎ" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "সমন্বয়াৎ" পদের অর্থ "সমন্বয় হেতু"। "সমন্বয়" শব্দের অর্থ "সম্যক্ অন্বয়" বা "সর্ব্বতোভাবে তৎপরতা"। সমস্ত সূত্রের অর্থ এই যে, যদিও আপাত দৃষ্টিতে ঐ প্রকার আশঙ্কা উঠিতে পারে বটে, কিন্তু সে আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, ব্রহ্মই জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়-কারণ, এবং উক্ত ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানই বেদান্তশাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্য। তাহার কারণ এই যে, সকল উপনিষদই ব্রহ্মকেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করে, এবং ব্রহ্মোপদেশই ঐ সকল উপনিষদের তাৎপর্য্য, এবং অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই উপনিষদ্ সমূহের বা বেদান্তশাস্ত্রের অবসান। পূর্ব্বপক্ষে যে সকল আপত্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদিগকে খণ্ডন করিয়া

কি প্রকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা ক্রমশঃ দেখান যাইতেছে। বাস্তবিক অধিকারভেদই উক্ত আপত্তি সমূহের মূল কারণ। ভিন্ন ভিন্ন নিম্নাধিকারীর পক্ষে পূর্ব্বপক্ষোক্ত ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্যই সঙ্গত। বেদবেদান্তোক্ত ক্রিয়া দ্বারা আপন শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করত বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা ও ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা সাধক ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের অধিকারী হইলেই সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়া যায়, এবং আত্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়, এবং এই সংসার একেবারে মায়াময় বলিয়া জ্ঞাত হয়, এবং ইহার সত্যতা সাধকের দৃষ্টিতে লোপ পায়।

——*:*:*——

চতুর্ব্বিংশ প্রবন্ধ।

—*:*:*—

মহাবাক্য সংগ্রহ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

হে সৌম্য শ্বেতকেতো! সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়াদ্বারা উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্ব্বে নাম রূপ ক্রিয়াবিকারাদি বিশিষ্ট এই জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান সমস্তই কেবল এক অদ্বিতীয় স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত সত্ত্বামাত্র * ছিল। কেহ কেহ বলেন প্রাদুর্ভূত হওয়ার পূর্ব্বে এই জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান সমস্তই অসৎ ছিল অর্থাৎ জগৎও ছিল না এবং জগতের অধিষ্ঠান কোন পদার্থও ছিল না। সমস্ত পদার্থের অভাব ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাঁহারা বলেন সেই অসৎ বা অভাব এক এবং অদ্বিতীয় ছিল অর্থাৎ সে সময় আত্মা, ঈশ্বর, অচেতনশক্তি, বা অন্য কোন পদার্থই ছিল না। তাঁহাদের মতে সেই অসৎ বা অভাব হইতেই এই সত্ত্বাবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের এই উক্তি সঙ্গত নহে। কোন বস্তু বর্ত্তমান থাকিলে তাহার ভাবান্তর হইতে পারে। যদি কোন বস্তু না থাকে তবে তাহার কি প্রকারে ভাবান্তর হইবে? বীজ হইতে বৃক্ষ হইতে পারে কিন্তু বীজ বর্ত্তমান না থাকিলে কোথা হইতে বৃক্ষ হইবে? জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিলে জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিন্তু যদি জ্ঞানের বা জ্ঞানোৎপাদক কোন বস্তুর অস্তিত্বই না থাকে তাহা হইলে জ্ঞানই বা কোথা হইতে আসিবে এবং জ্ঞানের পরিবর্ত্তনই বা কি করিয়া হইবে? সুতরাং যদি কোন কালে একেবারে অভাব বা অসৎ থাকিত তাহা হইলে সেই অভাবের বা অসৎ ভাবের কখনই পরিবর্ত্তন হইত না।

---

* অর্থাৎ তিনি সৎ বা আছেন, ছিলেন, ও থাকিবেন, তাঁহার বিষয় আমরা কেবল এইমাত্র অনুভব করিতে পারি।

সম্পূর্ণ অভাব হইতে কোন ভাব বা সৎপদার্থ হইতে পারে না। অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কোনও কালে জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান একেবারে ছিল না এরূপ হইতেই পারে না এবং অসৎ বা অভাব হইতে এই সমস্ত জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ আশঙ্কা হইতেই পারে না। বাস্তবিক সৎবস্তু হইতেই এই জগৎ প্রকটিত হইয়াছে। সৃষ্টিপ্রপঞ্চ উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্ব্বে সমস্তই সেই এক অদ্বিতীয় ভেদরহিত সদ্বস্তু মাত্র ছিল। সেই সদ্বস্তু জড় ছিলেন না। সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বিস্তারপূর্ব্বক আমিই বহুভাবে বিবর্ত্তিত হইব এইরূপ কল্পনা করিয়াই সেই সদ্বস্তু দৃশ্য দ্রষ্টৃ দর্শন সম্বলিত জগৎ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত সদ্বস্তু চিন্ময় ভিন্ন অন্য কিছু নহেন।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

নামরূপক্রিয়াবিশিষ্ট বর্ত্তমান কালে যে জগৎ দেখিতেছ ইহার আত্মা বা স্বরূপ সেই সত্তামাত্র। কেবল ভ্রম দ্বারা সেই ভেদরহিত সৎপদার্থে আমরা আপনাদিগকেও অন্যান্য জীবগণকে পৃথক্ পৃথক্ দ্রষ্টা বলিয়া মনে করি এবং সমস্ত জগৎকে পৃথক্ পৃথক্ দৃশ্য বলিয়া মনে করি। এই সমস্ত দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থ সেই সৎস্বরূপ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাস্তবিক কেবল সেই সৎপদার্থই এক মাত্র পারমার্থিক সত্য এবং সেই সৎ পদার্থই সমস্ত জগতের, সমস্ত জীবগণের, আমার ও তোমার আত্মা। আত্মাই সকলের স্বরূপ। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং তাহারা কাহারও স্বরূপ হইতে পারে না। তোমার আত্মা ভিন্ন তুমি অন্য কোন পৃথক্ পদার্থ নহ। তোমার আত্মা সেই সৎপদার্থ, অতএব তুমিও সেই সৎপদার্থ।

অষ্টম বা শেষ প্রপাঠকে ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান লাভান্তর তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ কর্ত্তব্য। তজ্জন্য ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিবে। ব্রহ্ম তত্ত্বান্বেষণের জন্য কোথাও যাইতে হয় না। এই শরীরে যে ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্ম আছে তাহাতে যে ক্ষুদ্র

চিন্ময় আকাশ আছে তাহার অভ্যন্তরে যাহা * আছে তাহার তত্ত্ব জানিতে পারিলে ব্রহ্মের তত্ত্ব জানা যায়। অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হইলে জীবের হৃদয়পদ্মে অবস্থিত চিন্ময় আকাশে যাহা কিছু আছে তাহার তত্ত্ব অন্বেষণ করিবে এবং বিশেষরূপে জানিবার চেষ্টা করিবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে,এই ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মে অবস্থিত ক্ষুদ্র চিন্ময় আকাশে এমন কি পদার্থ থাকিতে পারে যাহা অন্বেষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে! তাহার উত্তর এই যে, এই বাহ্য আকাশ অনন্ত বলিয়া প্রতিভাত হয় বটে কিন্তু সেই চিন্ময় আকাশই বাস্তবিক অনন্ত। স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রাদি এই বাহ্য আকাশ বা ভূতাকাশে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভূতাকাশস্থ এই সমস্ত পদার্থ এবং ভূতাকাশে নাই এমন সমস্ত মন, বুদ্ধি, কামনা প্রভৃতি পদার্থ এবং এই ভূতাকাশ স্বয়ং সেই চিদাকাশে প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবিক ভূতাকাশ ও সমস্ত জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। পূর্ব্বোক্ত চিন্ময় আকাশের কল্পনা দ্বারাই ভূতাকাশ এবং সমস্ত জগৎ চিন্ময় আকাশে প্রতিভাত রহিয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত জগৎ এবং ভূতাকাশ উক্ত চিদাকাশের কল্পনামাত্র এবং মায়াময় ও অলীক। একমাত্র চিন্ময় আকাশই নিত্য ও সত্য। পুনরায় এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি সমস্ত ভূত সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত মানসিক ব্যাপার এই হৃদয়পদ্মস্থিত চিন্ময় আকাশে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে যখন জরা পলিতাদি বা শস্ত্রাঘাতাদি দ্বারা এই শরীর জীর্ণ বা ধ্বংশ হয় তখন এই চিন্ময় আকাশেরই বা কি গতি হয় এবং এই চিন্ময় আকাশের অন্তর্ভূত এই সমস্ত ভূত, এই সমস্ত জগৎ এবং এই সমস্ত মানসিক ব্যাপারেরই বা কি দশা হয়? তাহার উত্তর এই যে, জরা শস্ত্রাঘাতাদি দ্বারা জীবশরীর জীর্ণ বা বিনষ্ট হইলেও চিন্ময় আকাশ জীর্ণ বা বিনষ্ট হন না। যদিও শরীরকে আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মপুর বলিয়া মনে করা যায় বটে কিন্তু বাস্তবিক চিন্ময় আকাশ বা ব্রহ্ম

* শরীরের অভ্যন্তরে হৃদ্‌পদ্মে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় বলিয়া শরীরকে ব্রহ্মপুর বলা যায় এবং আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম,সর্ব্বগত এবং অশরীর বলিয়া ব্রহ্মও কখন কখন আকাশ নামে অভিহিত হন।

এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত নহেন। ইনি আপনিই আপনার প্রতিষ্ঠা। ইহাঁর প্রতিষ্ঠানের জন্য অন্য কোন অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। সমস্ত জগৎ, সমস্ত কাম্য পদার্থ, সমস্ত জীব শরীর, সমস্ত জীবের হৃদয়পদ্ম, অধিক কি বলিব যাহা কিছু অনাত্মপদার্থ আছে সে সমস্তই এই চিন্ময় আকাশের কল্পনা মাত্র সুতরাং সে সমস্তই এই চিন্ময় আকাশে সমাহিত। এই চিন্ময় আকাশই সমস্ত জীবের আত্মা, সমস্ত জগতের আত্মা এবং নির্গুণ আত্মা। পাপ, পুণ্য, জরা, মৃত্যু শোক, দুঃখ, ক্ষুধা. পিপাসা. ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইনি যাহা ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করেন তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হয়। যাহারা এই মনুষ্য শরীরে থাকিতে থাকিতে এই আত্মার তত্ত্ব এবং ইহাঁর সত্যসঙ্কল্পত্ব সম্যক্‌রূপে জানিতে পারে না তাহারা অবিদ্যার অধীন থাকিয়া যায় কিন্তু যাঁহারা এই মনুষ্য শরীরে থাকিতে থাকিতে এই আত্মার তত্ত্ব এবং ইহাঁর সত্যসঙ্কল্পত্ব সম্যক্‌রূপে জানিতে পারেন তাঁহারা অবিদ্যামুক্ত হইয়া পূর্ণকাম হন এবং ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যান এবং তখন তাঁহারা যাহা কিছু সঙ্কল্প করেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন হয়। প্রজাপতি বলিয়াছেন যে, অপহতপাপ্মা, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুৎপিপাসাবিহীন, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প আত্মাই অন্বেষ্টব্য এবং বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য। যে সাধক শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা আত্মা বা ব্রহ্মকে পরোক্ষ ভাবে জানিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মা বা ব্রহ্মকে অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারেন। এই সমস্ত লোককে তিনি আপন কল্পনামাত্র বলিয়া দেখিতে পান এবং কোন প্রকার কামনা তাঁহার অপ্রাপ্য থাকে না।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেন—

যাজ্ঞবল্ক্যঋষির মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়নী নাম্নী দুই ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী গৃহপ্রয়োজনানুসন্ধানতৎপরা ছিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক পারিব্রাজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যঋষি মৈত্রেয়ী দেবীকে বলিয়াছিলেন, হে মৈত্রেয়ি! আমি এক্ষণে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিব। যদি তুমি অনু-

মোদন কর তাহা হইলে আমাদের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তাহা তোমার এবং কাত্যায়নীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দেই। উত্তরে মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন ; হে ভগবন্! যদি এই সমস্ত পৃথিবী ধন দ্বারা পূর্ণা হয় এবং সেই সমস্ত ধন ও পৃথিবী যদি আমার হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা দান ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিয়া আমি কি অমর হইতে পারি? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিয়াছিলেন,—তদ্দ্বারা তুমি অমর হইতে পার না। শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের তৃপ্তিকর বস্তুসমূহের অধিকারিগণের জীবন যে প্রকার হয় ধনপূর্ণা সমস্ত পৃথিবী তোমার হইলে তোমার জীবনও তদ্রূপ হইবে। বিত্তদ্বারা অমৃতত্বপ্রাপ্তির কোন প্রকার আশা হইতে পারে না। মৈত্রেয়ী বলিলেন, যাহা দ্বারা আমি অমর হইতে পারিব না তাহা লইয়া আমি কি করিব? হে ভগবন্! আপনি অমৃতত্ব সাধনোপায় পরিজ্ঞাত আছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই উপায় আমাকে বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! তুমি চিরদিনই আমার প্রিয়পাত্রী, পরন্তু তোমার এক্ষণকার বাক্য অতিশয় প্রীতিকর। অতএব অমৃতত্বসাধক তোমার অভীষ্ট আত্মজ্ঞান এক্ষণে বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। স্ত্রী যে পতিকে ভাল বাসে তাহা পতির স্বার্থের জন্য নহে ; আপন স্বার্থের জন্যই স্ত্রী পতিকে ভাল বাসে। স্বামী যে পত্নীকে ভাল বাসে তাহা পত্নীর স্বার্থের জন্য নহে ; আপন স্বার্থের জন্যই স্বামী পত্নীকে ভাল বাসে। পুত্রের স্বার্থের জন্য পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন না, আপন স্বার্থের জন্যই পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন। ধনের স্বার্থের জন্য মনুষ্য ধনকে ভাল বাসে না ; আপন স্বার্থের জন্যই মনুষ্য ধনকে ভাল বাসে। ব্রাহ্মণের স্বার্থের জন্য লোক সকল ব্রাহ্মণকে ভাল বাসে না ; আপন স্বার্থের জন্যই লোক সকল ব্রাহ্মণকে ভাল বাসে। ক্ষত্রিয়ের স্বার্থের জন্য ক্ষত্রিয় লোক সকলের প্রিয় নহে ; আপন স্বার্থের জন্যই লোক সকল ক্ষত্রিয়কে ভাল বাসে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রভৃতি ভুবন সকলের স্বার্থের জন্য উক্ত ভুবন সকল মনুষ্যের প্রিয় নহে ; মনুষ্যের আপন স্বার্থের জন্যই মনুষ্য উক্ত ভুবন সকলকে ভাল বাসে। দেবগণের স্বার্থের জন্য মনুষ্য দেবগণকে ভাল বাসে না ; আপন স্বার্থের জন্যই মনুষ্য

দেবগণকে ভাল বাসে। বেদগণের স্বার্থের জন্য বেদগণ প্রিয় নহে; আপন স্বার্থের জন্যই মনুষ্য বেদগণকে ভাল বাসে। ভূতগণের স্বার্থের জন্য ভূতগণ প্রিয় নহে; আপন স্বার্থের জন্যই মনুষ্য ভূতগণকে ভাল বাসে। সমস্ত পদার্থের স্বার্থের জন্য সমস্ত পদার্থ প্রিয় নহে; আপন স্বার্থের জন্য মনুষ্য সমস্ত পদার্থকে ভাল বাসে। অতএব আপনিই অর্থাৎ আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এই আত্মাকে জানা মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। তজ্জন্য ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সমস্ত অনাত্মপদার্থ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বানুসন্ধানতৎপর হইবে। ভগবদ্ভক্তগণের এবং গুরুর নিকট আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে। আত্মতত্ত্বোপদেশক শাস্ত্র সমূহ পাঠ করিবে। শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক এবং ভগবদ্ভক্তগণের ও গুরুর উপদেশদ্বারা শাস্ত্রবাক্য সকল বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসকল আপন হৃদয়ে প্রোথিত করিবে এবং অনন্যমনে আত্মার ধ্যান করিবে। এইরূপে আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান শ্রবণ ও মনন এবং আত্মার ধ্যান করিতে করিতে আত্মার অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়। তখন সমস্ত পদার্থের সম্যক্ তত্ত্ব বিদিত হয়। তখন দেখা যায় একমাত্র আত্মাই নিত্য ও সত্য এবং আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থই কল্পিত মায়াময় ও অলীক এবং আত্মাই আপনাকে দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ভাবে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন সত্য বলিয়া মরীচিকার অনুধাবন করিলে মরীচিকাই জীবকে বিপথে লইয়া গিয়া জীবের অনিষ্টের কারণ হয় সেইরূপ ব্রাহ্মণ জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ ও সত্য পদার্থ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির সেবা করিলে ব্রাহ্মণজাতিই ব্রহ্মজ্ঞানসাধন মার্গ হইতে সেবককে ভ্রষ্ট করিবার কারণ হইয়া সেবকের অনিষ্টের কারণ হয়। সেইরূপ ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ ও সত্য পদার্থ মনে করিয়া ক্ষত্রিয়জাতির সেবা করিলে ক্ষত্রিয়জাতিই সেবকের ব্রহ্মজ্ঞানসাধন মার্গ ভ্রষ্টের কারণ হইয়া সেবকের অনিষ্টকর হয়। সেইরূপ ভুবন সকল, দেব সকল, বেদ সকল, ভূত সকল, বা সমস্ত জগৎকে আত্মা হইতে পৃথক্ সত্য পদার্থ মনে করিয়া ভুবন সকল, দেব সকল, বেদ সকল, ভূত সকল বা সমস্ত জগৎকে সেবা করিলে উক্ত সেবিত পদার্থই ব্রহ্মজ্ঞান সাধনমার্গ

হইতে সেবককে ভ্রষ্ট করিবার কারণ হইয়া সেবকের অনিষ্টকর হয়। বাস্তবিক ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রিয়জাতি, ভুবন সকল, দেব সকল, বেদ সকল, ভূত সকল এবং সমস্ত জগৎ আত্মামাত্র। আত্মা ভিন্ন তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। যেমন মরীচিকাভ্রম হেতু মরুভূমি জলরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হয় সেইরূপ অবিদ্যাবশত নির্গুণ আত্মা জগৎ এবং জীবভাবে বিবর্তিত হয়। মরীচিকাভ্রম অপসৃত হইলে যেমন মরুভূমি বালুকা-রাশি বলিয়া দৃষ্ট হয় সেইরূপ অবিদ্যা লোপ পাইলে নির্গুণ আত্মা সচ্চিদানন্দ বলিয়াই দৃষ্ট হন। আত্মতত্ত্বান্বেষণ, আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, আত্ম-তত্ত্ব মনন, এবং আত্মতত্ত্ব ধ্যান দ্বারা আত্মতত্ত্ব বিদিত হয় এবং আত্ম-তত্ত্ব বিদিত হইলে সমস্ত অনাত্ম পদার্থ মায়াময় ও অলীক বলিয়া দৃষ্ট হয়। অনাত্ম পদার্থ অসংখ্য সুতরাং সমস্ত অনাত্ম পদার্থের তত্ত্ব অন্বে-ষণ, শ্রবণ, মনন, ধ্যান এবং জ্ঞান অসম্ভব। বিশেষতঃ অনাত্ম পদার্থ বাস্তবিক আত্মার সঙ্কল্পমাত্র বলিয়া অনাত্ম পদার্থের জ্ঞান দ্বারা আত্মজ্ঞান হইতেও পারে না। দুন্দুভি আঘাত, শঙ্খধ্বনি বা বীণাবাদন করিলে যে শব্দ উত্থিত হয় সেই শব্দকে যেমন কেহ অন্য উপায়ে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারে না কেবলমাত্র দুন্দুভি শঙ্খ বা বীণা গ্রহণ দ্বারা সেই দুন্দুভি শঙ্খ বা বীণাজাত শব্দও আয়ত্ত হয় সেইরূপ আত্মার কল্পনা-প্রসূত অনাত্ম পদার্থ সমূহ কেহই অন্য কোন উপায়ে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারে না কেবলমাত্র আত্মাকে অবলম্বন করিলেই সমস্ত অনাত্ম পদার্থ আয়ত্ত হয়। অতএব অন্বেষণ, শ্রবণ, মনন এবং ধ্যান দ্বারা আত্ম-জ্ঞান লাভই কর্তব্য। যেমন সৈন্ধবখণ্ডের সমস্তই লবণময় এবং তাহার ভিতরে, বাহিরে, পার্শ্বে, সর্ব্বত্রই লবণ ভিন্ন আর কিছুই নাই সেইরূপ আত্মাও সমস্তই প্রজ্ঞানময় এবং প্রজ্ঞান ভিন্ন বাস্তবিক আত্মাতে অন্য কিছুই নাই। যখন আপন সঙ্কল্প দ্বারা ভূত সকলকে সৃষ্টি করিয়া আত্মা জগৎরূপে বিবর্তিত হন তখনই তাঁহার কল্পিত জীব তাঁহাকে নানা ভাবে অবলোকন করে এবং তাঁহাকে নানা নামে অভিহিত করে। আবার যখন তিনি সেই সঙ্কল্প সম্বরণ করেন তখন সমস্ত জগৎ তাঁহাতে বিলীন

হইয়া যায় এবং তখন আর তাঁহার কোন প্রকার রূপ গুণ বা সংজ্ঞা থাকে না। তিনি নিগুর্ণ অদ্বিতীয় প্রজ্ঞানভাবে বিরাজ করেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

এক্ষণে যাহা কিছু আছে সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সমস্তই কেবল এক ব্রহ্মমাত্র ছিল। সেই ব্রহ্ম মায়াদ্বারা এই বিশ্ব বা সর্ব্বরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। বাস্তবিক এই বিশ্বের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, মায়া দ্বারাই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পৃথক্ অস্তিত্ব ভ্রম হয়। এ সমস্তই সেই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই সর্ব্ব। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সেই মায়াতীত ব্রহ্মকে আপন আত্মা বলিয়া জানেন এবং তাঁহার নিশ্চিতজ্ঞান হয় যে আমিই ব্রহ্ম এবং আমিই সর্ব্ব। যে সাধনা দ্বারা এই জ্ঞান হয় তাহা কেবল মনুষ্য জাতিতেই পর্য্যবসিত নহে। দেবতা, ঋষি এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে যে কেহ তপস্যাবলে এই জ্ঞান পাইয়াছিলেন তিনিই আপনাকে ব্রহ্ম বা সর্ব্ব বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মই আমার আত্মা, আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান পাইবামাত্র বামদেব ঋষি দেখিয়াছিলেন যে তিনিই মনু, তিনিই সূর্য্য, তিনিই সর্ব্ব। বর্ত্তমান কালেও যদি কোন সাধক সৃষ্টি স্থিতি লয়ের সাক্ষী সেই নির্ব্বিকার নিগুর্ণ ব্রহ্মকে আপনার আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন এবং আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তিনিও মহর্ষি বামদেবের ন্যায় আপনাকে আমিই সর্ব্ব এই ভাবে দেখিতে পান। কোন ব্যক্তি এমন কি দেবতারাও উক্ত সাধকের "আমিই সর্ব্ব" এই প্রকার অপরোক্ষজ্ঞানে কোনরূপ বিঘ্ন করিতে সমর্থ হন না।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ পুনরায় বলিয়াছেন—

ব্রহ্ম ছিলেন না বা থাকিবেন না এমন সময় বা স্থান বা অবস্থা ছিল না এবং থাকিবে না; ব্রহ্মের আদি এবং অন্ত নাই, ইনি অনাদি এবং অনন্ত। ইহাঁ ছাড়া কেহ বা কিছু নাই, ছিল না ও থাকিবে না, ইনি সর্ব্ব। ইহাঁর অভ্যন্তরে কোন পদার্থ নাই,ইনি সর্ব্বান্তর। ইহাঁর বাহিরে অন্য কোন পদার্থ নাই ইনি সর্ব্বাধার। ইনি সমস্ত জগতের সমস্ত জীবের এবং সমস্ত পদার্থের আত্মা। আত্মা কি পদার্থ তাহার যথার্থ তত্ত্ব না

জানিলেও জীবমাত্রই একটী অনির্ব্বচনীয় পদার্থকে আত্মা বলিয়া জানে। এই আত্মা স্বপ্রকাশ অর্থাৎ যদিও ইহাঁর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি কোন প্রকার ইন্দ্রিয়গম্য গুণ নাই তথাপি ইহাঁকে সকলেই আপন আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া জানে। ব্রহ্ম সেই সর্ব্বজনজ্ঞাত আত্মা এবং তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা এবং বিজ্ঞাতা এবং তিনিই সমস্ত জগৎকে অনুভব করেন। ইহাই সকল বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ এবং ইহাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের উপসংহৃত অর্থ।

ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন—

"সাধক যতকাল অবিদ্যাগ্রস্ত থাকেন ততকাল তাঁহার পক্ষে তপ উপাসনাদি ক্রিয়া বিহিত এবং উক্ত ক্রিয়া- দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হইলেই সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান হয়" শাস্ত্রের এই তথ্য যে সাধক অবগত আছেন তিনি তপ উপাসনাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া দ্বারা অবিদ্যাজনিত অজ্ঞানরূপ মৃত্যু অতিক্রম করত অদ্বয়-ব্রহ্ম-তত্ব জানিতে পারিয়া আপনার অমর স্বভাব বিদিত হন।

ঈশোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

হে জগৎ-পোষক! হে জগৎ-প্রাণ! হে জগৎ-নিয়ামক! হে বিরাট-পুরুষ! হে সূর্য্য! তোমার কিরণজাল সম্বরণ কর, তোমার জ্যোতিঃ উপসংহার কর। তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার কল্যাণতম স্বরূপ আমাকে দেখাও। যিনি তোমার আত্মা বা স্বরূপ, তিনিই প্রকৃতির অধ্যক্ষপুরুষ, তিনিই আমার আত্মা বা স্বরূপ এবং আমিই তিনি।

কেনোপনিষৎ বলিয়াছেন—

যাঁহাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, যাঁহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া বাক্য সকল জীবগণের মনে ও শাস্ত্রবাক্য সকল ঋষিগণের মনে উদয় হয়, সেই অনির্ব্বচনীয় সৎ পদার্থকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান। ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট উপাস্যভাব সকল ব্রহ্ম নহেন।

যাঁহাকে মন দ্বারা চিন্তা করা যায় না, যাঁহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া মন চিন্তা করিতে পারে, সেই অচিন্ত্য সৎ পদার্থই ব্রহ্ম। মায়াপ্রভাবে তিনিই

ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভাদি উপাধিবিশিষ্ট ভাবে সঙ্কল্পিত হন। এই উপাধিবিশিষ্ট উপাস্য ভাব সকল ব্রহ্ম নহেন।

যাঁহাকে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা দর্শন. শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ করা যায় না, যাঁহা কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন কর্ম্ম করে, সেই সৎ পদার্থই ব্রহ্ম। মন ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি গুণবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভাদি উপাস্য ভাব সকল ব্রহ্ম নহেন।

ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না, কেবল ভগবদ্ভক্তগণের ও গুরুর উপদেশ শ্রবণ. শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রমতে ধ্যানাদি ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রমশঃ ব্রহ্মের অনুগ্রহে ব্রহ্মকে জানা যায়। যিনি এই তথ্য জানিয়াছেন এবং ব্রহ্ম জানিবার জন্য তদনুসারে তপস্যা করিতে থাকেন তিনিই ক্রমশঃ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। কিন্তু মায়াপ্রসূত উপাধিবিশিষ্ট কোন অনাত্ম পদার্থকে যিনি ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন, এবং ব্রহ্ম জানিয়াছি এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হন এবং ব্রহ্মকে জানিবার আর কোন চেষ্টা করেন না.তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না। যাঁহারা ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার তত্ত্ব বুঝিয়াছেন। যাহারা ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির গোচর কোন পদার্থ বলিয়া মনে করে তাহারা তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে পারে না।

বাহ্য এবং অন্তর্জগৎহেতু যে কোন প্রকার জ্ঞান বা বোধ হয় সেই সমস্ত বিকারশীল বোধ হইতে পৃথক এবং সেই সমস্ত বোধের সাক্ষীরূপে অবস্থিত চিচ্ছক্তি মাত্রকেই যিনি ব্রহ্ম জানিয়া প্রত্যেক বোধের সহিত উক্ত চিচ্ছক্তির অনুভব করেন তিনি ক্রমশঃ অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্য মোক্ষপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ আপনাকে অজর, অমর, আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন। অনাত্মবস্তু সকলকে মায়াময় বলিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত চিচ্ছক্তি মাত্রকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করত উহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে রাখিতে আত্মবিদ্যা লাভ হয়। এই আত্মবিদ্যাই মোক্ষ লাভের উপায়।

যদি কোন সাধক এই মানবদেহে থাকিতে থাকিতে আত্মজ্ঞানলাভ করিতে পারেন তবে তাঁহার অবিদ্যা ঘুচিয়া যায় এব তিনি পারমার্থিক

সত্য জানিতে পারেন। আর যদি তিনি আত্মতত্ত্ব বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে জন্মমরণাদিসঙ্কুল সংসারগতিতে থাকিয়া বারংবার জন্মমৃত্যু পরিগ্রহ করত তাঁহাকে বহুকাল কষ্টভোগ করিতে হয়। ধীমান্ ব্যক্তি-সকল সর্ব্বভূতে এক আত্মাকে অবলোকন করত এই অবিদ্যামূলক জগৎ হইতে আপন আপন মন ও বুদ্ধি প্রত্যাহার করেন এবং আপনাদিগকে অজর, অমর, আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন।

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় স্থূল। ইন্দ্রিয়সকল অপেক্ষা ইন্দ্রিয়জন্য রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি-বোধ-সকল সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। উক্ত বোধ সকল অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। মন অপেক্ষা বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি অপেক্ষা বিজ্ঞান মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের সমষ্টি বা হিরণ্যগর্ভাখ্য মহত্তত্ত্ব সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা সর্ব্বকার্য্য-কারণ-শক্তি-সমাহাররূপা জগদ্বীজভূতা প্রকৃতি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে নির্গুণ চিন্মাত্রপুরুষ সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। চিন্মাত্র পুরুষ হইতে কোন পদার্থ সূক্ষ্ম বা শ্রেষ্ঠ নাই। চিন্মাত্রপুরুষই সূক্ষ্মতম ও শ্রেষ্ঠতম এবং চিন্মাত্র পুরুষই সংসারিগণের চরমগতি।

কঠোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ,মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভের মনোময় কোষ বা মহত্তত্ত্ব বা সমস্ত জীবের বিজ্ঞান মন বুদ্ধি অহঙ্কার এবং চিত্তের সমষ্টিই শ্রেষ্ঠ, মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্তা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ, অব্যক্তা প্রকৃতি অপেক্ষা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বলিঙ্গ * বিবর্জ্জিত আত্মা শ্রেষ্ঠ। এই আত্মাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিলে জীব সংসারগতি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদিগুণ ইহাঁর নাই, ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারায় কেহ ইহাঁকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ভগবদ্ভক্তগণের ও গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা যাঁহারা ইহাঁর তত্ত্ব পরোক্ষভাবে জানিয়াছেন,শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে

---

* লিঙ্গ—চিহ্ন বা প্রকৃতি ধর্ম্ম।

যাঁহাদের স্থির বিশ্বাস হইয়াছে এবং ইহাঁর ধ্যান দ্বারা যাঁহারা ইহাঁকে অপরোক্ষভাবে দেখিবার অধিকারী হইয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই ইহাঁকে অপরোক্ষভাবে জানিয়া আপনাদিগকে অজর অমর, চিন্ময় আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন।

প্রশ্নোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

ভগবান্ পিপ্পলাদ সুকেশাঋষিকে বলিলেন,—হে সৌম্য! যে পুরুষে এই ষোড়শ-কলাময় জগৎ ভাসমান হয়, সেই নিষ্কল পুরুষকে জানিবার জন্য দেশান্তর যাইতে হয় না। এই শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হৃদয়াকাশে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কি তাঁহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র? না, তাহা নহে। বাস্তবিক তাঁহারই মায়াবশে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-সম্বলিত এই সমস্ত জগৎ তাঁহাতে কল্পিতমাত্র। "কাহার উৎক্রান্তিতে আমিও উৎক্রান্ত হইব এবং কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমিও প্রতিষ্ঠিত থাকিব" ইহা ভাবিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে (১) প্রাণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি (২) বিজ্ঞান, (৩) আকাশ, (৪) বায়ু, (৫) অগ্নি, (৬) জল, (৭) পৃথিবী, (৮) ইন্দ্রিয়সমূহ, (৯) অন্তঃকরণ, (১০) ধান্য যবাদি অন্ন (১১) ভুক্তঅন্ন হইতে উৎপাদ্য সামর্থ্য, (১২) সর্ব্বকর্ম্মসাধনরূপ তপস্যা, (১৩) বেদোক্ত মন্ত্র সকল, (১৪) বেদোক্ত কর্ম্ম সকল এবং (১৫ কর্ম্মের ফল সকল এবং (১৬) বস্তু ও ব্যক্তি সকলের নাম সৃষ্ট হইয়াছিল।

যেমন সমুদ্রবাষ্প হইতে উদ্ভূত নদী সকল যতক্ষণ প্রবাহিত থাকে ততক্ষণ তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নাম থাকে, কিন্তু সমুদ্রে পতিত হইবার পর তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সমস্ত জলরাশি তখন কেবল সমুদ্র নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ পুরুষ হইতে সম্ভূত এই ষোড়শকলা মহা প্রলয়কালে পুরুষে বিলীন হয় এবং তাহাদের নাম ও রূপ বিলুপ্ত হয়। তখন আর কোন প্রকার ভেদ থাকে না এবং তখন যে সৎ চিৎ পদার্থ মাত্র বর্ত্তমান থাকেন তাহা কেবল পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যে সাধক ভগবদ্ভক্তগণ এবং গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া

বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনা পূর্ব্বক ভক্তিভাবে উক্ত পুরুষকে উপাসনা করত উক্ত পুরুষের অনুগ্রহে উক্ত পুরুষকে জানিতে পারেন সেই সাধক আপন আত্মাকে উক্ত পুরুষ হইতে অভিন্ন এবং আপনাকে পূর্ব্বোক্ত ষোড়শকলা হইতে পৃথক্ নিষ্কল এবং অমরপুরুষ বলিয়া জানিতে পারেন। এ বিষয়ে একটী শ্লোক আছে, তাহার মর্ম্ম এই—

যেমন রথচক্রের নাভিতে চক্রের অর্গল সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে সেইরূপে এই ষোড়শকলা সমূহ যে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত আছে তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা কর।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন—

নাম রূপ সম্বলিত যে জগৎ সম্মুখে দেখিতেছ বাস্তবিক উহার বস্তুত্ব নাই। অবিদ্যাবশতঃ উহাকে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ভ্রমবশত যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় সেইরূপ অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে। বাস্তবিক অমৃত ব্রহ্মই সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, অধোদিকে এবং ঊর্দ্ধে বিরাজমান রহিয়াছেন। একমাত্র ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎরূপে ভাসমান রহিয়াছেন। এই জগৎ সেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মুণ্ডকোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

যখন সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকারণ, চিন্ময় আত্মাকে সাধক অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তখন সেই বিদ্বান সাধকের পুণ্য-পাপ-রূপ সমস্ত বন্ধনকারণ দগ্ধ হইয়া যায় এবং তিনি নিরঞ্জন আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যান।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—

এই সমস্তই ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম বা আত্মা চতুষ্পাৎ অর্থাৎ সাধকের অধিকারভেদে ইনি চারি ভিন্ন ভিন্ন পাদে বা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের বুদ্ধিতে প্রকাশ হন এবং একই সাধকও আপনার উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ইহাঁকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিতে পান। স্থূলভাব হইতে আরম্ভ করিয়া সাধক ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাব গ্রহণে অধিকারী হন।

তপস্যা দ্বারা সাধকের জ্ঞান যতই বাড়িতে থাকে ব্রহ্ম বা আত্মা তত সূক্ষ্মতর ভাবে সাধকের জ্ঞানপথে প্রকাশিত হন। অবশেষে সাধক ব্রহ্মকে সর্ব্ব প্রকার উপাধিমুক্ত আপন নির্গুণ আত্মা বলিয়া দেখিতে পান। তখন সাধক মুক্ত হন।

প্রথম পাদে ব্রহ্ম বা আত্মা অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক কর্তৃক সমষ্টিরূপে বিরাট পুরুষ বা বৈশ্বানর ভাবে এবং ব্যষ্টিরূপে বিশ্ব বা দেব তির্য্যক্‌, নরাদিভাবে দৃষ্ট হন। অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন যে জাগরণকালে যে সমস্ত পদার্থ জীবের জ্ঞানগোচর হয় তাহাদের সমষ্টিরূপ এই জগৎ সত্য এবং ইহাই বিরাটপুরুষ এবং ইহাই ইহার অধিষ্ঠাতা এবং ভোক্তা। অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন যে এই বৈশ্বানর পুরুষ বহিঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ ইহাঁর মনের বাহিরে স্থিত এই জগৎ সর্ব্বদা ইহাঁর জ্ঞান পথে রহিয়াছে। অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন যে এই বৈশ্বানর পুরুষ মস্তক, চক্ষু, প্রাণ, মধ্যদেহ, বস্তি (নাভির অধোভাগ), পদ এবং মুখ এই সাতটী অঙ্গ পরিগ্রহ করত ব্যষ্টি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জীব রূপে দৃষ্ট হন। এবং যখন ইনি সমষ্টি অর্থাৎ বিরাট ভাবে দৃষ্ট হন তখন স্বর্গলোক ইহাঁর মস্তক, সূর্য্য-চক্ষুঃ, বায়ু-প্রাণ, আকাশ-মধ্যদেহ, জল-বস্তি, পৃথিবী-পদ, এবং অগ্নি-মুখ। অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন যে ইহাঁর একোনবিংশতি (১৯) উপলব্ধি দ্বার আছে, যথা—(ব্যেষ্টিভাবে) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এই পঞ্চ বায়ু; সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন, অহঙ্কার (অর্থাৎ আমি একজন পৃথক্‌ সত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ বোধ), বুদ্ধি, এবং চিত্ত। এবং (সমষ্টি ভাবে) দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদান এবং স্পর্শন এই পঞ্চ বোধশক্তি; শব্দ করণ,গ্রহণ, গমন,বিসর্জ্জন এবং জন্ম এই পঞ্চ কর্ম্মশক্তি; জীবনশক্তি, মৃত্যুশক্তি, পরিবর্ত্তন, বিশ্লেষণ ও এক বা বহু দ্রব্য বা শক্তি হইতে অন্য প্রকার দ্রব্যের বা শক্তির সঙ্কলনশক্তি, আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ আকুঞ্চন প্রসারণশক্তি এবং জীবের কর্ম্মফল প্রদান শক্তি এই পঞ্চ প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি সমষ্টি, সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন সমষ্টি অহঙ্কার সমষ্টি, বুদ্ধি

সমষ্টি এবং চিত্তসমষ্টি। অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন যে,উক্ত ঊনবিংশতি উপলব্ধি দ্বার দিয়া জীবসকল ও বিরাটপুরুষ ব্যবহারিক জগতের সমস্ত স্থূল বিষয় ভোগ করেন।

দ্বিতীয়পাদে ব্রহ্ম বা আত্মা, অপেক্ষাকৃত উন্নতসাধক কর্ত্তৃক, ব্যষ্টিভাবে তৈজসপুরুষ এবং সমষ্টিভাবে হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মাভাবে দৃষ্ট হন। স্বপ্নকালে কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়গণের সমক্ষে না থাকিলেও এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা কর্ম্মেন্দ্রিয় কোন কর্ম্ম না করিলেও জীবগণ মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্ত-দ্বারা নূতন ইন্দ্রিয় এবং নূতন জগৎ কল্পনা করে এবং তাহাদিগকে সত্য বলিয়া মনে করে এবং সেই কল্পিত ইন্দ্রিয়দ্বারা সেই কল্পিত জগৎ ভোগ করে। অপেক্ষাকৃত উন্নত সাধক মনে করেন যে এই ব্যবহারিক জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় তৈজসপুরুষও হিরণ্যগর্ভ কেবলমাত্র মননশক্তি,অহঙ্কার,বুদ্ধি এবং চিত্তদ্বারা এই ব্যবহারিক জগতের কল্পনা করেন এবং এই কল্পিত জগৎ ভোগ করেন। সুতরাং উক্ত সাধ-কের মতে ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ ইঁহার চিত্তের বাহিরে কোন পদার্থই নাই। ইনি আপনার চিত্তের মধ্যে সমস্ত জগৎ কল্পনা করত সর্ব্বদা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং আপনাকে আপন কল্পনাপ্রসূত অঙ্গবিশিষ্ট ও উপলব্ধি-দ্বার-সমূহ-যুক্ত করিয়া বিরাট পুরুষের ন্যায় সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট ও একোনবিংশতি উপলব্ধিদ্বার যুক্ত হন এবং আপন কল্পনাপ্রসূত জগৎ ভোগ করেন।

সাধক তপস্যাবলে আরও উন্নত হইলে ব্রহ্ম বা আত্মাকে তৃতীয়ভাবে দর্শন করেন। এই পাদে ব্রহ্ম বা আত্মাকে ব্যষ্টিভাবে প্রাজ্ঞপুরুষ এবং সমষ্টিভাবে অন্তর্যামী বা ঈশ্বর বলা যায়। জীবের সুষুপ্তি অবস্থা পর্য্যা-লোচনা করিলে প্রাজ্ঞপুরুষের তত্ত্ব জানা যায়। যে অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না এবং সর্ব্বপ্রকার কামনা হইতে মুক্ত হয় সেই অবস্থাকে সুষুপ্তি বলে। জাগরণকালে জীব আপনাকে শরীর,ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্তযুক্ত মনে করে। কিন্তু স্বপ্নকালে জীব দেখিতে পায় যে তখন আর বাহ্যশরীর ও ইন্দ্রিয় ব্যবহারে লাগে না। তখন যে শরীর ও ইন্দ্রিয়কে আপনার বলিয়া মনে করা যায় তাহা কল্পনাপ্রসূত

মাত্র। সুতরাং সে অবস্থায় জীব কেবল মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্তময় থাকে। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ভৌতিক শরীরও ইন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিলেই জীবের লোপ হয় না। যতক্ষণ জীবের মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্ত বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আবার সুষুপ্তিকালে জীবের মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি একমাত্র বিজ্ঞানে বিলীন হয়। কিন্তু তাহাদের একেবারে ধ্বংস হয় না। সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইলে সুষুপ্তির পরে জীব কখন স্মরণ করিতে পারিত না যে সুষুপ্তির পূর্ব্বে আমি অমুক ছিলাম ও আমিই সুষুপ্ত হইয়াছিলাম এবং সুষুপ্তির পরেও আমি সেই আছি। বাস্তবিক সুষুপ্তিকালে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি ঘনীভূত হইয়া একমাত্র প্রজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞানভাবে বর্ত্তমান থাকে ও চিত্তবৃত্তি শূন্যভাবে অবস্থান করে। এবং সুষুপ্তির অবসানে প্রজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞান হইতে আবার বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন প্রকাশিত হইয়া চিত্তকে বৃত্তিসম্পন্ন করে। এই বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞানঘনভাবে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি বিলীন হইলে জীব আপনার পৃথক্ অস্তিত্ব বোধ করিতে পারে না। এইরূপে প্রলয়কালে যখন সমস্ত জগৎ ও মনসমষ্টি, অহঙ্কারসমষ্টি, বুদ্ধিসমষ্টি এবং চিত্তসমষ্টি অব্যক্তা প্রকৃতিভাবে বিলীন হয়, তখন তাহাদের ধ্বংস হয় না পরন্তু তাহারা সৃষ্টির বীজস্বরূপ প্রধান বা অব্যক্তা প্রকৃতিভাবে বর্ত্তমান থাকে। প্রলয়াবসানে আবার তাহারা প্রধান বা অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে বিকশিত হয়। এইরূপে বারম্বার ঘনীভূত ও বিকশিত হইতে হইতে অবশেষে এই অব্যক্তা প্রকৃতি বা প্রধান মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্ম বা আত্মায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক বিজ্ঞান, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় ও জগৎ সমস্তই মায়ামাত্র; ব্রহ্ম বা আত্মার মায়া দ্বারাই তাহারা বিকশিত ও নির্ব্বাপিত হয়। জাগরণ ও স্বপ্নকালে বৃত্তিসম্পন্ন চিত্ত ব্যবহারিক সুখ দুঃখ ভোগ করে কিন্তু সুষুপ্তিকালে বৃত্তিশূন্য চিত্ত ব্যবহারিক কোন প্রকার সুখ বা কষ্টভোগ করে না। সুতরাং অতিশয় যন্ত্রণায় পীড়িত জীবও সুষুপ্তাবস্থায় সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু সুষুপ্তজীব যে কেবলমাত্র ব্যবহারিক সুখ দুঃখ হইতে মুক্ত হয় এমত নহে। সুষুপ্তাবস্থা অতীত হইলে জীব

বুঝিতে পারে যে, সে ইতিপূর্ব্বে সুখে সুষুপ্ত ছিল। সুতরাং সুষুপ্তাবস্থায় জীব একমাত্র আনন্দ ভিন্ন অন্য কিছুই অনুভব করে না এবং একমাত্র বৃত্তিশূন্য চিত্ত ভিন্ন সুষুপ্তাবস্থায় ইহার অন্য কোন উপলব্ধি দ্বার থাকে না। এই আনন্দই নিত্য সত্য আত্মা। এই আনন্দস্বরূপ আত্মা যখন প্রকৃতির অধীন, অবিদ্যাগ্রস্ত জীবরূপে দৃষ্ট হন, তখন ইহাঁকে জীবাত্মা বলা যায়। এবং যখন এই আনন্দস্বরূপ আত্মা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, অবিদ্যামুক্ত ঈশ্বরভাবে দৃষ্ট হন, তখন ইনিই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বযোনি, এবং সর্ব্বস্থিতি লয়কারণ পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন। কিন্তু ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা আত্মার তটস্থভাব মাত্র, স্বরূপভাব নহে। ঈশ্বরভাব থাকিলেই ঈশিতব্য পদার্থের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। যে অবস্থায় কোন প্রকার দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, সেই অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপভাব জানা যায়।

প্রকৃতির কারণ, প্রকৃতিরূপ উপাধিবিনির্ম্মুক্ত, আনন্দস্বরূপ চিন্মাত্রই ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপভাব। ব্রহ্ম বা আত্মার এই স্বরূপভাবই চতুর্থ বা তুরীয়পাদ। ইহাঁরই নাম শিব। ইনি তৈজসপুরুষের ন্যায় অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন। ইনি বিশ্বগণের ন্যায় বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন। ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ ও বহিঃপ্রজ্ঞের সমষ্টিরূপ উভয়তঃপ্রজ্ঞ নহেন। ইনি প্রজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞানসমষ্টি নহেন। ইনি প্রাজ্ঞপুরুষের ন্যায় প্রজ্ঞানঘনরূপ উপাধিধারী নহেন এবং ইনি জড়পদার্থও নহেন। ইনি কোন ইন্দ্রিয়ের গম্য নহেন। ইনি ব্যবহারিক জগতের কোন দ্রব্য নহেন। ইনি বুদ্ধির অগোচর। ইহাঁর কোন প্রকার লক্ষণ নাই। মন ইহাঁকে চিন্তা করিতে পারে না। বাক্য দ্বারা ইহাঁর বর্ণনা করা যায় না। অথচ ইনি সর্ব্বদা সমস্ত জীবের জ্ঞানপথে স্বপ্রকাশ আত্মাভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায়, বার্দ্ধক্যে মৃত্যুরপরে জাগরণকালে, নিদ্রাকালে, সুষুপ্তিকালে, সর্ব্বাবস্থায় জীব আপনার স্বরূপকে অবিনাশী, নির্ব্বিকার, নিত্য আত্মা বলিয়া জানে। ইনিই সেই প্রত্যগাত্মা বা সর্ব্বজীবের আত্মা। এই প্রত্যগাত্মভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাবে ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপভাব জানা যায়

না। জাগ্রৎ, সুপ্ত এবং সুষুপ্ত অবস্থায় যে কোন অনাত্মপদার্থের অস্তিত্ব বোধ হয়, সে সমস্তই মায়াময় এবং সে সমস্তই ইঁহাতে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। ইঁহার কোন প্রকার বিকার নাই এবং ইঁহা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। ইনিই আত্মা। ইঁহাকেই জানিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিয়াছেন—

সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতে আপন ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি প্রত্যাহার করত শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ ও বিচারপূর্ব্বক ব্রহ্মধ্যান দ্বারা যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। বাস্তবিক ব্রহ্মই জীবের আত্মা; কিন্তু অবিদ্যা দ্বারা জীবের স্বাভাবিক ব্রহ্ম স্বরূপত্ব আবৃত থাকে এবং অবিদ্যা-বশতই জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ মনে করে। তপস্যা দ্বারা উক্ত অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেই জীব আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারে। এই ব্রাহ্মণ † বাক্যোক্ত অর্থে নিম্নলিখিত ঋক্ (মন্ত্র) বেদে আম্নাত (উক্ত) আছে। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, ইত্যাদি—মিথ্যা মায়াময় ও বিকারশীল পদার্থের বিপরীতবাচী পদার্থকে সত্য বলা যায়। জড়, সৃষ্ট ও অচিৎ পদার্থের বিপরীতবাচী পদার্থকে জ্ঞান বলা যায়। স্থানবিশেষ ব্যাপী, কালবিশেষ-ব্যাপী ও বস্তুবিশেষব্যাপী পদার্থের বিপরীতবাচী পদার্থকে অনন্ত বলা যায়। সুতরাং ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম অনন্ত, এই বাক্যের অর্থ এই যে ব্রহ্ম নিত্য, নির্ব্বিকার ও প্রকৃতির নিধান; চিন্ময় প্রকৃতির স্রষ্টা ও সর্ব্বপ্রকার গুণবর্জ্জিত; এবং দেশকালানবচ্ছিন্ন, স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত ও মায়াময় প্রকৃতির অধিষ্ঠান স্বরূপ। এই ব্রহ্মকে যিনি আপন পরম পবিত্র হৃদয়াকাশে বুদ্ধির সাক্ষীরূপে অবস্থিত দেখিতে পান তিনি স্বয়ং উপাধি বিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম হইয়া অবিদ্যা নিরপেক্ষ পূর্ণ আনন্দ ভোগ করেন। মন্ত্রটী এইখানে সমাপ্ত হইল বুঝাইবার জন্য "ইতি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

---

† বেদের শ্লোকাত্মক অংশকে মন্ত্র বলে এবং ব্যাখ্যাত্মক অংশকে ব্রাহ্মণ বলে।

বেদাদি কোন প্রকার বাক্য যাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারে না ন্যায়শাস্ত্রাদি বিচার দ্বারা যাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না সেই নির্গুণ আত্মার স্বরূপভাব আনন্দকে যে সাধক শাস্ত্রপ্রদর্শিত ধ্যানযোগদ্বারা অপরোক্ষরূপে জানিতে পারেন তিনি দেখিতে পান যে এক আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, সুতরাং তাঁহার কোন প্রকার ভয়ের কারণ থাকে না এবং তিনি মুক্ত হন।

ঐতরেয়োপনিষৎ বলিয়াছেন—

জীব উৎপন্ন হইয়া প্রথমে আত্ম ব্যতিরিক্ত পদার্থ সকল পরীক্ষা করে এবং প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়; কিন্তু তাহাতে শান্তি পায় না। কেন না যদিও প্রকৃতির নিয়মাবলী সূক্ষ্মভাবে অবলোকন করত জীব কতক পরিমাণে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ লাঘব করিতে পারে বটে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রকৃতির সেবা দ্বারা উক্ত ত্রিবিধ দুঃখ হইতে একেবারে মুক্ত হওয়া জীবের সাধ্যাতীত। যখন জীব এই তথ্য বুঝিতে পারে তখন আপনার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ জানিয়াও আপনাকে অনেক শত সহস্র অনর্থের বশীভূত দেখিয়া, জীব অতি দুঃখে সংসার যাপন করে। কদাচিৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন পরম কারুণিক আত্ম-জ্ঞানী আচার্য্যের সম্মুখে উক্ত জীব উপস্থিত হইলে আচার্য্য উক্ত জীবকে বেদান্তশাস্ত্রোক্ত আত্মজ্ঞান বুঝাইয়া দেন। তখন জীব বুঝিতে পারে যে এই সমস্ত জগতই মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সমস্ত ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়া-ছেন। তখন জীবের সমস্ত অশান্তি লোপ পায় এবং আমিই ব্রহ্ম এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ায় জীব আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কষ্ট হইতে মুক্ত হয়।

ঐতরেয়োপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

প্রজ্ঞান হইতেই সেই সমস্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে * এবং উৎ-পন্ন হইয়া সেই সমস্ত জগৎ প্রজ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

---

* নীয়তে সত্ত্বাং প্রাপ্যতে অনেন ইতি নেত্রং। প্রজ্ঞানেত্রং যস্য তদিদং প্রজ্ঞানেত্রং অর্থাৎ প্রজ্ঞা হইতেই ইহা উৎপন্ন হইয়াছে।

যেহেতু ভূলোক (পৃথিবী) ভুবলোক (অন্তরীক্ষ), স্বর্লোক (জীবের কর্ম্মফল জন্য যে সকল লোক সৃষ্ট হয়), মহলোক (মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ-লোক অর্থাৎ সমস্ত জীবগণের মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তের সমষ্টি), জনলোক (সমস্ত জীবের বিজ্ঞানের সমষ্টি বা অব্যক্তা প্রকৃতি), তপলোক (সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বরের সঙ্কল্প) এবং সত্যলোক (অর্থাৎ ঈশ্বর বা অন্তর্যামী), এই সপ্ত লোকেরই কারণ সেই প্রজ্ঞানমাত্র এবং যেহেতু পটে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় সেই প্রজ্ঞানের মায়ার দ্বারা সেই প্রজ্ঞানেই এই সপ্তলোক প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব সেই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ বলিয়াছেন—

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এবং তাহাদের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা এবং তাহাদের শক্তি শ্রবণ, স্পর্শন দর্শন, আস্বাদন ও ঘ্রাণ এই দশ পদার্থের নাম প্রজ্ঞামাত্রা। যেমন রথচক্রের শলাকাসমূহের উপর চক্রের বেড় অর্পিত থাকে এবং চক্রের মধ্যপিণ্ডের উপর শলাকা সমূহ অর্পিত থাকে, সেইরূপ ভূতমাত্রা সকল প্রজ্ঞামাত্রায় কল্পিত আছে এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল প্রাণে কল্পিত আছে। এই প্রাণই অদ্বয়, অজর, অমর, আনন্দস্বরূপ, চিন্ময় আত্মা।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—

হে বালাকে! যিনি এই সকলের কর্ত্তা এবং এই সকল যাঁহার কর্ম্ম (কর্তৃত্বের ফল) তিনিই জ্ঞেয় অর্থাৎ তাঁহাকে অপরোক্ষ ভাবে জানা কর্ত্তব্য।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

ব্রহ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকগণ বক্ষঃস্থল গলদেশ এবং মস্তক উন্নত করত শরীরকে সরলভাবে রাখিয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে মনদ্বারা বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করিয়া আপন হৃদয়ে সংস্থাপন করিবেন এবং প্রণবমন্ত্র (ওঙ্কার) জপ করত ব্রহ্মচিন্তায় রত থাকিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া সাধক সমস্ত ভয়াবহ সংসার স্রোত অতিক্রম করিবেন।

মনকে বিষয় সমূহ হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তনে রত করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। মন এবং ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিবার প্রধান উপায় প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে অধিকারী হইতে হইলে সংযুক্তচেষ্ট হওয়া চাই। অতিভোজন, অভোজন, অতি নিদ্রা, অনিদ্রা, অতিকর্ম্ম, অকর্ম্ম, অতি ব্যায়াম, অব্যায়াম, প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি ভোজন, নিদ্রা, কর্ম্ম, ব্যায়াম প্রভৃতি যথোপযুক্তরূপে করিয়া থাকেন তিনিই সংযুক্তচেষ্ট। সাধক সংযুক্তচেষ্ট হইয়া প্রথমে অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রোধ করত বামনাসাপুট দ্বারা অল্পে অল্পে যথাশক্তি বায়ুপূরণ করিবেন। অনন্তর যতক্ষণ সামর্থ্য থাকে, নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ করত কুম্ভক করিয়া থাকিবেন। তৎপরে অঙ্গুলিদ্বারা বাম নাসাপুট ধারণ করত দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া অল্পে অল্পে বায়ু পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপে পুনরায় দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া বায়ু গ্রহণ পূর্ব্বক যথাশক্তি কুম্ভক করণানন্তর বাম নাসাপুট দিয়া রেচন করিবেন। সুশিক্ষিত সারথি যেমন স্থিরভাবে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক দুষ্টাশ্বযুক্ত শকটকে আপন গন্তব্য পথে লইয়া যায়, সেইরূপ প্রাণায়ামকারী সাধক চঞ্চলেন্দ্রিয়যুক্ত মনকে সম্পূর্ণরূপে আপন বশে রাখিয়া ব্রহ্মচিন্তনে নিযুক্ত করেন।

(১) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড, অগ্নি, বালুকা প্রভৃতি শারীরিক কষ্টকর দ্রব্য সমূহ বিবর্জ্জিত, (২) কলহাদি-ধ্বনি, উপভোগ সামগ্রী ও মণ্ডপাদি চিত্ত চাঞ্চল্যের সমস্ত কারণ শূন্য, (৩) মনোরম, (৪) ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর, (৫) নির্ব্বাত, (৬) সমতল, (৭) পবিত্র গুহা আশ্রয়পূর্ব্বক সাধক পরব্রহ্মে আপন চিত্ত সংযোগ করিবেন।

যেমন সুবর্ণ রজতাদি নির্ম্মিত স্বাভাবিক সমুজ্জ্বল পদার্থ সকল মৃত্তিকাদি দ্বারা বিলুপ্ত হইলে মলিন দেখায় কিন্তু জল, অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা বিমলীকৃত হইলে তাহাদের তেজ প্রকাশ পায়, সেইরূপ যতদিন জীব অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে, ততদিন তাহার জ্ঞানপথে আত্মতত্ব প্রকাশ পায় না। সাধনা দ্বারা অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেই সাধকের আত্মজ্ঞান হয়। তখন সাধক দেখিতে পান যে তাহার আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন এবং এক। আত্মা ভিন্ন

বাস্তবিক দ্বিতীয় পদার্থ নাই। তখন আর তাঁহার শোক ও মোহের কোন কারণ থাকে না এবং তিনি মুক্ত হন। আত্মার হস্ত নাই অথচ সকল বস্তুই তাঁহার বশীভূত। তাঁহার পদ নাই অথচ তিনি সর্ব্বত্র উপস্থিত। তাঁহার চক্ষু নাই অথচ তিনি সকল বস্তুই দেখিতেছেন। তাঁহার কর্ণ নাই অথচ সকল প্রকার শব্দই তিনি শুনিতেছেন। তাঁহার মন নাই অথচ তিনি সকল বিষয়ই জানিতেছেন। তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। তিনি জগতের আদি পরমপুরুষ বলিয়া অভিহিত হন।

তিনি সূক্ষ্ম অণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর এবং মহৎ জগৎ হইতেও মহত্তর। সমস্ত জগতের হৃদয়ে তিনি আত্মাভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি বিষয়-ভোগ-সঙ্কল্প-রহিত এবং সর্ব্ব কর্ম্ম নিমিত্ত বৃদ্ধিক্ষয়শূন্য। তাঁহার উপাসনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে যে সাধক তাঁহাকে আপন আত্মা বলিয়া সাক্ষাৎ জানিতে পারেন তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ পাইয়া শোক মোহাদি হইতে মুক্ত হন।

বাস্তবিক এই সমস্ত প্রকৃতি তাঁহার মায়ামাত্র। তিনিই মায়ার প্রেরিত মহেশ্বর। যেমন ভ্রম দ্বারা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয় সেইরূপ মায়া দ্বারা তিনিই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-সমন্বিত এই জগৎ ভাবে বিবর্ত্তিত রহিয়াছেন।

ব্রহ্মোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রকৃতিকে সৃষ্টি এবং নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়া আপনিই বহু নিষ্ক্রিয় জীবাত্মা ভাবে প্রকাশিত হন সেই ঈশ্বরকে যে সকল ধীর ব্যক্তিরা আপনাদিগের আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন কেবলমাত্র তাঁহারাই অক্ষয় অব্যয় সুখ প্রাপ্ত হন অপরের ভাগ্যে তাহা ঘটে না।

যজ্ঞাদিস্থলে দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করত অগ্ন্যুৎপাদন করিতে হয়। উহাদের অধোবর্ত্তী কাষ্ঠকে অরণি এবং উপরিস্থিত কাষ্ঠকে উত্তরারণি বলে। অরণি এবং উত্তরারণি ঘর্ষণ করিয়া যেরূপে অগ্ন্যুৎপাদন হয় সেইরূপ বুদ্ধির সহিত অর্থাৎ উপাসনা তত্ত্ব বুঝিয়া প্রণবোচ্চারণ করত আত্মার ধ্যান করিতে থাকিলে অবশেষে নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত আত্মার সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া যায়।

অমৃতবিন্দুপনিষদ্ বলিয়াছেন—

অন্ধকার রাত্রিতে যতক্ষণ পথিক গমন করিতে থাকে ততক্ষণ উল্কার সাহায্য গ্রহণ করে এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছিলে উল্কা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যতকাল না সাধকের অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয় ততকাল সাধক অধ্যাত্মশাস্ত্র-শ্রবণ, শাস্ত্রবাক্যবিচার এবং শাস্ত্রোপদেশমত ধ্যান করিতে থাকিবেন। ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ার পর সাধকের পক্ষে আর এই সমস্ত সাধনার কোন প্রয়োজন থাকে না। যতক্ষণ না পথিক গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হন ততক্ষণ তিনি রথে ভ্রমণ করেন এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলে তিনি রথ পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ যতকাল না সাধকের অদ্বৈতজ্ঞান হয় ততকাল সাধক শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে থাকিবে। সাধকের অদ্বৈতজ্ঞান হইলে তাঁহার আর ঐ সমস্ত সাধনার প্রয়োজন থাকে না।

ব্রহ্মবিন্দুপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সেই ব্রহ্ম নিষ্কল অর্থাৎ তাঁহাকে অংশে অংশে ভাগ করা যায় না। তিনি নির্ব্বিকল্প বা ভ্রমশূন্য এবং নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্ম্মল। সাধকের যখন অপরোক্ষ জ্ঞান হয় যে আমিই সেই নির্ব্বিকল্প, অনন্ত, হেতুদৃষ্টান্তবর্জ্জিত (অর্থাৎ যাঁহার অন্য কারণ নাই এবং যাঁহার উপমা নাই), অপ্রমেয়, অনাদি, পরমমঙ্গলনিধান, ব্রহ্ম, তখন তিনি অবিদ্যামুক্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। যখন সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়া যায় এবং পারমার্থিক জ্ঞান হয় তখন তিনি দেখিতে পান যে, মরণ, জন্ম, বন্ধ, উপদেশ, মুক্তির ইচ্ছা এবং মুক্তি এ সমস্তই মায়াময়, বাস্তবিক ইহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। একই আত্মা মায়াদ্বারা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিকালে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পান। যখন সাধক আপনাকে জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিমুক্ত আত্মা বলিয়া অপরোক্ষ-ভাবে জানিতে পারেন তখন তিনি সংসারগতি হইতে মুক্ত হন। একই চন্দ্র যেমন জলপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্ররূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভূতে ভিন্ন ভিন্ন ভূতাত্মাভাবে দৃষ্ট হন। ঘট ভগ্ন হইলেও যেমন ঘটমধ্যস্থ আকাশের নাশ হয় না সেইরূপ জীবের বিজ্ঞান-ময়, মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোষ নষ্ট হইলেও জীবের আত্মার নাশ

হয় না। বিদ্যা দুই প্রকার। শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রশ্রবণ, শাস্ত্রবাক্য বিচার, ভগবদ্ভক্তগণের ও গুরুর উপদেশ প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় সেই সমস্ত বিদ্যাকে শব্দব্রহ্মবিদ্যা বলে। আর উক্ত বিদ্যা এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা নিরুপাধিক ব্রহ্মের যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় তাহাকে পরব্রহ্ম বিদ্যা বলে। শব্দব্রহ্ম বিদ্যায় কুশল হওয়ার পর সাধক শব্দব্রহ্মবিদ্যা প্রদর্শিত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে পরব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করেন। যেমন ধ্যানার্থী ব্যক্তি প্রথমে তৃণসহ ধান্য সংগ্রহ করে এবং পরে ধান্য গ্রহণপূর্ব্বক তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ সাধক প্রথমে শাস্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করেন, এবং শাস্ত্রাদি প্রদর্শিত উপায় দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ হইলে পর শাস্ত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করেন।

৺গীতা বলিয়াছেন—

যাঁহাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিলে মোক্ষলাভ হয় সেই জ্ঞেয়-পদার্থের বিষয় বলিতেছি। তিনি আদি রহিত পরব্রহ্ম। জন্ম-ক্রিয়া-গুণ সম্বন্ধ-শূন্য বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে অসৎ বলেন কিন্তু বাস্তবিক তিনি সত্বাশূন্য নহেন। তাঁহার সত্বাতেই সকল পদার্থের সত্বা লক্ষিত হয়। তিনিই একমাত্র সৎ। তাঁহার হস্ত, পদ. চক্ষু, মস্তক, মুখ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল সর্ব্বত্র বর্ত্তমান এবং তিনি সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। কিন্তু প্রকৃতির অধীন ও অন্তর্গত জীবের ন্যায় তিনি ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত নহেন। বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ বিবর্জ্জিত হইলেও তিনি ঐ সমস্ত শক্তি সমন্বিত। যদিও তিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতে বিলক্ষণ এবং কোন সৃষ্ট পদার্থের সহিত তাঁহার সংশ্লেষ হইতে পারে না তথাপি মন যেমন স্বপ্নজগৎকে ধারণ করে তিনিই সেইরূপ এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যদিও তাঁহার নিজের কোন প্রকার প্রাকৃতিক গুণ নাই তথাপি তিনি সমস্ত গুণের ফলাফল উপলব্ধি করেন। তিনি সমস্ত শরীরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং সমস্ত স্থাবরজঙ্গমশরীর ভাবে তিনিই বিরাজিত। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গানুসরণ ভিন্ন

অন্য উপায়ে তাঁহাকে জানা যায় না সুতরাং অজ্ঞানীর পক্ষে তিনি অতি দূরে অবস্থিত। জ্ঞানীরা তাঁহাকে আপন আত্মা বলিয়া জানেন সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে তিনি অতি সন্নিহিত। বাস্তবিক বিভাগানর্হ (অর্থাৎ বিভাগের অনুপযুক্ত) হইলেও তিনি প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মাভাবে লক্ষিত হন। তিনি সমস্ত ভূতকে সৃজন পালন ও সংহার করেন। প্রকাশশীল সমস্ত পদার্থের জ্যোতি তাঁহা হইতে উদ্ভূতা, অজ্ঞান বা অন্ধকার তাঁহার নিকট থাকিতে পারে না। তিনিই জ্ঞান এবং তিনিই জ্ঞেয়। তাঁহাকে জানিবার জন্য যে সাধনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে কেবল মাত্র সেই সাধনা দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। তিনি সকলের হৃদয়ে আনন্দময় আত্মাভাবে অবস্থিত আছেন।

৺গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন—

আমিই সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার কর্ত্তা ও দেবতা, আমিই সমস্ত লোকের মহেশ্বর, এবং আমিই সমস্ত প্রাণিগণের প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ সুহৃৎ। আমাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিলে সাধক মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ।

সমাধান।

বেদান্তশাস্ত্রমতে ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানই বেদান্তশাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্য, এই বিষয়ে পূর্ব্বে যে সকল আপত্তির উল্লেখ হইয়াছে এক্ষণে একে একে তাহাদের বিচার করা যাইতেছে। প্রথম আপত্তি এই যে, ব্রহ্ম বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ব্রহ্মবিষয়ক যে সকল বাক্য বেদান্তশাস্ত্রে আছে তাহারা বিধি-নিষেধ-সংস্পর্শ-শূন্য সুতরাং অপ্রমাণ, যম নিয়ম প্রভৃতি ক্রিয়ার উপদেশই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য, উক্ত সাধুক্রিয়া সকল করিতে করিতে মনুষ্য ক্রমশই উন্নত হইতে থাকে। এই শ্রেণীর আপত্তিকারীর মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে মনুষ্য উক্ত ক্রিয়া সকল করিতে করিতে যখন চরম উন্নতি প্রাপ্ত হন তখন দীপনির্ব্বাণের ন্যায় তাঁহার নির্ব্বাণ হয় এবং তাঁহার আর কোন প্রকার অস্তিত্ব থাকে না। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে যদি বেদান্তবাক্যসকল পাঠ করিয়া ইহা নিশ্চয় বুঝা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেওয়াই বেদান্ত বাক্য সকলের তাৎপর্য্য তাহা হইলে ঐ সকল বেদান্ত বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ কল্পনা করা উচিত নহে। ঐরূপ অন্য অর্থ কল্পনা করিলে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা এই দুইটি দোষ হয়। শুনিবা-মাত্র যে অর্থের প্রতীতি হয় সে অর্থ পরিত্যাগ করাকে শ্রুতহানি দোষ বলে। কোন একটী বাক্যে যে সকল শব্দ থাকে সেই সকল শব্দের সমষ্টি দ্বারা যে অর্থ হইতে পারে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ কল্পনা করার নাম অশ্রুতকল্পনা দোষ। উপরে উদ্ধৃত বেদান্তবাক্যসকল পরীক্ষা করিলে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবে যে (১) জীবাত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ, (২) জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মের মায়াদ্বারা ভাসমান, (৩) ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য ও সত্য এবং (৪) শাস্ত্রমত তপস্যা বা সাধনা করিলে ব্রহ্মের অপরোক্ষ

জ্ঞান হয়, ইহাই ঐ সকল বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য এবং ঐ সকল বাক্যের অন্য কোন প্রকার তাৎপর্য্য হইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আখ্যায়িকা সকলের বাক্য হইতে যে অর্থ লব্ধ হয় সে অর্থ অর্থই নহে কিন্তু তাৎপর্য্য অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাই যথার্থ অর্থ এবং সেই অর্থেই আখ্যায়িকা প্রামাণ্য। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত বেদান্তবাক্য সকলের শব্দগত অর্থ উড়াইয়া দেওয়ারও উপায় নাই। কেন না ঐ সকল বাক্য আখ্যায়িকা নহে, উহারাই আপন আপন মূল উপনিষদের তাৎপর্য্য। কোন্ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য তাহা অবধারণ করিতে হইলে উক্ত শাস্ত্রের উপক্রম-উপসংহার-প্রভৃতি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। *

(১) উপক্রম বা আরম্ভ (২) উপসংহার বা শেষ (৩) অভ্যাস বা কোন কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ (৪) অপূর্ব্বতা বা নূতন কথা (৫) ফল বা পরিমাণ (৬) অর্থবাদ বা আখ্যায়িকা প্রভৃতি দ্বারা কোন এক বিষয়ের প্রশংসা এবং (৭) উপপত্তি বা কোন একটী সন্দিগ্ধ বিষয়ের মীমাংসা—এই সাতটী বিষয় সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে তবে তাৎপর্য্য নির্ণয় করা যায়। এই সাতটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপনিষদ্ সমূহ পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন,ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য ও সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং তপস্যা দ্বারা উক্ত জ্ঞান পাওয়া যায় এই উপদেশ দেওয়াই উপনিষদ্ বা বেদান্তসমূহের তাৎপর্য্য এবং ঐ জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়াই যম নিয়ম প্রভৃতির উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। যত কাল না জীবের নিশ্চয় জ্ঞান হইবে যে এই জগৎ একেবারে মিথ্যা এবং আমিই ব্রহ্ম এবং একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ততকাল জীব এই সকল যম-নিয়ম-উপাসনাদি উপদেশ পালন করিবেন। ঐ সকল যম-নিয়ম-উপাসনাদি বিষয়ক উপদেশ সম্যক্ ভাবে পালন করিতে করিতে এমন এক কাল আসিবেই আসিবে যে সময় সাধক এই জগৎকে স্পষ্টই মিথ্যা বলিয়া

---

* উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসো পূর্ব্বতা ফলং।
অর্থবাদোপপত্তিশ্চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে॥

দেখিতে পাইবেন এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য বলিয়া তাঁহার নিশ্চয় জ্ঞান হইবে। তখন আর তাঁহাকে কোন উপদেশ পালন করিতে হইবে না। তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইয়া যাইবেন। তখন তাঁহার সত্ত্বা বিনষ্ট হইবে না; কিন্তু তিনি আপনাকেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিবেন।

কোন কোন আপত্তিকারকের মতে আলোচনা উপাসনা ও অন্যান্য ক্রিয়ার বিধান করা এবং ক্রিয়ার অঙ্গরূপে দেবতা দ্রব্য এবং কর্ত্তার বিষয় উপদেশ দেওয়াই বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। কিন্তু দ্বাদশ প্রবন্ধে উদ্ধৃত বেদান্ত বাক্য সকল পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে আপত্তিকারিগণ যে সকল উপদেশের উল্লেখ করেন সে সকল উপদেশ নিম্নাধিকারিগণের জন্যই বিহিত; সেই উপদেশগুলি বেদান্তশাস্ত্রের চরম উপদেশ হইতে পারে না। "যখন ব্রহ্মবিদের জ্ঞানদৃষ্টিতে সমস্ত বাহ্য ও অন্তর্জগৎ কেবল এক অদ্বৈত আত্মায় বিলয়প্রাপ্ত হয় তখন তিনি কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন্ বিষয় দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন, শ্রবণ ও মনন করিবেন? কোন্ ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবেন এবং কোন্ বিষয় জানিবেন?" ব্রহ্মবিদের অবিদ্যা নাশ হওয়ায় তিনি কর্ত্তা করণ কর্ম্ম ক্রিয়া ও সমস্ত জগৎকে মায়াময় দেখেন, তাঁহার দৃষ্টিতে তিনিই একমাত্র সচ্চিদানন্দ আত্মা এবং উক্ত আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু তাঁহার দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় না। সুতরাং ব্রহ্মবিদের জ্ঞানদৃষ্টিতে দেবতা দ্রব্য ও কর্ত্তার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না এবং ব্রহ্মবিদের পক্ষে আলোচনা উপাসনা ও অন্যান্য ক্রিয়া অসম্ভব।

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে "যাহা কেহ জানে না যাহা অন্য উপায়ে জানা যায় না শাস্ত্র কেবল তাহাই জানান" * আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সুতরাং প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-গম্য অথবা অনুমান-গম্য। অতএব আত্মতত্ত্বের উপদেশ জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে যদিও আত্মা স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ বটেন তথাপি

---

* অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রং।

ইনি প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-গম্য বা অনুমানগম্য নহেন। লোকে সাধারণতঃ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত বা বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া জানে। কিন্তু শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও বিজ্ঞানের স্রষ্টা ও সাক্ষী, সর্ব্বভূতস্থ, সর্ব্বাধিষ্ঠান, নিত্য, নির্ব্বিকার, সর্ব্বাত্মাপুরুষকে বেদান্তশাস্ত্রোপদেশ ভিন্ন কেহই তর্ক বা বুদ্ধিবলে জানিতে পারে না।

বেদান্ত বাক্যোক্ত "তত্ত্বমসি" তুমিই সেই আত্মা, "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমিই ব্রহ্ম, "সোঽহং" তিনিই আমি (অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই আমি), "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই আত্মাই ব্রহ্ম, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, প্রভৃতি মহাবাক্য সকল আলোচনা পূর্ব্বক বেদান্ত-বিহিত মার্গ অবলম্বন করত সেই আত্মার ধ্যানই সেই ঔপনিষদ্ পুরুষকে জানিবার একমাত্র উপায়। সুতরাং আত্মতত্ত্বোপদেশ জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই একথা সত্য নহে। বাস্তবিক শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই সেই আত্মাকে জানা যায় না।

অন্য একটী আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল যে, ব্রহ্ম বা আত্মা একটী স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ সুতরাং কেবলমাত্র তদ্বিষয়ক জ্ঞান লইয়া কি হইবে? যতক্ষণ না উক্ত জ্ঞান হেতু কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা যায় বা কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় ততক্ষণ উক্ত জ্ঞান কোন কাজেই লাগে না। সুতরাং কেবল মাত্র ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া অনর্থক এবং ঐ প্রকার অনর্থক উপদেশ দেওয়া বেদান্ত শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে বেদান্তশাস্ত্রমতে ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই অবিদ্যা ঘুচিয়া যায় এবং অবিদ্যাজনিত সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ বিনষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের ফল আপনা হইতেই হয়। অবিদ্যানাশরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল পাইবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানকে কোন কার্য্যে লাগাইতে হয় না। যদিও অন্য সমস্ত স্থলে বিধি-নিষেধ-শূন্য বেদবেদান্ত-বাক্য-সকল অপ্রমাণ তথাপি আত্মবিজ্ঞানের সম্বন্ধে ঐ নিয়ম খাটে না। অন্য সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান আপনা হইতে কোন ফল উৎপাদন করে না। যতক্ষণ উক্তজ্ঞান কোন কার্য্যে লাগান না যায় ততক্ষণ জ্ঞান থাকা আর না থাকা সমান। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইবামাত্র অবিদ্যা আপনা হইতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং

ব্রহ্মজ্ঞানী সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হন সুতরাং ফলোৎপাদনের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান কোন প্রকার ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না, ব্রহ্মজ্ঞান হইবামাত্রই ব্রহ্মজ্ঞানী অবিদ্যা এবং অবিদ্যাজনিত শোকমোহাদি হইতে মুক্ত হন। অতএব কেবলমাত্র ব্রহ্মোপদেশ অনর্থক নহে। এবং ব্রহ্মজ্ঞানকে পরম পুরুষার্থ বলায় বেদান্তশাস্ত্র কোন প্রকার অনর্থক বা অন্যায় উপদেশ দেন নাই।

আর এক আপত্তি হইয়াছিল যে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এ বাক্য শত সহস্রবার বলিলেও জগতের অস্তিত্ব লোপ পায় না, সুতরাং জগৎ মিথ্যা নহে এবং অদ্বৈতজ্ঞান অসম্ভব। অতএব বেদান্ত শাস্ত্র ঐ প্রকার উপদেশ দেন নাই। ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই বাক্য শত সহস্রবার বলিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় ও অজ্ঞান ঘুচিয়া যায় এমন কথা বেদান্ত-শাস্ত্র বাস্তবিক বলেন নাই। বেদান্তশাস্ত্র বলেন আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ যতকাল তোমার অজ্ঞান না ঘুচিয়া যায় ততকাল তোমার পক্ষে এই চারিটী সাধনা কর্ত্তব্য। সর্ব্ব প্রথমে আত্মা দ্রষ্টব্য। ইহার অর্থ এই যে, তোমার প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক বহির্ম্মুখী। যতকাল প্রবৃত্তিগুলি বহির্ম্মুখী থাকিবে ততকাল আত্মজ্ঞানের কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব আত্মজ্ঞান লাভের প্রথম সাধনা এই যে, তোমার স্বাভাবিক বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তিগুলিকে ইন্দ্রিয়সকল হইতে বিমুখ করিয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত করিবে। তাহার পরে আত্মা শ্রোতব্য অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি আয়ত্ত হইয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে রত হইলে পর বেদ বেদান্ত মহাভারত পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ আছে সেই সকল শাস্ত্র ও আত্মতত্ত্ববিষয়ক অন্যান্য উপদেশ সদ্গুরু ও ভগবদ্ভক্তগণের নিকট শ্রবণ করিবে। শ্রবণ ক্রিয়া আবার দুই প্রকার (১) কেবলমাত্র কর্ণে শ্রবণ এবং (২) শ্রবণ করত ভক্তিপূর্ব্বক পালন। প্রথম প্রকারের শ্রবণকে শ্রবণ বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। লোকে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে "আমি অমুককে অমুক কর্ম্ম করিতে বলিয়াছিলাম কিন্তু সে আমার কথা শুনে নাই"। এখানে "সে আমার কথা শুনে নাই" এই

বাক্যের অর্থ এমত নহে যে আমার কথা তাহার শ্রবণগোচর হয় নাই কিন্তু এই বাক্যের অর্থ এই যে, সে আমার কথা ভক্তিপূর্ব্বক পালন করে নাই। শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিবে ইহার অর্থ এই যে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া ভক্তিভাবে শাস্ত্রের বিধান ও উপদেশ পালন করিবে। সাধনার তৃতীয় সোপান এই যে আত্মা মন্তব্য। কেবলমাত্র আত্মার তত্ত্ব শ্রবণ করিলেও মন সর্ব্বদা আত্মচিন্তনে রত থাকে না। সেইজন্য যখন সাবকাশ পাইবে শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের সহিত আত্মার বিষয় ভাবিবে এবং আত্মার বিষয়ে শাস্ত্র যে সকল সিদ্ধান্ত স্থাপনা করিয়াছেন সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিবে এবং ঐ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ঐ সকল সিদ্ধান্ত আপন হৃদয়ে প্রোথিত করিবে। তাহার পর আত্মা নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ শাস্ত্রে আত্মার ধ্যানের সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে সেই উপদেশ মত আত্মার ধ্যান করিবে। এইরূপে আত্মার ধ্যান করিতে করিতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে তবে আত্মজ্ঞান হয় এবং তখন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বলিয়া স্পষ্ট দেখা যায় এবং তখন অবিদ্যা ঘুচিয়া যায়। নতুবা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই কথা শত সহস্রবার বলিলেও কোন ফল হয় না। এখানে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে অবিদ্যানাশের পূর্ব্বে যে জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব ছিল সেই জগৎ অবিদ্যানাশের পর ধ্বংস পায় বেদান্তদর্শনের এমন উপদেশ নহে। বেদান্তদর্শনের উপদেশ এই যে, জগৎ চিরকালই মিথ্যা, যতদিন অবিদ্যা থাকে ততদিন ভ্রমবশতঃ জগৎ সত্য বোধ হয়, অবিদ্যা নষ্ট হইলে মিথ্যা জগৎ মিথ্যা বলিয়াই দৃষ্ট হয়।

শেষ আপত্তি এই যে, পরিবর্ত্তনশীল এই জগতের উপর আস্থা না রাখিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মকে পরোক্ষভাবে জানিয়া তাঁহার আলোচনা ও উপাসনা কর, তাহা হইলে সেই আলোচনা ও উপাসনার ফলে তুমি এমন লোক পাইবে যে লোক সুখময় এবং যেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। এই উপদেশ দেওয়াই বেদান্তশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, অতএব ক্রিয়াই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, কেবল ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহা উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে ; যে সুখময় লোক হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না সেই

লোক প্রাপ্তিকেই মোক্ষপ্রাপ্তি বলে। ইহার উত্তর এই যে, তুমি যে লোকের কথা বলিতেছ তাহা সৃষ্ট কি নিত্য? বেদান্তশাস্ত্রমতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত পদার্থ এবং সমস্ত লোকই সৃষ্ট সুতরাং অনিত্য। সংসারেও দেখা যায় যে, সকল প্রকার উৎপাদ্য পদার্থই অনিত্য। সুতরাং তোমার স্বকপোলকল্পিত উক্ত প্রকার নিত্যলোক কোথা হইতে আসিবে? ঐ প্রকার নিত্যলোক থাকিলে তাহা ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট হইতে পারে না সুতরাং সকল বেদান্তশাস্ত্র যে একবাক্যে বলিতেছেন যে ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ সেই বাক্য অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব তোমার কল্পিত সুখময় নিত্যস্থান থাকিতে পারে না। আপত্তিকারীরা এইখানে বলেন তবে মোক্ষ কি প্রকারে সম্ভব হয়? উত্তরে আমরা বলি যে মোক্ষ ও ব্রহ্মভাব পৃথক্ নহে। যতক্ষণ তুমি অবিদ্যায় ডুবিয়া আছ ততক্ষণই তুমি আপনাকে বদ্ধ ও মরণশীল বলিয়া জানিতেছ। বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা ও বেদান্তবিহিত মার্গে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে তোমার অবিদ্যা ঘুচিলেই তুমি দেখিতে পাইবে যে মোক্ষ বা ব্রহ্মভাবই নিত্য ও সত্য এবং আর সমস্তই মায়াময়। বাস্তবিক বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত মোক্ষ-প্রাপ্তি কোন প্রকার সৃষ্টলোক প্রাপ্তি নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। জীব অজ্ঞানবশত তাহাদিগকে পৃথক মনে করে। সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দেখিতে পায় এবং জগৎ মিথ্যা বলিয়া তাহার স্পষ্ট জ্ঞান হয়। আমিই নিত্য সত্য চিন্ময় ব্রহ্ম এবং জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে হওয়ার নামই মোক্ষপ্রাপ্তি। যে ব্রহ্ম চিরকাল আছেন ও থাকিবেন, যাঁহার মায়ায় এই জগৎ মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে ভাসমান, যাঁহার লীলায় জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছে, সেই ব্রহ্ম হইতেই বেদান্তশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। সেই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ সম্যক্‌রূপে পালন করিলেই জীব অবিদ্যা হইতে মুক্ত হয়। উক্ত অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট করাই বেদান্তশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে পূর্ণজ্ঞান আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী না হইলে সাধক কেবলমাত্র বেদান্তশাস্ত্র

আলোচনা করিয়া কোন বিশেষ ফল পাইবেন না। ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার কি প্রকারে হয় প্রথম সূত্রে তাহা সবিস্তারভাবে বলা হইয়াছে। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকী, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগী, শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাচিত্ত, সমাহিত এবং মুমুক্ষু না হইলে সাধক ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হন না। আবার ইচ্ছা করিলেই সাধক এই সমস্ত গুণশালী হইতে পারেন না। এই প্রকার গুণশালী হইতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনাসমূহ বেদান্তশাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। জীবগণকে অনুগ্রহ করত সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস সেই সমস্ত সাধনা সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সঙ্কলিত করিয়া গিয়াছেন এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্ত গ্রন্থের সুন্দর ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষদ্ (অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্র সকল) গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎস, এবং মহৎ গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ, সুধীগণ তাহা পান করেন। সাধক প্রথমে গীতাশাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিবেন। তৎপরে গীতার উপদেশমত কর্ম্ম করিতে থাকিবেন। যখন তিনি দেখিবেন যে তিনি সর্ব্বতোভাবে গীতার উপদেশমত কর্ম্ম করিতে পারিতেছেন তখন তিনি আপনাকে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী বলিয়া বুঝিবেন। তখন যথানিয়মে বেদান্তশাস্ত্র আলোচনা করিয়া ভক্তিভাবে বেদান্তশাস্ত্রোক্ত উপদেশমত ব্রহ্মের ধ্যান করিতে থাকিলেই সাধক সম্যক্ ফল পাইবেন, তাঁহার অজ্ঞান নষ্ট হইবে, এবং তিনি আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিবেন।

ইতি চতুঃসূত্রী সমাপ্তা।

ওঁ তৎ সৎ॥

বাক্যের অর্থ এমত নহে যে আমার কথা তাহার শ্রবণগোচর হয় নাই কিন্তু এই বাক্যের অর্থ এই যে, সে আমার কথা ভক্তিপূর্ব্বক পালন করে নাই। শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিবে ইহার অর্থ এই যে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া ভক্তিভাবে শাস্ত্রের বিধান ও উপদেশ পালন করিবে। সাধনার তৃতীয় সোপান এই যে আত্মা মন্তব্য। কেবলমাত্র আত্মার তত্ত্ব শ্রবণ করিলেও মন সর্ব্বদা আত্মচিন্তনে রত থাকে না। সেইজন্ত যখন অবকাশ পাইবে শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের সহিত আত্মার বিষয় ভাবিবে এবং আত্মার বিষয়ে শাস্ত্র যে সকল সিদ্ধান্ত স্থাপনা করিয়াছেন সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিবে এবং ঐ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ঐ সকল সিদ্ধান্ত আপন হৃদয়ে প্রোথিত করিবে। তাহার পর আত্মা নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ শাস্ত্রে আত্মার ধ্যানের সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে সেই উপদেশ মত আত্মার ধ্যান করিবে। এইরূপে আত্মার ধ্যান করিতে করিতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে তবে আত্মজ্ঞান হয় এবং তখন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বলিয়া স্পষ্ট দেখা যায় এবং তখন অবিদ্যা ঘুচিয়া যায়। নতুবা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই কথা শত সহস্রবার বলিলেও কোন ফল হয় না। এখানে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে অবিদ্যানাশের পূর্ব্বে যে জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব ছিল সেই জগৎ অবিদ্যানাশের পর ধ্বংস পায় বেদান্তদর্শনের এমন উপদেশ নহে। বেদান্তদর্শনের উপদেশ এই যে, জগৎ চিরকালই মিথ্যা, যতদিন অবিদ্যা থাকে ততদিন ভ্রমবশতঃ জগৎ সত্য বোধ হয়, অবিদ্যা নষ্ট হইলে মিথ্যা জগৎ মিথ্যা বলিয়াই দৃষ্ট হয়।

শেষ আপত্তি এই যে, পরিবর্ত্তনশীল এই জগতের উপর আস্থা না রাখিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মকে পরোক্ষভাবে জানিয়া তাঁহার আলোচনা ও উপাসনা কর, তাহা হইলে সেই আলোচনা ও উপাসনার ফলে তুমি এমন লোক পাইবে যে লোক সুখময় এবং যেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। এই উপদেশ দেওয়াই বেদান্তশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, অতএব ক্রিয়াই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য; কেবল ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহা উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে; যে সুখময় লোক হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না সেই

লোক প্রাপ্তিকেই মোক্ষপ্রাপ্তি বলে। ইহার উত্তর এই যে, তুমি যে লোকের কথা বলিতেছ তাহা সৃষ্ট কি নিত্য? বেদান্তশাস্ত্রমতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত পদার্থ এবং সমস্ত লোকই সৃষ্ট সুতরাং অনিত্য। সংসারেও দেখা যায় যে, সকল প্রকার উৎপাদ্য পদার্থ ই অনিত্য। সুতরাং তোমার স্বকপোলকল্পিত উক্ত প্রকার নিত্যলোক কোথা হইতে আসিবে? ঐ প্রকার নিত্যলোক থাকিলে তাহা ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট হইতে পারে না সুতরাং সকল বেদান্তশাস্ত্র যে একবাক্যে বলিতেছেন যে ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ সেই বাক্য অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব তোমার কল্পিত সুখময় নিত্যস্থান থাকিতে পারে না। আপত্তিকারীরা এইখানে বলেন তবে মোক্ষ কি প্রকারে সম্ভব হয়? উত্তরে আমরা বলি যে মোক্ষ ও ব্রহ্মভাব পৃথক্ নহে। যতক্ষণ তুমি অবিদ্যায় ডুবিয়া আছ ততক্ষণই তুমি আপনাকে বদ্ধ ও মরণশীল বলিয়া জানিতেছ। বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা ও বেদান্তবিহিত মার্গে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে তোমার অবিদ্যা ঘুচিলেই তুমি দেখিতে পাইবে যে মোক্ষ বা ব্রহ্মভাবই নিত্য ও সত্য এবং আর সমস্তই মায়াময়। বাস্তবিক বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত মোক্ষ-প্রাপ্তি কোন প্রকার সৃষ্টলোক প্রাপ্তি নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। জীব অজ্ঞানবশত তাহাদিগকে পৃথক মনে করে। সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দেখিতে পায় এবং জগৎ মিথ্যা বলিয়া তাহার স্পষ্ট জ্ঞান হয়। আমিই নিত্য সত্য চিন্ময় ব্রহ্ম এবং জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে হওয়ার নামই মোক্ষপ্রাপ্তি। যে ব্রহ্ম চিরকাল আছেন ও থাকিবেন, যাঁহার মায়ায় এই জগৎ মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে ভাসমান, যাঁহার লীলায় জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করি-তেছে, সেই ব্রহ্ম হইতেই বেদান্তশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। সেই বেদান্ত-শাস্ত্রের উপদেশ সম্যক্‌রূপে পালন করিলেই জীব অবিদ্যা হইতে মুক্ত হয়। উক্ত অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট করাই বেদান্তশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে পূর্ণজ্ঞান আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী না হইলে সাধক কেবলমাত্র বেদান্তশাস্ত্র

আলোচনা করিয়া কোন বিশেষ ফল পাইবেন না। ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার কি প্রকারে হয় প্রথম সূত্রে তাহা সবিস্তারভাবে বলা হইয়াছে। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকী, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগী, শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাচিত্ত, সমাহিত এবং মুমুক্ষু না হইলে সাধক ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হন না। আবার ইচ্ছা করিলেই সাধক এই সমস্ত গুণশালী হইতে পারেন না। এই প্রকার গুণশালী হইতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনাসমূহ বেদান্তশাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। জীবগণকে অনুগ্রহ করত সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস সেই সমস্ত সাধনা সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সঙ্কলিত করিয়া গিয়াছেন এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্ত গ্রন্থের সুন্দর ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষদ্ (অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্র সকল) গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎস, এবং মহৎ গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ, সুধীগণ তাহা পান করেন। সাধক প্রথমে গীতাশাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিবেন। তৎপরে গীতার উপদেশমত কর্ম্ম করিতে থাকিবেন। যখন তিনি দেখিবেন যে তিনি সর্ব্বতোভাবে গীতার উপদেশমত কর্ম্ম করিতে পারিতেছেন তখন তিনি আপনাকে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী বলিয়া বুঝিবেন। তখন যথানিয়মে বেদান্তশাস্ত্র আলোচনা করিয়া ভক্তিভাবে বেদান্তশাস্ত্রোক্ত উপদেশমত ব্রহ্মের ধ্যান করিতে থাকিলেই সাধক সম্যক্ ফল পাইবেন, তাঁহার অজ্ঞান নষ্ট হইবে, এবং তিনি আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিবেন।

ইতি চতুঃসূত্রী সমাপ্তা।

ওঁ তৎ সৎ॥